المملكة العربية السعودية
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة المجمعة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد

كتاب التوحيد
باللغة البنغالية

তাওহীদ

প্রণয়নেঃ-

আব্দুল হামীদ ফাইযী

جمع وترتيب : عبد الحميد الفيضي

أرتاس
٠٦٤٣١١٤١٦
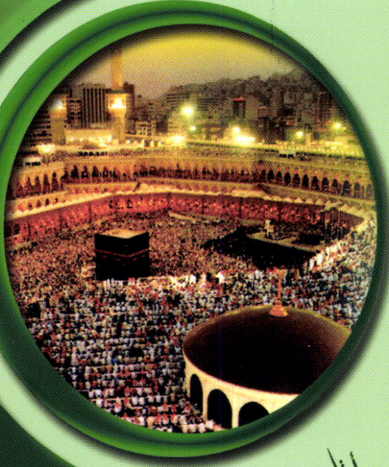
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المجمعة
شارع الملك فيصل هاتف: ٠٦٤٣٢٣٩٤٩ فاكس: ٠٦٤٣١١٩٩٦ ص.ب: ١٠٢ الرمز البريدي

বিষয়-নির্ঘন্ট

শায়খুল হাদীস মুহতারাম মওলানা আব্দুর রউফ শামীম সাহেবের

অভিমত

হামেদান ওয়া মুসাল্লিয়ান। আম্মা বা'দ।

মহান আল্লাহর অসীম করুণায় এ বছরে রামাযানুল মুবারাকের অবকাশে 'উমরাহ' সফর করার সৌভাগ্য লাভ করি। 'উমরাহ' সমাধা করে স্নেহভাজন আব্দুল হামীদ মাদানীর বর্তমান প্রবাসী শহর সউদী আরবের অন্তর্গত "আল-মাজমাআহ" পর্যন্ত (মদীনা থেকে প্রায় ৬২০ কি মি.) পৌঁছানোর প্রয়াস প্রাপ্ত হই। ১২/ ১৩টি দিন এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মনোরম শহরটিতে অবস্থান করা কালে বক্ষমান বইখানির পান্ডুলিপি পড়ে দেখার সুযোগ ঘটে।

ঈমান হচ্ছে ইসলামের মূল কথা। যতক্ষণ ঈমান বিশুদ্ধ না হবে, ততক্ষণ কোন আমল গৃহীত হবে না। আর ঈমানের মূল বস্তু হচ্ছে- 'তাওহীদ'। তাওহীদের অর্থ, মহান আল্লাহকে একক, অনুপম, শরীক ও সঙ্গীহীন বলে হৃদয়-মনে বিশ্বাস করা। আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা সঞ্চারের মহৎ উদ্দেশ্যে এবং তাওহীদের পরিপন্থী ধারণা ও বিশ্বাসের মূলোৎপাটন কল্পে বইখানি স্নেহভাজন আব্দুল হামীদ মাদানী বহু শ্রম স্বীকার করে রচনা করেছে। বইটিতে কল্পনা-প্রসূত কোন কথা স্থান পায় নি। বরং লেখক হাদীস, কুরআন, তফসীর ও বহু ভাষ্যগ্রন্থ মন্থন করতঃ বইটিকে সাবলীল করে পেশ করতে প্রয়াস পেয়েছে।

বইটিকে দু'টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ঈমান বা তাওহীদের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঈমান ও তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতঃ বিষয়টির পূর্ণাঙ্গরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই ধরনের বই আরবী ও উর্দু ভাষাতে পরিলক্ষিত হলেও বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাংলা ভাষাভাষী সকল মুসলিম নরনারীর নিমিত্তে বইখানি যেমন সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়, তেমনি বইটি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করতঃ বিষয়বস্তুগুলির প্রতি ব্যবহারিক জীবনে যত্নবান হওয়াও খুব প্রয়োজন বলে মনে করি। বইটি নিঃসন্দেহে বঙ্গীয় মুসলিমদের প্রতি এক অনুপম উপহার। এতদ্বারা বাংলার প্রত্যেকটি ভাই ও বোন উপকৃত হোন। মনে-প্রাণে আমি এই কামনা ও প্রার্থনা করি। আ-মীন।

রচনাস্থানঃ
আল-মাজমাআহ, (সউদী আরব)
তাং- ২রা শওয়াল ১৪১৪ হিজরী
মুতাবিক ১৪/৩/ ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ

বিনীত
আব্দুর রউফ শামীম
সদর মুদার্রিস,
জামেআ মহিষাডহরী, বীরভূম

শুরুর কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

পৃথিবীর সর্বশেষ, শ্রেষ্ঠ ও সত্য ধর্ম আল্লাহর ধর্ম, ইসলাম। যার মর্মমূল তাওহীদ বা একত্ববাদ। এই তাওহীদের অতিশয় মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমনঃ-

১। তাওহীদ দ্বীনের ভিত্তি, শরীয়তের মূল সূত্র, ইসলামের আসল বুনিয়াদ। যা না হলে ইসলামের কোন ইবাদত বা আমল প্রতিষ্ঠিত বা গৃহীত হতে পারে না। *(কুঃ ২৫/২৩)*

২। মানব-দানব তথা এ বিশ্ব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ। দাসত্ব, আনুগত্য ও ইবাদতের সাথে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া। তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর প্রেরিত জীবন-সংবিধানের প্রতি ধারার অনুবর্তী হওয়া। *(কুঃ ৫১/৫৬)*

৩। যুগে-যুগে নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন; যাঁদের প্রথম ও প্রধান পবিত্র গুরুভার এবং তাঁদের রিসালত ও নবুঅতের চাবি ছিল এই তাওহীদ প্রচার। প্রত্যেক নবীই তাঁর নিজ কওম বা গোত্রের কাছে একই কথা ব্যক্ত করেছেন, একই আনুগত্যের আদেশ করেছেন এই বলে যে, "একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন সত্যিকার মা'বূদ, ইলাহ বা উপাস্য নেই।" *(সূরা হূদ)*

৪। ইসলামের মূলমন্ত্র কালেমা-এ তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সর্বোৎকৃষ্ট কালেমা, যার দ্বারা আল্লাহর যিকর ও গুনগান করা হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ, যার দ্বারা তাঁকে ডাকা হয় এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হয়, যার দ্বারা সর্বাধিক বেশী সওয়াব ও পুণ্য অর্জন করা যায়। যা আল্লাহর নিকট বৃহত্তম। ইবাদত ও আনুগত্যের মীযানে (হিসাবের দিন আল্লাহর মানদন্ডে) সপ্ত গগণ ও সপ্ত ধরণী এবং আল্লাহ ব্যতীত উভয়ের অধিবাসী অপেক্ষাও অধিক ভারী। *(হাঃ ১/৫২৮)* যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাওহীদ, ধর্মকুঞ্জিকা এবং মিল্লাতের শীর্ষ। যে ব্যক্তি এ মন্ত্র ইখলাস ও ইয়াকীনের (বিশুদ্ধ প্রত্যয়ের) সহিত পাঠ করবে এবং তার দাবী অনুযায়ী কর্ম করবে ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সেই হবে আল্লাহর পিয়ারা প্রকৃত মুসলিম এবং উভয় কালে সিদ্ধমনোরথ ও সফল মানুষ। *(বুঃ ১২৮, মুঃ ২৭, তিঃ ২৬৩৮ নং)*

৫। তাওহীদ শ্রেষ্ঠতম আমল। দ্বীনের প্রারম্ভ ও পরিশেষ, উপক্রমণিকা ও উপসংহার, অন্তর্মাধুর্য ও বহিরাভরণ। যা না হলে মানবের মানবতা, আদর্শ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সদাচারাদি প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য থেকে যায়।

৬। শির্ক বা অংশীবাদিতা তথা তাওহীদ-দ্রোহিতা অমার্জনীয় বৃহত্তম অপরাধ এবং নিকৃষ্টতম মহাপাপ। যার দন্ড, সর্ববিধ সৎকার্য বিনাশ এবং অনন্তকাল দোযখবাস। *(কুঃ ৩৯/৬৫, ৫/৭২)*

৭। শির্ক যেমন পুণ্য-বিনাশী তেমনি তাওহীদ পাপ-বিনাশী ও কলুষ স্খালনকারী। *(মুঃ ২৬৭৭, তিঃ ৩৫৪০ নং, মুআঃ ৫/১৪৭)*

৮। এই তাওহীদই নির্বাচন করে, কে মুমিন ও সৌভাগ্যবান চির ইচ্ছা-সুখের বেহেশ্তের অধিবাসী এবং কে কাফের ও দুর্ভাগ্যবান চির দুঃখ-ক্লেশের দোযখের অধিবাসী।

তাই তো মুসলিমের সর্বপ্রথম ওয়াজেব এই তাওহীদকে জানা ও চেনা। সর্বাগ্রে তাওহীদের সাথে পরিচিত হয়ে তবে অন্য ময়দানে নামা। ইসলামী রাষ্ট্র রচনা, ইসলামী দন্ডবিধি ও সংবিধান প্রতিষ্ঠাকরণ, হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে সংযমন, ওয়াজেব বা আবশ্যিক কর্ম-কর্তব্য পালন প্রভৃতি তাওহীদের অধিকার ও দাবীর পরিপূরক এবং অনুবর্তী। মুখ্য ও মূলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে গৌণ ও অনুবর্তী বিষয়ে মনোনিবেশ করা অবশ্যই মারাত্মক ভুল। আহবায়ক

ও আহূত উভয়ের মনে এই তাওহীদই সর্বাগ্রে বদ্ধমূল হওয়া উচিত। এরই আলোকে প্রত্যেক মুসলিমের পথ চলা অপরিহার্য কর্তব্য।

এই পথই আম্বিয়ার (আঃ) পথ। এই মার্গই ঐক্যের মার্গ। শতধা-বিচ্ছিন্ন বহুবাদী সমাজের মাঝে সংহতি প্রতিষ্ঠা করার এটাই একমাত্র অবলম্বন। একত্ববাদের মূল-মন্ত্রই একতার মূল কারণ। ছিন্ন মালার প্রত্যেক দানাকে একত্রে গাঁথার অদ্বিতীয় যোগসূত্র এটাই।

তাওহীদ-কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। উপাস্য বা ইলাহের তাওহীদ- আল্লাহকে একক মানা, মিল্লাতের তাওহীদ- একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা ও আনুগত্যে একতাবদ্ধ হয়ে বিচ্ছিন্নতাহীন সমাজ গড়া। আদর্শ অনুসৃত ও পথ-প্রদর্শকের তাওহীদ- হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে শেষ নবী ও রসূলরূপে মানা। উৎস ও পদ্ধতির তাওহীদ- কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসরণ করা। তরীকা, মত ও পথের তাওহীদ- সাহাবায়ে কেরাম ﷺ -গণের পথে চলা। জামাআত বা দলের তাওহীদ- হকপন্থী একই ইমাম বা আমীরের আনুগত্যে একত্রিত হওয়া।
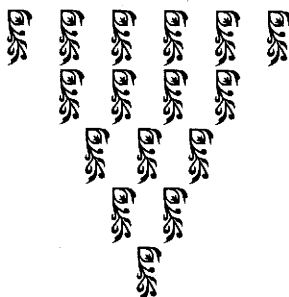
উক্ত যাবতীয় তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত ও পালিত হলে ইহ-পরকালের সর্ববিধ কল্যাণের আশা করা যাবে।

তাওহীদের অর্থ অনেকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে এবং কেবল ততটুকুই অন্তরে স্থান দিয়ে থাকে, যা ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রুযীদাতা, একমাত্র মালিক, আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুমকর্তা ও সার্বভৌম শাসক। এ সবে তাঁর কোন অংশী নেই। কেবল এতটুকু স্বীকার করলেই কেউ তাওহীদবাদী মুসলিম হয় না। বরং এ সবের সাথে এ কথাও স্বীকার্য যে, সকল প্রকার ইবাদত, উপাসনা ও আরাধনার মালিক কেবল তিনিই। তাতে কেউই তাঁর শরীক নেই এবং যে সমস্ত গুণে তিনি গুণান্বিত তাতে তাঁর কোনও অংশী নেই, কোন উপমা নেই।

তাই এতবড় প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি খেয়াল করে 'টুটাফুটা' ভাষায় এই পুস্তিকার অবতারণা করেছি। এতে উল্লেখিত সমস্ত আকীদাহ, বিশ্বাস ও মত কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ এবং আহলে সুন্নাহর গণ্যমান্য উলামায়ে কেরামদের রচনাবলী থেকে সঞ্চিত ও সংগৃহীত। সাধ্যানুযায়ী প্রায় স্থানে উদ্ধৃতি ও হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ স্থানে আয়াত ও হাদীস নম্বরকে বর্ণিত বিষয়ের দলীলস্বরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা মানুষের স্বাভাবিক। জ্ঞানীদের নিকট থেকে নসীহতের আবেদন রাখি। এ সামান্য শ্রমের উপর আল্লাহর নিকট বড় অনুগ্রহ ও সওয়াবের আশা রাখি। আশা করি সমাজ এতে উপকৃত হবে। আর পাঠকদের নিকট আশা রাখি দুআর। আল্লাহ আমাদের সকলকে, মুসলিম সমাজকে সৎ ও সত্য পথ প্রদর্শন করেন এবং অলীক, ভ্রান্ত ও অমূলক বিশ্বাস, মত ও পথ থেকে সুদূরে রাখুন। আমীন।

আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব

আব্দুল হামীদ
৭ই রমযান, ১৪১৪হিঃ

মহান আল্লাহ

এই বিশাল জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি আল্লাহ। তিনি একক, অদ্বিতীয়। তিনিই সমগ্র সৃষ্টি-জগতের একমাত্র প্রতিপালক, অধিকর্তা, অন্নদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, মঙ্গলদাতা, বিপত্তারণ, বিপদে বান্দার আকুল আবেদন শ্রবণকারী। তিনিই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ামক। সৃষ্টিজগতে যা গঠনে আসে তার সংগঠক, যা ঘটন-অঘটন ঘটে তার সংঘটক তিনিই। তিনিই বিধাতা, ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা। তাঁরই ইঙ্গিতে দিবারাত্রি হয়, জগৎ চলে। সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাঁরই। এ সবে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ব্যতীত কেউ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু-পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতে কারো কোন অংশও নেই এবং কেউ আল্লাহর কাজে সাহায্যকারীও নয়। *(কুঃ ৩৪/২২)*

আল্লাহ একক উপাস্য। দ্যুলোকে-ভূলোকে তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকারের মাবূদ ও উপাসনার যোগ্য নেই। তিনিই যাবতীয় উপাসনা ও ইবাদতের অধিকারী। তিনি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য মানব-দানব সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ৫১/৫৬)* ইবাদতে তাঁর কেউ কোন প্রকারের অংশী নেই। *(কুঃ ৬/১৬২)* এই কথার উপরেই তিনি সকল আম্বিয়া ও রসূলগণকে প্রেরিত করেছেন। আর এরই জন্য প্রত্যেক রসূল ও নবী (আঃ) নিজ নিজ উম্মতের তরফ থেকে কত শত কষ্ট পেয়েছেন। কত লড়াই-যুদ্ধ বেধেছে এরই জন্য। অতএব বান্দার জীবন, মরণ, স্মরণ, ভয়, ভালোবাসা, আশা, ভরসা, আবেদন, প্রার্থনা, উপাসনা, আরাধনা যাবতীয় গুপ্ত-প্রকট ইবাদত শুধু আল্লাহরই জন্য হতে হবে। তার মধ্যে সামান্য কিছুতেও তাঁর শরীক স্থাপন করা বান্দার জুলুম হবে; যদিও সে কোন নবী-রসূল বা ফিরিশ্তাকে শরীক করে থাকে। অন্যান্য সৃষ্টির শরীক তো অনেক দূরের কথা।

আল্লাহর তাঁর নিজ গুণাবলীতেও তিনি একক। তাঁর কোন গুণে কেউ অংশীদার নেই, উপমা নেই, দৃষ্টান্ত নেই। মুসলিম আল্লাহ তাআলার অসংখ্য মহিমান্বিত নামাবলী ([1]) ও মহত্তম গুণাবলীর উপর ঈমান আনে; যে সমস্ত নাম ও গুণ কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা অবিকৃত অবস্থায় মানে, তার কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও অপব্যাখ্যা করে না, করে না তার কোন প্রকার রূপ বা আকৃতি বর্ণনা। না কারো সাথে উপমা বা উদাহরণ দেয়। আর না-ই তাঁকে গুণহীন বা কর্মহীন মনে করে। বরং যেমন বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেই অর্থেই তার প্রতি ঈমান রাখে। যেমন সে সকল নাম ও গুণাবলীর প্রতিও ঈমান রাখে, যে সকল নাম ও গুণাবলীর কথা কিতাব ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয় নি; যার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট আছে। অথবা তিনি কোন ফিরিশ্তা বা অন্য কোন সৃষ্টিকে জানিয়েছেন। *(মুঃ, মুআঃ ১/৩৯১)*

এ সব বিশ্বাস করতে 'কেমন, কার মত' -ইত্যাদি প্রশ্ন তার মনে জাগে না। নিরর্থক বা ভিন্নার্থবোধকও মনে করে না। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী যেমন তাঁর জন্য উপযুক্ত।

([1]) *এই সকল নামাবলীর মধ্যে ৯৯টি এমন নাম আছে, যা কেউ মুখস্থ করলে (সে সবের অর্থ বুঝে সেই অনুসারে আমল করলে) তার ফযীলতে সে জান্নাত প্রবেশ করবে। (বুঃ ৭৩৯২, মুঃ ২৬৭৭নং)*

তাঁর দৃষ্টান্ত কিছু নেই, তাঁর কোন উপমা ও তুলনাই নেই। *(কুঃ ৪২/১১)*

রবীআহ বিন আব্দুর রহমানকে আল্লাহ তাআলার আরশে ওঠা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 'আরশে ওঠার কথা আমাদের উপলব্ধ। তার কৈফিয়ত- অর্থাৎ, কিরূপে বা কার মত তা আমাদের অজানা। রিসালত আল্লাহর তরফ থেকে। তা প্রচারের দায়িত্ব রসূলের উপর। আর আমাদের কাজ সত্য জানা।'

ইমাম মালেক (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আল্লাহ তাআলা কেমনভাবে আরশে অধিষ্ঠিত আছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'অধিষ্ঠান আমাদের জানা, তার কৈফিয়ত বা কেমনরূপে আছেন তা অজানা। তার উপর ঈমান ওয়াজেব। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদআত।'

মোট কথা, আল্লাহ জাল্লা শানুহ সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে আরশের উপর আছেন। সারা সৃষ্টি জগতের উপরে থেকে জগৎ পরিচালনা করছেন। কিন্তু তাঁর স্বরূপ কি? আকার কি? তাঁর অবয়ব আছে কি না? -এ সব প্রশ্ন মুমিনের মনে আসে না এবং এ প্রসঙ্গে মুখই খুলে না। কারণ, এ সব প্রশ্নের উত্তর কোন সৃষ্টির কাছে নেই। কুরআন-হাদীসেও নেই। জানেন তো শুধু তিনিই, যিনি আরশে আছেন। এসব উত্তর নিয়েও মুমিনের কোন কাজ নেই। বস্তুতঃ মুসলিম আল্লাহর যে বিষয় জানে না, সে বিষয়ে অজান্তে কিছু বলতে-ভাবতে রসনা ও চিন্তাকে বিরত রাখে। *(কুঃ ৭/৩৩, ১৭/৩৬, ২২/৮-৯)* আর 'আল্লাহ' সম্বন্ধে অনর্থক চিন্তা ও আলোচনা হতে নিবৃত্ত থাকে। মুমিন জানে ও মানে যে, কারো ধ্যান-ধারণা তাঁকে ধরতে পারে না এবং কারো খেয়াল ও কল্পনা তাঁকে ছুঁতে পারে না। কারো জ্ঞান তাকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না। *(কুঃ ২০/১১)* ([2])

তিনি সুমহান। তিনি আছেন সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। সপ্ত আকাশের উপর কুরসী, যা সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যপ্ত। এই কুরসী তাঁর পা রাখার স্থান। তার উপরে আছে কল্পনাতীত বৃহত্তম আরশ। যা আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। সর্বোচ্চ জান্নাত ফিরদাউসের উপরে বিদ্যমান। যার পায়া ও প্রান্ত আছে, ছায়া আছে। এই আরশের উপর তিনি অধিষ্ঠিত। *(কুঃ ২০/৫)*

তাঁর উপরে কিছু নেই। তিনি কা'বায় নন, মসজিদে নন, মুমিনের হৃদয়ে নন, সব জায়গাতেও নন। তিনি সৃষ্টির সাথে মিলে থাকেন না।

তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী। *(কুঃ ২/১৮৬)* তিনি সর্বদা বান্দার সাথে থাকেন। *(কুঃ ৫৭/৪, ৫৮/৭, ৯/৪০, ৮/৪৬)* তিনি নেককার ও ধৈর্যশীল বান্দাদের সাথে থাকেন। *(কুঃ ১৬/১২৮)* তবে তিনি স্ব-অস্তিত্ব নিয়ে নয়, বরং তাঁর ইল্ম, সাহায্য ও তওফীক সর্বদা বান্দার সাথে থাকে। তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞান সব জায়গায় আছে। তাঁর অনুগত ফিরিশ্তা সকল স্থান ছেয়ে আছেন। তাঁরা বান্দার তত্ত্বাবধানে থাকেন। আল্লাহর যিক্র তথা স্মরণ থাকে বান্দার হৃদয়ে। ([3])

([2]) *নামাযী নামাযে মনে করে যেন সে আল্লাহকে দেখছে অথবা তিনি তাকে দেখছেন। তা বলে নামাযী যেন আল্লাহর কোনরূপ ছবি মনে না আনে। কারণ, আমরা যতই ভাবি আল্লাহ এই রকম। আল্লাহ কিন্তু সে রকমই নন। তাঁকে নিয়ে কোনরূপ কল্পনাও বৈধ নয়। এক কথায় আকাশ-পৃথিবীতে তাঁর মত কোন কিছুই নেই। তিনি অনুপম, উপমারহিত।*

([3]) *যেমন যদি বলি, 'একা চলি রাতে, আলো নাহি হাতে, চাঁদ আছে সাথে।' এর অর্থ এই নয় যে, চাঁদ আমার সাথে আমার দেহসংলগ্নে আছে। বরং তার জ্যোৎস্না আমার সাথে আছে। কিন্তু চাঁদ আকাশে। তেমনি মহান আল্লাহর ইল্ম ও তওফীক বান্দার সাথে ও সকল স্থানে। কিন্তু তিনি আরশে। অতএব*

আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো জনক নন, কারো জাতকও নন। তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ নেই। *(কুঃ ১১২)* তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চির জাগ্রত। নিদ্রা বা তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে না। *(কুঃ ২/২৫৫)* তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই রাজাধিরাজ, পবিত্র। তিনিই শান্তি, নিরাপত্তা-বিধায়ক, রক্ষক, বিক্রমশালী, প্রবল। তিনিই গর্বের অধিকারী। তিনিই সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা - সকল উত্তম নাম তাঁরই। *(কুঃ ৫৯/২২-২৪)*

তিনি পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(কুঃ ৪২/১১, ৪/৫৮)* তিনি অনাদি তাঁর প্রারম্ভ নেই, তিনি অনন্ত তাঁর অন্ত নেই। তিনিই প্রথম, তাঁর আগে কিছু নেই। তিনিই শেষ, তাঁর পরে কিছু নেই। *(কুঃ ৫৭/৩, ৮/৭৮)* তাঁর লয় নেই ক্ষয় নেই, অবিনশ্বর তিনি।

তাঁর কোন বিকল্প নেই, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি নিরঙ্কুশ, তাঁর ফায়সালা টলাবার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি যা কিছু করেন, তাঁর প্রতিবাদী কেউ নেই। তাঁর কার্যে কোন পরাজয় নেই। কোন কিছু তাঁকে বাধা দিতে, অক্ষম করতে পারে না। তিনি ভ্রষ্ট হন না, কিছু ভুলেনও না। *(কুঃ ২০/৫২)* তিনি সকল কিছুর মালিক। সকলেই তাঁর দয়ার একান্ত মুখাপেক্ষী। যে তাঁর দয়া ও সহায়তা থেকে বেপরোয়া হয়, সে কাফের ও ধ্বংস হয়ে যায়। *(কুঃ ১৫/৫৬, ১২/৮৭)*

তিনি সর্বজ্ঞানী। সমগ্র সৃষ্টির যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক্ অবহিত। ভূত-ভবিষ্যত তিনি ব্যতীত আর কেউই জানে না। না কোন ফিরিশ্তা, না জিন, না নবী, না অলী। *(কুঃ ৩৪/২, ৬/৫৯)* গুপ্ত-প্রকাশ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল জিনিস ও বিষয়ের খবর তাঁর কাছে। *(কুঃ ৬/৭৩)* সারা নভ ও ভূমন্ডলে যা ছিল, রয়েছে, থাকবে, যা নেই তা হলে কেমন হবে - সকল বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত। অনুরূপ যা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে, যা ঘটে নি তা ঘটলে কেমন ঘটবে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক্ পরিজ্ঞাত। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু তাঁর অগোচর নয়। *(কুঃ ৩৪/৩, ১০/৬১)* সৃষ্টি-জগৎ সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। জীব-জগৎ সৃষ্টি করার আগেই তাদের সৃষ্টি-পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক্ বিদিত ছিলেন।

সারা সৃষ্টির ভাষা একমাত্র তিনিই বোঝেন। মনের গোপন কথাও তিনি ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না, তিনিই অন্তর্যামী। *(কুঃ ৩/১৫৪, ৬৭/১৩)* চক্ষুর চোরা-চাহনির অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন থাকে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(কুঃ ৪০/১৯)*

তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। *(কুঃ ২/২৫৩)* তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতে কিছুই ঘটে না। যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে সত্যপথ দেখান, যাকে ইচ্ছা নিজ হিকমতে পথভ্রষ্ট করেন। *(কুঃ ৬/১২৫)* যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যাকে ইচ্ছা পথের ভিখারী করেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। *(কুঃ ৩/২৬)* তিনিই যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা রাখেন। *(কুঃ ৪২/৪৯-৫০)*

তিনি বড় বিজ্ঞানী। সৃষ্টিকে যথোপযুক্ত রূপে ও গুণে সৃষ্টি করেন। প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত স্থানে স্থিত করেন। সারা জগৎ তাঁর আজব হিকমতে চলে। সে হিকমত সবাই

আল্লাহ সাথে থাকেন- বলতে তাঁর ইল্‌ম ও তওফীক। তাঁর অস্তিত্ব নয়। আর এটা তা'বীল (অপব্যাখ্যা) নয়। কারণ, তাঁর আরশে অবস্থান করার কথা কিতাব ও সুন্নাহতে প্রমাণিত।

বুঝে উঠতে পারে না। তিনি তাঁর হিকমতে যাকে দরিদ্র করার প্রয়োজন তাকে দরিদ্র করে এবং যাকে ধনী করার প্রয়োজন তাকে ধনী করে সৃষ্টি করেছেন। কাউকে কিছু দান করেছেন, কারো কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিয়েছেন -এসব তাঁর নিখুঁত হিকমতের কারিগরী, মুমিন এতে বিশ্বাস রাখে, তাঁর হিকমতে ভরসা রাখে। যে হালে থাকে সেই হালকেই সে নিজের জন্য মঙ্গলময় মনে করে এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করে থাকে।

জীবন-মৃত্যুর মালিক তিনিই। যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখেন, যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। *(কুঃ ১০/৫৬)* তিনি সারা জগৎ ৬ দিনে রচনা করেছেন। *(কুঃ ৭/৫৪)* তিনি পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ২/২৯)* আর সব কিছুকেই মানুষের অধীনে করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ-পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত কোন বস্তুকে নিরর্থক অপ্রয়োজনে খামাকা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি। *(কুঃ ৩৮/২৭, ৪৪/৩৮)* বরং তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টির পিছনে হিকমত ও কারণ আছে। আবার তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেন, তা তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন ছাড়াই করে থাকেন।

আল্লাহ ফিরিশ্তা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজ কোন প্রয়োজনে নয়। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে অনেককেই নিজের দোস্ত, খলীল, হবীব ও অলী নির্বাচিত করেছেন। তা তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজনে নয়। *(কুঃ ১৭/১১১)* বরং বান্দারই মর্যাদা বৃদ্ধিকরণার্থে।

মহান আল্লাহ তাঁর আওলিয়াকে ভালোবাসেন - সে ভালোবাসার কোন উদাহরণ নেই। যেমন তিনি বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন, তেমনি ক্রোধান্বিতও হন। *(কুঃ ৪/৯৩, ৫/৬০)* বান্দার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। *(কুঃ ৪৩/৫৫)* এসব গুণের কোন দৃষ্টান্ত নেই।

তাঁর চেহারা আছে। *(কুঃ ২৮/৮৮, ৫৫/২৭)* মুসলিমরা জান্নাতে সেই চেহারা করীম দর্শন করবে। সে চেহারা নূরে পরিপূর্ণ। *(মুঃ ১৭৯ নং)* কিন্তু তার স্বরূপ কি? কেমন? কার মত? মুমিনের মনে সে প্রশ্ন আসে না।

তাঁর দুই হাত আছে -যেমন তাঁর জন্য উপযুক্ত। তার কোন উপমা নেই। কেমন তাও তিনিই জানেন। তিনি তাঁর দুই হস্ত দ্বারা আদমকে তৈরী করেছেন। *(কুঃ ৩৮/৭৫)* তাঁর দুই হাত অতি দানশীল, তিনি যথেচ্ছা দান করে থাকেন। *(কুঃ ৫/৬৪)* তিনি নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন। *(বুঃ ৬৬১৪, মুঃ ২৬৫২)* তাঁর উভয় হাতই ডান। *(মুঃ ১৮২৭)*

তাঁর আঙ্গুলের কথায়ও মুমিন বিশ্বাস স্থাপন করে। *(বুঃ ৭৫১৩, মুঃ ২৭৮৬ নং)*

তাঁর পা আছে। কোন সৃষ্টির পায়ের মত নয়। *(বুঃ ৭৩৮৪, মুঃ ২৮৪৮ নং)*

তাঁর জঙ্ঘা (পায়ের রলা)র কথাও মুসলিম কোন প্রকার উপমা ছাড়াই বিশ্বাস করে। *(কুঃ ৬৮/৪২, বুঃ ৪৯১৯ নং)*

তাঁর দুটি চক্ষুর কথায়ও মুমিন ঈমান রাখে। *(কুঃ ২০/৩৯, ৫৪/১৪, ৫২/৪৮)* কিন্তু তা কেমন তা সকলের ধারণা ও জ্ঞানের বহির্ভূত।

তিনি অতি বিশাল। কিয়ামতের দিন তাঁর হস্তমুষ্টিতে পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলী তাঁর দক্ষিণ হস্তে সংকুচিত থাকবে। *(কুঃ ৩৯/৬৭)* তাঁর সীমা ও পরিধি সৃষ্টির ধারণার ঊর্ধ্বে। তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপকরণ নিরপেক্ষ। ([4]) সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনি সকলের ঊর্ধ্বে থেকে সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে

([4]) আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহর হাত, পা, চক্ষু ইত্যাদি আছে বলে আমরা সেগুলিকে তাঁর অঙ্গ বলে অভিহিত করতে পারি না। কারণ, সেগুলির গঠনশৈলী ও বৈশিষ্ট্য আমাদের একেবারে অজানা। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর সীমার জ্ঞানও কোন সৃষ্টির নেই। তাঁর সীমা তিনিই জানেন। যেমন যে গুণের কথা কিতাব ও সুন্নায় উল্লেখ নেই, সে গুণের কথা আমরা আন্দাজ করে বলতে পারি না।

রেখেছেন। সৃষ্টি-জগৎ তাঁকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সম্বোধন করেন, বলেন, আদেশ করেন, উপদেশ দেন। তাঁর বাণী অহীর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা দূত মারফৎ মানুষের কাছে পৌঁছে থাকে। *(কুঃ ৪২/৫১)* যখন ইচ্ছা তিনি বলেন, যা ইচ্ছা বলেন। 'আযাল' থেকে সর্বদা যে কোন সময়ে তিনি কথা বলেন। আর সে বলার কোন দৃষ্টান্ত নেই, কোন রকমত্ব নেই। কোন সৃষ্টির বলার মত তাঁর বলা নয়। কুরআন মাজীদ তাঁরই বলা 'কালাম' (বাণী)।

আল্লাহ জাল্লা শানুহ্ প্রত্যেক রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, 'কে আমায় ডাকবে, আমি শ্রবণ করব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি মঞ্জুর করব। কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।' *(বুঃ ১১৪৫, মুঃ ৭৫৮নং)* কিন্তু তাঁর অবতরণ কোন সৃষ্টির অবতরণের মত নয়। অতএব তিনি কিভাবে অবতরণ করেন? এক স্থানে রাত্রি, অপর স্থানে দিন -কি করে তা সম্ভব? তাঁর অবতরণকালে আরশ খালি হয় কি না? যখন তিনি পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন, তখন অন্যান্য আকাশ তাঁর উপরে হয় কি না? -এসব নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর কেবল তিনিই জানেন। মুসলিম এসব প্রশ্ন মনেই আনে না। কারণ, বিশাল পর্বতসম বস্তু অথবা স্বর্ণের ন্যায় সূক্ষ্ম ওজনের জিনিসকে মানুষ তার সব্জি-বেচা তুলাদন্ডের ন্যায় মস্তিষ্কে ওজন করতে সক্ষম নয়।

তিনি খুশী হন ও হাসেন। বান্দা তওবা করলে খাদ্য-পানীয় বোঝাই করা উঁট মরু-সফরে হারিয়ে গিয়ে ফিরে পাওয়ার পর মুসাফির যত খুশী হতে পারে তার থেকেও বেশী খুশী হন তিনি। *(বুঃ, মুঃ, আঃ, তিঃ, ইমাঃ, সজাঃ ৫০৩০ নং)* তাঁর খুশী কোন সৃষ্টির খুশীর মত নয়। তিনি দুই বান্দার জন্য হাসেন; যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে উভয়ই জান্নাতে যায়। একজন আল্লাহর পথে জিহাদ করে, অপরজন কাফের অবস্থায় মুজাহিদকে শহীদ করে। পরে হত্যাকারী কাফের মুসলিম হয়ে জিহাদে শহীদ হয়ে যায়। ফলে দুজনেই জান্নাতবাসী হয়। *(বুঃ ২৮২৬, মুঃ ১৮৯০)* তাঁর হাসি কোন মখলূকের হাসির মত নয়। তিনি মন্দকে ঘৃণা করেন। *(কুঃ ৯/৪৬, বুঃ ১৪৭৭, মুঃ ৫৯৩ নং)*

তাঁর অন্তর আছে। *(কুঃ ৫/১১৬)* তিনি বান্দার প্রতি আশ্চর্যবোধ করেন। *(মুআঃ ৪/১৫১)* ([১]) পার্থিব-জগতে মানব-দানবের জন্য আল্লাহপাক অদৃশ্য। *(মুঃ ১৬৯, ১৭৭নং)* তাঁকে দেখার যে দাবী করে, সে মিথ্যুক। হযরত মূসা ﷺ আল্লাহকে দেখতে চাইলেন। বললেন, "প্রভু হে! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।" আল্লাহ বললেন, "তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।" কিন্তু যখন আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হল এবং মূসা ﷺ ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অতঃপর জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তওবা করলেন। *(কুঃ ৭/১৪৩)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তাঁকে কিরূপে দেখা সম্ভব? যাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত করে ফেলবে।" *(মুঃ ১৭৯নং)*

([১]) কোন বিষয়ের কারণ গুপ্ত অথবা রহস্যাবৃত থাকার কারণে যে বিস্ময় হয় মহান আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। কেন না, তাঁর নিকট গুপ্ত কিছুই নেই। কোন বিষয় তার প্রকৃতি ও স্বাভাবিকতার বাইরে গেলে যে আশ্চর্য হয়, তাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত।

অতএব যদি কোন নবী দেখতে সক্ষম না হন, তাহলে কোন অনবীর দর্শনদাবী কি হতে পারে? অবশ্য শেষ নবী ﷺ মি'রাজের রাতে তাঁকে দেখেছেন কি না -সে নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মা আয়েশা رضي الله عنها বলেন, যে বলে যে, 'মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রব্ব (আল্লাহ)কে দেখেছেন, সে মিথ্যুক।' *(বুঃ ৪৮৫৫, মুঃ ১৭৭)* কেউ বলেন, স্বচক্ষে দেখেছেন। কেউ বলেন, অন্তর-নেত্রে দর্শন করেছেন। *(তইকাঃ ৪/২৫০)*

ইহলোকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বান্দাদের কাছে অদৃশ্য থেকেই গায়বী ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। অদৃশ্যভাবেই তাঁকে জানা ও চেনার এবং তাঁর একত্ববাদ ও প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দিয়েছেন। যদি তিনি বান্দাদের দৃশ্য হতেন, তাহলে বিনা নবী-রসূল ও কিতাবে, কারোর বিনা উপদেশ ও নসীহতেই সারা জগদ্‌বাসী মুমিন হয়ে যেত। তাঁর কোনও আদেশ কেউ উল্লঙ্ঘন করত না। কিন্তু মহাপরীক্ষার জন্যই তিনি অদৃশ্য আছেন। অবশ্য পরকালে তিনি জান্নাতবাসীদেরকে দর্শন দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। *(কুঃ ১০/২৬, ৭৫/২৩)* জান্নাতবাসীগণ তাঁকে তেমনিই দেখতে পাবেন, যেমন পূর্ণিমার রাত্রে মেঘশূন্য আকাশে পূর্ণেন্দুকে প্রত্যক্ষ করা যায়। *(বুঃ ৫৫৪, মুঃ ৬৩৩ নং)*

তবে সে দিদারের কোন উপমা বা দৃষ্টান্ত নেই। মুমিনের দৃষ্টি-শক্তিতে ভিন্ন কোন শক্তি এলে সে তাঁকে দর্শন করবে। আবার একটি পিপীলিকা যেমন সুবৃহৎ পর্বত দেখতে পায়, অথচ তার বিশালত্বকে চক্ষুর আয়ত্তে আনতে পারে না, তেমনি বান্দাও মহান আল্লাহর বিশালত্বকে নয়নায়ত্তে আনতে পারবে না। *(কুঃ ৬/১০৩)*

সর্বপ্রকার মহত্তম গুণাবলী তাঁরই। সৃষ্টির মাঝে যত রকমের সদ্‌গুণ আছে আল্লাহ তার প্রথম অধিকারী এবং যত রকমের বদ্‌গুণ বা দোষ আছে আল্লাহ প্রথম তা থেকে মুক্ত। তিনি সর্বপ্রকার কলুষ ও কালিমা হতে পবিত্র এবং সব রকমের দোষ-ত্রুটি হতে নির্মল ও নিরঞ্জন। পক্ষান্তরে যে গুণ (যেমন সন্তানধারণ) সৃষ্টির জন্য পূর্ণতার পরিপূরক হলেও সে গুণ মহান আল্লাহর জন্য শোভনীয় না হওয়ার জন্য তা হতেও তিনি উর্ধ্বে।

তিনি তাঁর গুণাবলী সহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলী সহ অনন্ত থাকবেন। 'মখলূক' বা সৃষ্টির পূর্বেও তিনি 'খা-লিক' বা স্রষ্টা ছিলেন। প্রতিপাল্যের অবিদ্যমানতায়ও তিনি 'রব' বা প্রতিপালক ছিলেন। জীবন দান করার আগেও তিনি 'জীবনদাতা' নামের অধিকারী ছিলেন। তিনি সর্বদা সর্ববিষয়ে সর্বোপরি মহাশক্তিমান। সব কিছুই তাঁর জন্য অতি সহজ; যা করতে ইচ্ছা করেন তাও এবং যা করতে ইচ্ছা করেন না তাও। ([6])

মুসলিম মহান আল্লাহকে সেই সকল গুণে গুণান্বিত মনে করে, যে সকল গুণরাজির কথা তিনি স্বয়ং পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন অথবা যার কথা তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ পবিত্র হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আর যে গুণের কথা তিনি খন্ডন করেছেন তা থেকে তাঁকে পাক ও নিরঞ্জন মনে করে। যার উল্লেখ পায় না তাতে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন প্রকার মন্তব্য করে না।

'আল্লাহ' সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার অন্যতম বিশেষ্য। সর্বোত্তম মহান নাম। যাকে 'ইসমে আযম' বলা হয়। 'রহমান' তাঁর একটি বিশেষণ এবং বিশেষ্যও। যার অর্থ পরম

---

(6) *মনে রাখা উচিত যে, তিনি মন্দের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু মন্দের সম্পর্ক তাঁর প্রতি আরোপ করা যায় না। (মুঃ ৭৭১ নং) অতএব একথা কারো বলা বৈধ নয় যে, 'আল্লাহ সব করতে পারেন, আল্লাহ চুরি করতে পারেন, বা আল্লাহ চুরি-ব্যভিচার করান। -নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।*

করুণাময়। আরবী ভাষায় 'আর-রাহমান' বলতে আল্লাহকে বুঝায়, কিন্তু বাংলায় 'পরম করুণাময়' বলতে আল্লাহকে বুঝায়, আবার কোন বাতিল মা'বূদ অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষকেও বুঝাতে পারে। অতএব তাঁর সমস্ত নামের অনুবাদ আল্লাহর গুণ নির্দেশ করে, কোন নাম নয়।

আরবীতে যেমন 'আর-রাহীম' আল্লাহর একটি বিশেষ্য ও বিশেষণ। আবার 'রহীম' কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ্য অথবা বিশেষণ হতে পারে। যার অর্থ পরম দয়াময় বা দয়ালু। আমরা আল্লাহকে দয়াময় বলি, আবার কোন ব্যক্তি বিশেষকেও দয়াময় বা দয়ালু বলে থাকি। কিন্তু উভয় 'রহীম' ও 'দয়ালু'র মাঝে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কারণ, তাঁর দয়াকে কোন সৃষ্টির দয়ার সাথে তুলনা করাই চলে না। অতএব স্রষ্টা ও সৃষ্টির কোন গুণ নামে এক হলেও উভয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য। আল্লাহর গুণ অতুল ও অনুপম।

তেমনি মহাবিজ্ঞানী, বিপত্তারণ, রক্ষাকর্তা, অনন্ত ও অসীম ইত্যাদি তাঁর গুণ বুঝায়, নাম নয়। কিন্তু আরবীতে গুণ এবং নামও।

জ্ঞাতব্য যে, রহীম, করীম, হাকীম, মাজীদ ইত্যাদি বলে কোন মখলূককে নির্দেশ করা যায়। কিন্তু 'আল' যুক্ত করে 'আল-রাহীম' 'আল-কারীম' ইত্যাদি বলতে কেবল আল্লাহকেই বুঝায়।

ফারসীতে 'খুদা' বলতে আল্লাহকে বুঝায়। যার অর্থ বলা হয়, 'খুদ-আ' অর্থাৎ যিনি স্বয়ং এসেছেন। যিনি স্বয়ম্ভু, কারো জাতক নন। এটা তাঁর একটি বিশেষণ বলা যেতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ্য বা নাম বলা যায় না। তাই 'খুদা' বলে তাঁর যিক্র বা অযীফা করা যায় না।

তেমনি গড, ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদি বলে কেউ আল্লাহকে বুঝাতে পারে। কিন্তু মুসলিম তা ব্যবহার করে না। কারণ, এগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাতিল মা'বূদের জন্য ব্যবহৃত।

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর 'আসমা ও সিফাত' প্রসঙ্গে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছেঃ-

১। তাঁর আসমা ও সিফাত কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলে তা মান্য হবে। অন্যথা তাঁর নাম ও গুণ মনে করা ভুল হবে।

২। আসমা ও সিফাত সংক্রান্ত কুরআনী আয়াত ও অন্যান্য 'নসূস' (পাকা দলীল)কে কোন প্রকারের তা'বীল বা ভুল তাৎপর্য না করে তার বাহ্যিক অর্থের উপর ঈমান রাখা জরুরী। কারণ, সিফাতের নসূসে নিজস্ব কারো রায় বা মন্তব্যের স্থান নেই; তাই সর্বদা তার সহজার্থই গ্রহণযোগ্য হবে।

৩। সিফাতের নসূস যে প্রকাশ্য অর্থ দেয়, তা একদিকে আমাদের জানা। আবার অপরদিকে আমাদের অজানা। তার শব্দার্থ আমাদের জানা, কিন্তু তার স্বরূপ ও প্রকৃতত্ব আমাদের অজানা।

৪। নসূসের বাহ্যিক অর্থ, যা শোনামাত্র আমাদের মস্তিষ্ক সেদিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু বাক্য-গঠনের দিকে লক্ষ্য করে তার অর্থ বিভিন্ন হতেও পারে। যেমন 'হস্ত'। যখন আমরা কাউকে বলতে শুনি যে, 'আমি স্বহস্তে লিখেছি', তখন আমাদের মস্তিষ্ক তার প্রকাশ্য অর্থের প্রতিই ছুটে যায়; আর তা হল 'হাত' অঙ্গবিশেষ। কিন্তু যখন শুনি, 'এর পশ্চাতে কারো হস্ত আছে' -তখন আমরা 'হস্ত' বলতে 'মদদ' বা 'পৃষ্ঠপোষকতা' বুঝি।

মুমিন সিফাতের ব্যাপারে তার প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করে। তাতে কোন রকমের তা'বীল বা হেরফের করে না। কিন্তু শব্দবিন্যাস ও বাক্যগঠন অনুসারে প্রকাশ্য অর্থও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, আরবী ভাষায় যখন বলা হয়, 'এটা তোমার হাতের কামাই' তখন বুঝা হয়, 'তোমার স্বকৃতকর্ম', -চাহে সে কর্ম বা কামাই হাত দ্বারা বা হাত ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা হোক। আর এটাই হল তার প্রকাশ্য অর্থ তথা একে তা'বীল বলা যাবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা দহন-যন্ত্রণা ভোগ কর। এ তোমাদের হস্ত যা পূর্বে পাঠিয়েছে তার (অর্থাৎ, তোমাদের স্বকৃতকর্মের) ফল।" *(কুঃ ৩/১৮২)* "তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের হস্তোপার্জিত কর্মের (অর্থাৎ, স্বকৃতকর্মের) কারণেই।" *(কুঃ ৪২/৩০)* যেহেতু প্রকাশ্য অর্থে কেবলমাত্র হাতই মানলে অর্থ এই হয়ে যায় যে, অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা কৃতকর্মের ফলে বা কারণে মানুষ শাস্তি ভোগ করবে না বা তার বিপদ আসে না। তদনুরূপ তাঁর উক্তি, "ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, ওদের জন্য আমার স্বহস্তকৃত (অর্থাৎ, আমি নিজে) পশু সৃষ্টি করেছি।" *(কুঃ ৩৬/৭১)* যেহেতু একথা প্রমাণিত যে, আল্লাহপাক কেবল আদম ﷺ-কেই নিজ হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

মুমিন সিফাতের অর্থের কোন প্রকার রূপ অথবা উপমা বর্ণনা করে না। তাই যখন সে শোনে যে, "আল্লাহ আদম ﷺ-কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন।" "তাঁর হস্তদ্বয় বড় দানশীল।" "সমগ্র রাজত্ব তাঁর হস্তে।" -তখন সে তার প্রকাশ্য অর্থই অর্থাৎ, 'হাত'ই মনে করে। কিন্তু সে হাত কেমন, কিরূপ, কার মত এ সবের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। বরং মানে যে, সে হাত তেমন, যেমন তাঁর জন্য উপযুক্ত বা লায়েক। হাতের অর্থ 'নেয়ামত, কুদরত', বা 'কবজা' করে না।

মুসলিম মহান আল্লাহর কোন নাম বা গুণকে অস্বীকার করে না; আবার তাঁর এমন কোন নামও দেয় না, যে নাম তিনি নিজে নেন নি অথবা তাঁর রসূল ﷺ সে নামের পরিচিতি দেন নি। আর এমনও বিশ্বাস রাখে না যে, তাঁর কোন নামের অর্থগুণ কোন সৃষ্টির গুণের মত।

যেমন তাঁর নামকে মূল ধাতু বানিয়ে তা হতে বাতিল মা'বূদের জন্য কোন নামের উৎপত্তি করে না। যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা করেছিল, 'আযীয' থেকে 'উযযা'। 'মান্নান' থেকে 'মানাত' ইত্যাদি।

তেমনি মুসলিম আল্লাহর কোন নাম বা ক্রিয়া থেকে তার কোন নাম নির্ণয় করতে পারে না। যেমন, তিনি বান্দাকে তওফীক দেন, *(কুঃ ৪/৩৫)* তওফীক দেওয়া তাঁর একটি ক্রিয়াগত গুণ। কিন্তু তা বলে 'মুওয়াফ্‌ফিক' তাঁর কোন নাম বলতে পারা যায় না।

আল্লাহ বলেন, "মাকারাল্লাহ।" *(কুঃ ৩/৫৪)* কিন্তু 'মা-কির' তাঁর কোন নাম বলা যাবে না।

তিনি বান্দাকে হেদায়াত করে থাকেন। কিন্তু 'হা-দী' তাঁর নাম নয়।

"আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি অল-আরয্" *(কুঃ ২৪/২৫)* কিন্তু 'নূর' তাঁর কোন নাম নয়। তেমনি 'আল্লাহু তাবারাকা অতাআলা' 'বা-রাকাল্লাহ' বলা হয়। কিন্তু 'মুতাবারিক' বা 'মুবারিক' তাঁর নাম নয়। যেমন তাঁকে 'মুবারক'ও বলা যাবে না। কারণ তিনি স্বয়ং বর্কতপূর্ণ মহামহিমান্বিত। তিনিই বর্কত প্রদান করে থাকেন, কারো বর্কতের মুখাপেক্ষী তিনি নন।

আবার 'বাকী', 'রশীদ', 'সুবহান', 'আবাদ', 'মা'বূদ' 'কাদীম' তাঁর নাম নয়। যেমন 'সাত্তার'ও তাঁর কোন নাম নয়। বরং তাঁর এক নাম 'সাতীর' বা 'সিত্তীর'।

(আদাঃ ৪০১২, নাঃ ৪০৪, সজাঃ ১৭৫২ নং)

এ সবগুলি তাঁর নাম এই জন্য নয় যে, কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে এ নামগুলির কথা তাঁর নাম বলে উল্লেখিত হয় নি। তাই এই সমস্ত শব্দাবলী দিয়ে তাঁর যিক্র করা যাবে না এবং এ শব্দগুলির পূর্বে 'আব্দ' যোগ করে কারো নামকরণও বৈধ হবে না। (7)

তেমনি 'হু' বা 'হুয়া' তাঁর কোন নাম নয়। এটি একটি সর্বনাম মাত্র; যা সকলের নামের পরিবর্তে ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই 'হু-হু' বা 'হুয়া-হুয়া' বলে কোন যিক্র বা অযীফা পাঠ করা চলে না। যেমন শুধুমাত্র 'আল্লাহ', 'রহমান' বা 'রহীম' বলে কোন যিক্র করা বিদআত। 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -বলে যিক্র বা অযীফা করতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র 'লা ইলাহা' বলে এবং পরে শুধুমাত্র 'ইল্লাল্লাহ' অথবা 'ইল-ইল' বলে যিক্র নাজায়েয। আবার ঐ কালেমার সাথে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' জুড়ে যিক্র করা হয় না। যেমন সমস্বরে ও চিৎকার করে জামাআতী যিক্র বিদআত।

আল্লাহর গুণাবলীকে যে অস্বীকার করে অথবা মিথ্যা মনে করে; যেমন বলে যে, আল্লাহ্ সর্বস্থানেই আছেন বা আরশে নেই, তাহলে সে কাফের। কারণ, আল্লাহ বলেন, তিনি আরশে আছেন। *(কুঃ ২০/৫)* কিংবা যে বলে যে, আল্লাহর হাত নেই বা চক্ষু নেই অথবা পা নেই ইত্যাদি, তাহলেও সে কাফের। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ বলে আছে।

যদি কেউ আল্লাহর সিফাতকে নেক-নিয়ত ও ইজতিহাদের উপর তা'বীল বা দূর অর্থ করে এবং পরে তার নিকট সত্য ও ন্যায় প্রকাশিত হলে তা'বীল ত্যাগ করে সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে সে ক্ষমার্হ হবে। (8)

কিন্তু যদি কেউ প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীবশে এমন তা'বীল বা ভুল তাৎপর্য করে, যা ভাষায় বা সাহিত্যে কোন কোন স্থানে প্রচলিত ও ব্যবহৃত, তাহলে এ ক্ষেত্রে সে কাফের হবে না, গোনাহগার হবে। যেমন বলে, 'আল্লাহর হস্ত' অর্থাৎ তাঁর সম্পদ বা শক্তি (নেয়ামত বা কুদরত)। যেহেতু আরবী সাহিত্যে 'হস্ত' এ সব অর্থেও ব্যবহৃত।

আবার যদি কেউ প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীবশে এমন তা'বীল করে, যার প্রচলন ভাষায় নেই, তাহলে সে এ ক্ষেত্রে কাফের হয়ে যাবে। যেমন যদি বলে, 'আল্লাহর দুই হাত' মানে আকাশ ও পৃথিবী। কারণ হাতের অর্থ আকাশ বা পৃথিবী আরবী ভাষায় ব্যবহৃত নয়; যাতে প্রকৃতার্থের অপলাপ ঘটে।

মুসলিম কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত ও উল্লেখিত মহান আল্লাহ প্রত্যেক নামের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান রাখে, তার অর্থ বুঝে, তার নির্দেশানুযায়ী আমল করে এবং তার নামের অসীলায় তাঁর কাছে দুআও করে। *(কুঃ ৭/১৮০)*

মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা। তিনি কোন অবস্থাতেই কোন সৃষ্টির ক্ষণকালের জন্যও মুখাপেক্ষী হন না। তিনি সারা সৃষ্টি থেকে বে-পরোয়া। "যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়, সে জেনে রাখুক যে,

---

(৭) অতএব আব্দুল হাদী, আব্দুন্নূর, আব্দুস সুবহান, আব্দুল বাকী, আব্দুর রশীদ, আব্দুস সাত্তার নামগুলি ঠিক নয়। (মুমালঃ ২৩৪ পৃঃ) হাদী, নূর, রশীদ, বাকী ইত্যাদি নাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীসটি যয়ীফ।

(৮) আহলে সুন্নাহর বহু মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির এ ধরনের তা'বীল ও তাৎপর্য বর্ণনা করে গেছেন। আল্লাহ তাঁদের ভুল মার্জনা করবেন। কারণ সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার সাদৃশ্য ও তুলনা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং সৃষ্টির সদৃশতা হতে তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র করার সদুদ্দেশ্যই ছিল। (ইকঃ ৩৮পৃঃ)

আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।” *(কুঃ ২৭/৪০)* তিনি স্বেচ্ছাধীন, স্বয়ং সম্পূর্ণ। যে সকল পূর্ণতার গুণাবলীর তিনি অধিকারী, তা তাঁর জন্য স্বতঃই বিদ্যমান; যা তাঁর সত্তার জন্য ওয়াজেব। আর তাতে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কর্ম, তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর বদান্যতা তাঁর পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। তিনি কোন কিছুই কোন অবস্থাতেই কোন প্রকারে অন্যের সহায়তা নিয়ে করেন না। বরং তিনি যা করার ইচ্ছা করেন, তা নিজ স্বাধীন শক্তিতে স্বেচ্ছায় সম্পাদন করেন। তিনি কোন কিছুতেই অসফল নন। তিনি তাঁর ইচ্ছামত সকল কর্মে স্বয়ং কৃতার্থ। তাঁকে কেউ সাহায্য করে না এবং কেউ বাধাও দেয় না। সৃষ্টিলোকে তাঁর কোন মদদকারী নেই, নেই কোন অভিভাবক।

তিনি আল্লাহ। তিনি আমাদের সকলের প্রভু, প্রতিপালক, উপাস্য। তিনি ছাড়া আমাদের আর কেউ সহায় নেই, সত্যিকারের মাবূদ নেই।

ফিরিশ্তা

মুসলিম গায়বী ঈমান আনে। তাই অদৃশ্য হলেও আল্লাহর অগণিত ফিরিশ্তার উপর ঈমান ও বিশ্বাস রাখে। *(কুঃ৪/১৩৬)* যাঁরা আল্লাহর আজ্ঞানুসারে স্ব-স্বকর্তব্যে আত্মনিবেদিত। আকাশে, বাতাসে, চন্দ্রে, সূর্যে, পৃথিবীতে ও গ্রহ-নক্ষত্রে যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহর ইঙ্গিতে ফিরিশ্তাগণের তদবীরে ঘটছে। *(কুঃ ৭৯/৫)*

কিতাব ও সুন্নায় আমরা কতক ফিরিশ্তা এবং তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন হযরত জিবরাঈল ঐশীবাণী বাহক। হযরত ইসরাফীল শৃঙ্গে ফুৎকারের জন্য নিয়োজিত। হযরত মীকাঈল বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নির্ধারিত। মালাকুল মাওত, দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন করার কাজে, কিছু পর্বতের জন্য, মায়ের পেটে ভ্রূণের জন্য, কবরে বান্দাকে প্রশ্নের জন্য মুনকির ও নাকীর। চন্দ্র-সূর্যে অগ্নিতে জান্নাতে-জাহান্নামে বিভিন্ন ফিরিশ্তা নিয়োযিত রয়েছেন, ভূ ও নভমন্ডলে এমন কোন স্থান নেই, যেখানে আল্লাহর অনুগত ফিরিশ্তা নিযুক্ত নেই। *(সিসঃ ৮৫২নং)*

বান্দার হিফাযত ও তার পাপ-পুণ্য লিখার জন্য কেরামান-কাতেবীন নির্ধারিত। একজন পুণ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য বান্দার ডাইনে এবং একজন পাপ ও অসৎ আমল লিখার জন্য বান্দার বামে, আর হিফাযতের জন্য বান্দার অগ্রে ও পশ্চাতে ফিরিশ্তা নিয়োজিত। *(কুঃ ১৩/১১, ৪৩/৮০, ৪৫/২৮, ১০/২১, ৫০/১৭-১৮, ৮২/১০-১১)* অতএব ফিরিশ্তা দ্বারা তৈরী বান্দার সকল কাজের দফতর কিয়ামতে বিচার মাঠে সে নিজেই পাঠ করবে।

ফিরিশ্তা বান্দার অন্তরের কর্মও লিপিবদ্ধ করে থাকেন। বান্দা যখন কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে তখন ফিরিশ্তাগণ তার খেয়াল লক্ষ্য করেন। এরপর যদি সে পাপ করে বসে তবে একটি গোনাহ লিখেন। ইচ্ছা করার পর যদি আল্লাহর ভয়ে সে কাজ না করে, তাহলে একটি নেকী লিখেন। পক্ষান্তরে বান্দা যখন কোন ভালো কাজের নিয়ত করে, তখন তা কাজে পরিণত করার আগে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর তা কাজে পরিণত করার পর ১০ থেকে ৭০০ বা তারো বেশী নেকী লিখে দেন। *(বুঃ ৬৪৯১, মুঃ ১২৮ নং)*

ফিরিশ্তার সৃষ্টিবৈচিত্র সম্পর্কে আমরা ঠিক ততটুকু জানতে পারি, যতটুকু কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। কারণ, ফিরিশ্তা আমাদের দৃশ্য নয়। তাই মুসলিম কুরআন ও হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তা নির্ভুল সত্য বলে বিশ্বাস করে।

ফিরিশ্তা নূর (জ্যোতি) থেকে সৃষ্ট। *(মুঃ ২৯৬৬ নং)* তাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকেন, অথচ আমরা তাঁদেরকে দেখতে পাই না। রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হযরত জিবরীল ﷺ অহী নিয়ে অবতীর্ণ হতেন, অথচ পাশে সাহাবাগণ তাঁকে দেখতে পেতেন না।

ফিরিশ্তার ডানা আছে। *(কুঃ ৩৫/১)* তাঁরা ইচ্ছামত রূপ ধারণ করতে পারেন। যেমন তাঁরা মেহমান বেশে হযরত ইবরাহীম ﷺ -এর বাড়িতে এসেছিলেন। *(কুঃ ১৫/৫১)* ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা দিতে মানুষের রূপে নবী করীম ﷺ এর নিকট উপস্থিত হতেন। *(বুঃ ৫০, মুঃ ৮-নং)*

তাঁরা মহান আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা। কোন সময় তাঁর আদেশ উল্লংঘন করেন না। তিনি যা আদেশ করেন, তাঁরা তা পালন করেন এবং তাতে কোন প্রকার ক্লান্তিবোধ ও শৈথিল্য করেন না। *(কুঃ ২১/২০, ৪১/৩৮)* তাঁরা আল্লাহর নিকটতম সুসম্মানিত বান্দা। *(কুঃ ২১/২৬, ৭/২০৬)* তাঁদের বিবাহ-শাদী নেই, বংশানুক্রম জন্মও নেই। তাঁরা পুরুষও নন, স্ত্রীও নন। লিঙ্গবিহীন আল্লাহর এক সৃষ্টি। *(আমাঃ ১৩পৃঃ)* তাঁরা পানাহার করেন না। তাঁদের সে প্রয়োজন নেই। *(কুঃ ৫১/২৪-২৮)*

হারূত ও মারূত দুই ফিরিশ্তা। যাঁদের দ্বারা মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে যাদুর ফিতনায় ফেলে তাদের কঠোর পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁরই অনুগত ছিলেন।

কিন্তু তাঁরা মানুষে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। সুরা পান করে এক মহিলার স্বামীকে হত্যা করে তার সাথে ব্যভিচারের মত মহাপাপ করেছিলেন এবং তারই কারণে শাস্তি স্বরূপ তাঁদেরকে ব্যাবিলনের কোন কুঁয়ায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে -এসব কাহিনী গপেদের গপ্প মাত্র। বাস্তবের সাথে এই সব কাল্পনিক কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক এমনিভাবে হযরত দাউদ নবী ﷺ-এর একজন স্বামীকে ধোকা দিয়ে তার স্ত্রীকে বিবাহ করার গল্প, উয বিন উনুকের সমুদ্রে মাছ ধরে সূর্যে ভুনে খাওয়ার ইত্যাদি কেচ্ছা যা তফসীরের নামে পাওয়া যায়, সবই ঐ ধরনের গল্প। মুসলিম এ শ্রেণীর আজগুবি গল্প শক্ত ও বলিষ্ঠ দলীল ছাড়া বিশ্বাস করে না। *(মবঃ ৩১/৭১)*

ফিরিশ্তার গতিশক্তি বর্ণনাতীত। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াসি হাজার মাইল। কিন্তু ফিরিশ্তার গতি তারও অধিক। মহানবী ﷺ-কে কেউ কোন প্রশ্ন করলে তা শেষ হবার পূর্বেই হযরত জিবরীল ﷺ মহান আল্লাহর নিকট থেকে সপ্ত আকাশ ভেদ করে পৃথিবীতে উত্তর নিয়ে অবতরণ করতেন।

আল্লাহপাক ফিরিশ্তা দ্বারা মুমিনদের সাহায্য করে থাকেন। মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। মানুষ যে জিনিসে (দুর্গন্ধ ইত্যাদিতে) কষ্ট পায়, সে জিনিসে ফিরিশ্তারাও কষ্ট পেয়ে থাকেন। *(মুঃ ৫৬৪নং)*

মুসলিম আল্লাহর সকল ফিরিশ্তার প্রতি ঈমান রাখে এবং সকলকেই ভালোবাসে।

মুসলিম বিশ্বাস করে সেই সকল কিতাবকে যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বিভিন্ন রসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। যার নাম শুনেছে যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর, ফুরকান (কুরআন) ও সহীফা-এ ইবরাহীম -তার উপরে ঈমান আনে এবং যার নাম শুনে নি, যে ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে তার জানা নেই তার উপরেও ঈমান রাখে ও আল্লাহর কিতাব বলে সত্য জানে। এ বিশ্বাস ব্যতীত সে মুসলিম হতে পারে না।

মুসলিম এ কথাও সঠিক বলে জানে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল মানুষ দ্বারা নকলে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে বহু কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করা হয়েছে, বহু হেরফের করা হয়েছে তাতে। আল্লাহর কিতাবকে তারা (ইয়াহুদ ও নাসারারা) নিজেদের স্বার্থের অনুকূল বানিয়ে নিয়েছে। *(কুঃ ৫/১৩, ২/৭৫)* যে কিতাবদ্বয়ে বহু আম্বিয়ার চরিত্রে বিভিন্ন মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ আরোপ করা হয়েছে এবং আসল ধর্মকে বিকৃত করা হয়েছে।

আল্লাহর কিতাব কোন মানুষের রচিত হয় না। যা মনুষ্য-রচিত বলে প্রমাণিত হয়েছে, তা আল্লাহর কিতাব হতে পারে না।

আল-কুরআন

সাহিত্য-ভান্ডার, বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআন আরবী সাহিত্যের উন্নত স্বর্ণযুগে চ্যালেঞ্জস্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছিল। পাঠ্যমধুর, শ্রুতিমধুর এই কিতাব মুসলিমের জীবন সংবিধান। যাতে রয়েছে তাওহীদের বাণী, সৃষ্টির সত্য তথ্য, বিগত জাতির সঠিক ইতিহাস, কিছু ভবিষ্যৎবাণী এবং বহু উপদেশাবলী।

আল-কুরআনের প্রতিটি অক্ষর, বিন্দু, যের-যাবার-পেশ অপরিবর্তনীয়। আর এর সংরক্ষণের ভার নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহই। *(কুঃ ১৫/৯)* এতে কোন বাতিল কথা বা ভ্রান্ত দর্শন পরিবেশিত হয় নি। *(কুঃ ৪১/৪২)*

আল-কুরআন মহান আল্লাহর আরবী বাণী বা উক্তি। এটি তাঁর কথার কোন আরবী অনুবাদ নয়। এটি তাঁর সিফাত, কোন সৃষ্টি নয়। কথা তাঁর গুণরাজির অন্যতম। এ বাণী তাঁর নিকট হতে নিঃসৃত হয়েছে এবং পুনরায় তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে। কিয়ামতের কিছু পূর্বে মুসহাফের কাগজ থেকে সমস্ত বাণী উঠে যাবে এবং কাগজ সাদা রয়ে যাবে।

কুরআন সর্বপ্রথম 'লওহে মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ হয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে বায়তুল ইয্যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস রমযানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি শবেকদরে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। তারপর হযরত জিবরীল আমীন ﵇ দ্বারা প্রয়োজন মত প্রত্যেক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ বছরে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হয়। (মতান্তরে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তা প্রথম শুরু হয় রমযান মাসে শবেকদরের রাত্রিতে।) অবতীর্ণ হওয়া সাথে সাথে কুরআন তাঁর স্মৃতিস্থ হয়ে যেত। পরে তিনি

সাহাবীবর্গকে শুনাতেন। তাঁরাও মুখস্থ করতেন। কেউ বা নিতেন লিখে। যা পরে গ্রন্থাকারে লিখিত হয়।

অতএব কুরআন মহানবী ﷺ-এর রচিত কোন গ্রন্থ নয়। তিনি তো নিরক্ষর ছিলেন, লিখাপড়াই জানতেন না। *(কুঃ ৭/১৫৭-১৫৮)* তেমনি জিবরীল আমীনেরও কোন বাণী নয়। *(কুঃ ১৬/১০২)* তিনি মহান প্রতিপালকের কাছে যা শুনতেন আমানতের সাথে তাই মহানবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন।

পূর্ণ কুরআন ৩০ পারা। যে মনে করে, কুরআন সাহাবা কর্তৃক পরিবর্তিত, কিংবা কুরআন আসলে ৪০ অথবা ৯০ পারা; ৩০ পারা প্রকাশিত এবং বাকী কারো 'কলবে' গুপ্ত আছে, কিংবা এ কুরআন আসল কুরআন নয়, আসল যা হযরত ফাতেমার নিকটে ছিল ও পরে তা আহলে বায়তের ইমামদের নিকট রক্ষিত হয়, অথবা কুরআন কোন মানব-রচিত গ্রন্থ, তাহলে সে কাফের। *(কুঃ ৭৪/২৫-২৬, ২/১৮৭)*

মুসলিম কুরআন মাজীদকে আল্লাহর কালাম বলে মেনে নেওয়ার পর সে তার যথার্থ তা'যীম করে। তা দিবারাত্র সাধ্যমত পাঠ করে, তার অর্থ বুঝে তার উপর আমল করে। যেহেতু কুরআন তার জন্য তার সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে আসা জীবন-সংবিধান। তার প্রত্যেক নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। যা জীবিত মানুষের (বিশ্বাসীদের) পথের দিশারী, মৃতের জন্য কোন কাজের নয়।

কুরআন কারীম যেহেতু আল্লাহর বাণী (সিফাত), কোন সৃষ্টি নয়, সেহেতু কুরআন বা কালামুল্লাহর কসম বা হলফ খাওয়া যায় এবং তার অসীলায় দুআও করা যায়।

আল-কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি তথ্যই সত্য ও সঠিক। বিজ্ঞান বা অন্য কোন সঠিক তথ্যের সাথে তার কোন প্রকার সংঘর্ষ হতে পারে না। বিজ্ঞানের তথ্য মিথ্যা ও ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু কুরআনী তথ্য চিরন্তন সত্য ও অভ্রান্ত। *(কুঃ ৪১/৩৮)* সুতরাং মুসলিমের উচিত, বৈজ্ঞানিক প্রত্যেকটি তথ্যের সহিত কুরআনী তথ্যের সামঞ্জস্য সাধন না করা। কারণ, বিজ্ঞান যা আজ বলে, কাল তা ভ্রান্ত বলে বাতিল করে। যার ফলে সাথে সাথে কুরআনী তথ্যকে ভুল মানার আশঙ্কা থাকে।

বিজ্ঞানের (কোন কোন বিজ্ঞানীর) মতে সূর্য স্থির। কিন্তু কুরআনী তথ্যানুযায়ী সূর্য গতিশীল।*(কুঃ ১৮/১৭, ৩৬/৪০)* যেহেতু কুরআন তাঁর বাণী যিনি চন্দ্র-সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, তিনি বলেন সূর্য আবর্তন করে। সৃষ্টিকর্তাই জানেন কোন্‌টি স্থির, কোন্‌টি অস্থির। অতএব তিনি অস্থির বললে আবার কার কথায় মুসলিম সূর্যকে স্থির বলে মেনে নেবে?

ঠিক এ জন্যই মুসলিম ডারুইনের (বিবর্তনবাদ) থিউরিকে ভ্রান্ত বলে জানে।

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি দুনিয়ার আসমান বা প্রথম আসমানের নীচে অবস্থিত। *(কুঃ ৬৭/৫)* কুরআনের কোন তথ্যে কোন গ্রহে পৌঁছনোকে অসম্ভব বলা হয় নি। *(ফইবাঃ ২৫৯-২৭০পৃঃ)*

এই গ্রন্থে অবাস্তব কোন কথা নেই। পরস্পর-বিরোধী কোন উক্তি নেই। *(কুঃ ৪/৮২)* বুঝার ভুলে বাহ্যতঃ কোন কথাকে পরস্পর-বিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তবে কিছু 'মনসূখ' (রহিত) আয়াত আছে। *(কুঃ ২/১০৬)* যা আল-কুরআনের ব্যাখাতাগণ চিহ্নিত করে থাকেন।

কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের অসঙ্গত, বিকৃত, মনগড়া ও বাতেনী অর্থ বা ব্যাখ্যা করার দুঃসাহসিকতা মুসলিম কোনদিন করে না। কারণ তাতে মহান আল্লাহ যা বলতে

চান নি তাঁকে তা বলানো হয়। আর তা মহাপাপ ও মহাসর্বনাশ। *(কুঃ ৭/৩৩, ১৭/১৩৬, ২২/৮-৯)* বরং যে ব্যাখ্যা মহানবী ﷺ এবং সলফে সালেহীন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে তারই অনুসরণ করে। বিনা ইলমে কুরআনী বিষয় নিয়ে কোন তর্কে লিপ্ত হয় না। *(কুঃ ২২/৩-৪, ৪০/৩৫)* বরং যে বিষয় সে জানে না, সে বিষয়ে আন্দাজে কোন মন্তব্য না করেই বলে, 'আল্লাহই জানেন।' *(কুঃ ১৮/২২, ২৬)*

সুতরাং ওযূর আয়াতে *(কুঃ ৫/৬)* নিজের মনমত পা মাসাহ্ করার অর্থ করে না। বরং মাথা মাসাহ ও পা ধোয়ার অর্থ করে। যা মহানবী ﷺ কর্তৃক নির্দিষ্ট এবং সলফে সালেহীন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মাজীদের প্রত্যেক আয়াত এবং প্রত্যেক সূরার তরতীব (অনুক্রম) তাওকীফী। তা ইতিহাস বা তারীখ অনুসারে বিন্যস্ত করার অধিকার কারো নেই।

কুরআন হাকীমে এমন কতক আয়াত আছে, যা মানুষের বোধগম্য নয়। আর কতক রূপক আয়াত আছে, যার ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। মুসলিম তার উপর ঈমান রাখে। তা নিয়ে অজান্তে মাথা ঘামায় না। কিন্তু যাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে থাকে। *(কুঃ ৩/৭)*

কুরআন শরীফ ধারাবাহিকভাবে লিখিত কোন গ্রন্থ নয়। লিখিত আকারে অবতীর্ণও হয়নি কুরআন আযীয। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই তার অবতারণা। তাই তাতে একটা ঘটনা বা বিষয় বারবার বহু স্থানে প্রায় একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে একই ঔষধ বিভিন্ন বার ব্যবহার কিংবা একই রোগীর অবস্থা বিশেষে একই ঔষধের ব্যবস্থার মতই কুরআন শরীফের বর্ণনা। একজন সুযোগ্য বক্তার বিভিন্ন বক্তৃতামালা একত্র সন্নিবেশিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের অবস্থা যেমন হয়, কুরআন মাজীদের অবস্থাও ঠিক এ ক্ষেত্রে অনেকটা তদ্রূপ। *(কোশঃ ভূমিকা ১৩পৃঃ)*

আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহ সৃষ্টির উপর বড় দয়াবান। তাঁর দয়া ও রহমত ছড়িয়ে আছে সারা সৃষ্টি জগতে। তিনি জগৎ রচনা করেছেন। তার প্রত্যেকটি প্রাণী-অপ্রাণীর বোধশক্তি, বিচরণশক্তি, বরং তাদের যাবতীয় প্রকৃতি তাঁর জানা। তিনি জানেন যে, মানুষের অপরিপূর্ণ জ্ঞান নিজে নিজে পূর্ণ সত্য ও আলোকিত পথে পৌঁছতে পারে না। সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এক সমান নয়; কারো কম, কারো বেশী। একটা জিনিসকেই কেউ সুন্দর ভাবে, আবার অন্য কেউ অসুন্দর। কেউ ভালো বলে, কেউ মন্দ। কখনো বা একটা জিনিসকেই একই মানুষ এক সময় ভালো বলে, আবার অন্য সময় তাকে মন্দ বলে।

সুতরাং তাদেরকে নিরর্থক-বেকার না ছেড়ে যাতে করে তারা এক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তার জন্য তাদের প্রতি এহসান ও অনুগ্রহ করে যুগে যুগে নবী ও রসূল প্রেরণ করলেন মহান সৃষ্টিকর্তা। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে আম্বিয়া প্রেরণ না-ও করতে পারতেন। তাঁর উপর রসূল বা নবী প্রেরণ করা ওয়াজেব ছিল না। *(কুঃ ৩/১৬৪)* বলা

বাহুল্য, তাঁর উপর কিছু ওয়াজেব নয়। যেমন তাঁর উপর কোন বান্দার কোন প্রকার হক, অধিকার বা দাবী নেই। অবশ্য তিনি নিজে থেকে বান্দাকে কিছু হক প্রদান করেছেন।

হযরত আদম ﷺ-কে প্রথম সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে তাঁকেই সর্বপ্রথম নবী বানালেন। তদনন্তর কালে কালে প্রত্যেক জাতির জন্য আম্বিয়া এবং সর্বশেষে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে শেষ ও বিশ্বনবীরূপে প্রেরণ করলেন। যাতে তাঁরা তাঁর নিকট থেকে তাঁর প্রত্যাদেশ, নিষেধাজ্ঞা, পুরস্কার ও তিরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য অনুশাসন নিজ নিজ কওমের কাছে পৌঁছে দেন। সঠিক ও শান্তির পথের সন্ধান দেন। ভ্রান্ত ও অশান্তির পথের বেড়াজাল থেকে জাতিকে মুক্ত করেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের জ্ঞান দান করেন। *(কুঃ ৩/১৬৪)*

যাতে করে আম্বিয়া আগমন তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্ট মানুষের ইবাদত না করার ফলে শাস্তি প্রদানের উপর তাঁর হুজ্জত (বান্দার অভিযোগ অসারতা) কায়েম হয়। তাদেরকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত হয়। *(কুঃ ২০/১৩৪, ৪/১৬৫)*

যদি তিনি আম্বিয়া না পাঠিয়ে বান্দাকে তাঁর ইবাদত না করার দরুন শাস্তি দিতেন, তাহলে বান্দা আপত্তি ও অজুহাত পেশ করত। যেমন বলত,

“আল্লাহ আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা আমরা জানতাম না। কিংবা তিনি কেমন ইবাদত চান তা তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে দেন নি। ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি ও পরিমাণ ইত্যাদি আমাদের অজানা ছিল।

আল্লাহ আমাদেরকে এমন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে ভ্রম, অবজ্ঞা এবং গাফলতি ইত্যাদি সঞ্চারিত। উপরন্তু শয়তানকেও আমাদের পশ্চাতে অবারিত ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব এমন কিছু দিয়ে তাঁর সহায়তা করা উচিত ছিল, যা আমরা ভুলে গেলে আমাদেরকে সতর্ক করত। শয়তান আমাদেরকে কুমন্ত্রণা বা প্রলোভন দিলে বাঁচার পথ বলে দিত।

ধরে নিলাম যে, আমরা ঈমান ও আনুগত্যের সুফলতা এবং কুফ্র ও নাফরমানীর বিফলতা সম্পর্কে সব কিছু জানতাম; কিন্তু আমাদের জ্ঞানের পরিধি এ প্রকৃতত্বে পৌঁছে নি যে, যে ব্যক্তি নোংরামি ও অশ্লীলতা করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। পরন্তু আমরা নোংরা ও অশ্লীলতায় বড় আনন্দ ও মিঠা স্বাদ পেতাম, অথচ তাতে প্রভুর কোন ক্ষতিও ছিল না। আবার একথাও জানতাম না যে, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে, সে পুরস্কৃত হবে। কিন্তু জানতাম যে, ভালো কাজ করলে তাতে প্রভুর কিছু লাভ হয় না। প্রত্যেক কাজের হিসাব নেওয়া হবে তাও জানতাম না। তাই প্রবৃত্তি যেমন চেয়েছিল তেমনই আমরা আনন্দোপভোগ ও সুখ সম্ভোগে মত্ত হয়েছিলাম।” ইত্যাদি।

কিন্তু পয়গম্বর প্রেরিত হওয়ার পর এ রকম কোন ওজরই বাকী থাকতে পারে না। অতএব রিসালত ও নবুঅত বান্দার জন্য অতি প্রয়োজনীয় ছিল। যা অস্বীকার করার উপায় নেই। বরং সকল প্রয়োজন এমন কি খাদ্য-পানীয় থেকেও অধিক জরুরী ছিল। কারণ রিসালত জগতের আত্মা, প্রাণ ও জ্যোতি। তাই রিসালত ব্যতিরেকে জগতের কোন মঙ্গলই ছিল না। এ দুনিয়া তমসাচ্ছন্ন ও অভিশপ্ত হত, যদি না রিসালতের সূর্য তার আকাশে উদিত হত। তদনুরূপ যে মানুষের হৃদয়াকাশে নবুঅতের সূর্য উদিত হয় না, সে মানুষ গভীর ঘোর অন্ধকারে অন্ধ। নবুঅতের আত্মা ও জীবন যার দেহে সংযোগ হয় নি, সে জীবিত হলেও মৃত।

নবুঅত ও রিসালত আল্লাহর তরফ থেকে মনোনীত নবী ও রসূলের জন্য একটি দান ও সম্মান। তিনি নিজ ইচ্ছামত নবী ও রসূল নির্বাচিত করেছেন। *(কুঃ ২২/৭৫, ৬/১২৪)* নবুঅত কোন সাধনার বলে অর্জনীয় ধন নয়।

সুতরাং মুসলিম সমস্ত রসূল ও আম্বিয়ার প্রতি ঈমান রাখে এবং প্রত্যেককেই মহান আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত বলে বিশ্বাস করে। যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর ঐশীবাণী বান্দাদের নিকট পৌঁছাবার জন্য মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁদের ও তাঁরা যা বলেন তার সত্যতার উপর অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আম্বিয়া জ্ঞান ও কর্মের (আমলের) দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। কথায় সবার চেয়ে বেশী সত্যবাদী। ব্যবহারে সবার চাইতে শিষ্ট ও সুশীল। আচরণ ও চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর ও নিষ্কলুষ। সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও অসচ্চরিত্রতা থেকে নির্মল। দ্বীন-শরীয়ত, অহী ও রিসালতের তবলীগে তাঁরা মা'সূম ও ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত। তবে যেহেতু তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন, সেহেতু ছোটখাট সামান্য ভুল-ভ্রান্তি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু যে ভুল বা অবাধ্যতা তাঁদের দ্বারা হয়েছিল, তা সাধারণতঃ দুইভাবে মানা যায়ঃ-

প্রথমত ঃ অবাধ্যতা নবীর নবুঅতের পূর্বে ঘটেছিল। যেমন হযরত আদম ﷺ-এর ভুল ও নাফরমানী; যখন মহান আল্লাহ তাঁকে গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছিলেন অথচ তিনি তাই করে ফেলেছিলেন। *(কুঃ ২০/১২১)*

দ্বিতীয়ত ঃ বাহ্যতঃ যাকে নবীর অবাধ্যতা বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর অবাধ্যতা নয়; বরং ঃ

(ক) তা ইজতিহাদের ভুল। যা করতে হত তা না করে, যা করতে হত না, তা সঠিক ভেবে করে ফেলা। যার উপর -যা সঠিক তার বর্ণনা নিয়ে- আল্লাহর নির্দেশ ও সতর্কবাণী এসেছে। যেমন বদরের যুদ্ধবন্দীদের ঘটনা। মহান আল্লাহর (শরয়ী) ইচ্ছায় ছিল, নবী ﷺ তাদেরকে হত্যা করে দেন। কিন্তু তিনি সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের নিকট থেকে জরিমানা বা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দেওয়াটাকে সঠিক ভাবলেন। মুশরিক যুদ্ধবন্দীরা মুক্তি পেয়ে গেলে মহান আল্লাহর তরফ থেকে নবীর জন্য সতর্কবাণী এল। *(কুঃ ৮/৬৭, তইকাঃ ২/৩২৫)* সুতরাং এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন অবাধ্যাচরণ ছিল না।

(খ) অথবা এমন দুটি কাজ; যার উভয়ই করা চলে। তবে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়টি করা অধিক উত্তম। কিন্তু নবী দ্বিতীয়টি না করে প্রথমটিকে এখতিয়ার করেন। যার উপর মহান আল্লাহর সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয় এবং যা করা অধিক উত্তম ও ফলপ্রসূ তার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন নবী করীম ﷺ যখন কতক লোককে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দিলেন -অথচ আল্লাহর কাছে অনুমতি না দেওয়াটাই উত্তম ছিল- তখন তার বিজ্ঞপ্তি এল। *(কুঃ ৯/৪৩)* আর এটাও কোন অবাধ্যতা নয়।

তদনুরূপ নিছক কোন দুনিয়াদারীর ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে নবী কোন ভুল ধারণাপ্রসূত মত পেশ করতে পারেন। যেমন একদা তিনি খেজুরের মোছায় মোছা বেঁধে পরাগ-মিলন ঘটানোকে নিরর্থক মনে করে সাহাবাগণকে তা করতে নিষেধ করেন। খেজুরের ফলন কম হলে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করে অভিজ্ঞতার ভুল তিনি বুঝতে পেরে তাঁদেরকে বললেন, "তোমাদের দুনিয়াদারীর ব্যাপারে তোমরাই অধিক জান।

আর কোন পার্থিব ব্যাপারে আমার কোন রায় পালন করা জরুরী নয়। কারণ আমিও একজন মানুষ।" *(মুঃ ২৩৬২, ২৩৬৩ নং)*

অতএব আম্বিয়া নিষ্পাপ। কিন্তু নবী নয় এমন ব্যক্তিরা নিষ্পাপ নয়। কোন না কোন পাপ হয়েই থাকে; যদিও বা কোন ওলী হন। এই জন্য যে কোন নবীকে গালি দেবে কিংবা তাঁর চরিত্রে কোন মিথ্যা অপবাদ ও কলঙ্ক রটাবে ইসলামী আইনে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। তদনরূপ যাতে আম্বিয়া এবং সলফে সালেহীনদের মর্যাদা নাশ না হয় এবং তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকারের ব্যঙ্গোক্তি না আসে তাই তাঁদের কোন অভিনয় করতে ইসলাম অনুমতি দেয় না।

মুসলিম ঈমান আনে সেই সকল আম্বিয়া ও রসূলগণের উপর যাঁদের নাম কুরআন কারীম এবং হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে ([৭]) এবং অন্যান্য আম্বিয়াগণের উপরও ঈমান রাখে যাঁদের নাম কিতাব ও সুন্নায় আসেনি এবং যাঁদের নাম ও সংখ্যা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউই জানে না। কারণ, আম্বিয়াগণের সঠিক পরিসংখ্যান কুরআন ও সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না।

আম্বিয়াগণ সকলেই আল্লাহর তরফ থেকে মনোনীত হয়ে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করার আহবান নিয়ে তবলীগে-দ্বীনের কাজে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই একত্ববাদী ছিলেন।

যে সকল মহাপুরুষ ধর্মের ডাক নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে আগমন করেছিলেন ও যাঁদের কোন কথা কিতাব ও সুন্নায় পাওয়া যায় না- তাঁদের নবুঅতের ব্যাপারে মুসলিম 'তাওয়াক্কুফ' করে। অর্থাৎ, তাঁদেরকে নবী বলে স্বীকারও করে না। আবার অস্বীকারও করে না। তাঁরা নবী হতেও পারেন, আবার নাও হতে পারেন- যদি তাঁদের দাওয়াত ও তবলীগ তাওহীদের (এক আল্লাহর ইবাদত করার) জন্য হয় এবং তাঁদের চরিত্র আম্বিয়ার চরিত্রের মত হয় তবে। অন্যথা যদি তাঁদের আহবান তাওহীদের বিপরীত হয়, পৌত্তলিকতার প্রতি অথবা গায়রুল্লাহর ইবাদতের জন্য হয় অথবা তাঁদের চরিত্র আম্বিয়ার চরিত্রের বিপরীত হয় অথবা শেষ নবী ﷺ-এর পরে নবুঅতের দাবী করে, তাহলে মুসলিম আদৌ তাঁদেরকে নবী বলে মানতে পারে না।

আম্বিয়া ও রসূলগণকে প্রেরণ করার পর আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর তাদের অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্য ওয়াজেব করেছেন। যদি কেউ তাঁদেরকে অমান্য করে অথবা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তার জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। *(কুঃ ৪/১৪, ৪/৬৪)*

সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম ﵇, যিনি সর্বপ্রথম মানুষ এবং মানবকুলের পিতা। প্রথম রসূল হযরত নূহ ﵇। সর্বশেষ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। সমস্ত আম্বিয়া ও রসূলগণের মধ্যে ৫ জনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে; আর তাঁরা হলেন, হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ আলাইহিমুস স্বালাতু অস্‌সালাম। তাঁরা নবুঅতে এবং ঈমান আনার ব্যাপারে সকলে সমান। *(কুঃ ২/২৮৫)* কিন্তু আল্লাহ-প্রদত্ত মর্যাদায় তারতম্য আছে। *(কুঃ ২/২৫৩)*

([৭]) *উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে ২৫ জন আম্বিয়ার নাম উল্লেখ হয়েছে।*

আল্লাহ পাক আম্বিয়াগণকে অতিশয় মর্যাদা দান করেছেন। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহ কবরে বিনষ্ট হয় না। *(আদাঃ ১০৪৭ নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যাঁকে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি হলেন নবী এবং যাঁকে মিথ্যায়নকারী কাফের সম্প্রদায়ের জন্য (নতুন কিতাব সহ) প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি হলেন রসূল।

হযরত ঈসা ﷺ

হযরত ঈসা ﷺ অন্যতম নবী। তিনি আল্লাহর কালেমা ('কুন' বা 'হও' শব্দে সৃষ্টি হয়েছিলেন) এবং তাঁর তরফ থেকে 'রূহ' -যা হযরত মারয়্যামের গর্ভে ফুঁকা হয়েছিল। *(কুঃ ২১/৯১)* তাই তিনি বিনা পিতায় মাতৃজঠরে জন্ম নিয়েছিলেন। ([10]) তিনি জারজ নন। জন্মের পর মাতার পবিত্রতা এবং সতীত্বের সাক্ষীস্বরূপ অবোলা শিশু অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে কথা বলেছিলেন। *(কুঃ ১৯/২৯)* তিনি আল্লাহর পুত্র নন। তিনি তাঁর 'আব্দ্' (দাস) ও রসূল ছিলেন। *(কুঃ ৯/৩০)* তিনি আল্লাহও নন। *(কুঃ ৫/১৭, ৭২)* তিনের তৃতীয়ও নন। *(কুঃ ৫/৭৩)* আল্লাহপাক যেমন হযরত আদম ﷺ-কে বিনা জনক-জননীতে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি হযরত ঈসা ﷺ-কেও বিনা পিতায় সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ৩/৫৯)* আর এ কাজ তাঁর নিকট অতি সহজসাধ্য। *(কুঃ ১৯/২১)*

মহান আল্লাহ তাঁকে বহু প্রকার মু'জেযা বা অলৌকিক শক্তি দিয়ে তাঁর নবুঅতে সাহায্য করেছিলেন। যেমন, আল্লাহর অনুমতিক্রমে কাদা দিয়ে গড়া পাখির জীবনদান, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যধিগ্রস্তকে নিরাময় করণ, মৃতকে জীবনদান প্রভৃতি।

মারয়্যাম-তনয় ঈসা ﷺ অদ্যাবধি জীবিতই আছেন। শত্রুরা যখন তাঁকে বদ্ধ ঘরে হত্যা করতে আসে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেন এবং তাঁর সহচরবর্গের কোনও একজনকে তাঁর রূপ ও আকৃতি দান করেন, যাকে তারা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হযরত ঈসা ﷺ-কে হত্যা করতে বা ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে নি। *(কুঃ ৪/১৫৭-১৫৮)*

আখেরী যামানায় তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহ হবেন। ক্রুশ বা 'সলীব' ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। যখন ধন-সম্পদ এত বেশী হবে যে, গ্রহণকারী কেউ থাকবে না। তিনি শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মত হয়ে আগমন করবেন। শরীয়তে মুহাম্মাদিয়া অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করবেন এবং ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মই কারো জন্য মানবেন না। *(মুঃ ১৫৫ নং)* তখন সকল খ্রীষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। *(কুঃ ৪/১৫৯)*

([10]) *অতএব তাঁর মাতা মারয়্যাম বা মেরী। তাঁর পিতা কেউ নয়। ইউসুফ বা যোসেফ তাঁর পিতা নয়। যোসেফ তাঁর প্রতিপালনকারী বলে কথিত আছে।*

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ

মুসলিমরা সকল পরগম্বরের উপর ঈমান আনে। বিশেষ করে নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালতের উপর। তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী নেই। *(কুঃ ৩৩/৪০)* তাঁর পরেই ওহীর দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব যদি কেউ তাঁর পর নবুঅতের দাবী করে অথবা এই দাবী করে যে, তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তাহলে সে ভন্ড মিথ্যুক কাফের।

হযরত আহমাদ ﷺ জিন-ইনসান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত রসূল (দূত)। *(কুঃ ৩৪/২৮)* তাঁর ধর্ম সমস্ত ধর্মকে মনসূখ (রহিত) ও বাতিল করে দিয়েছে। তাই জগদ্বাসী মানব-দানবের জন্য তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করা ওয়াজেব।

নবী মুবাশ্শির ﷺ এর শরীয়ত মহাপ্রলয় দিবস কিয়ামত অবধি জারী থাকবে। হযরত ঈসা ﷺ পুনরায় পৃথিবীতে এসে তাঁরই শরীয়তের অনুসরণ করবেন। পূর্বে এক এক নবী এক এক দেশ, জাতি ও গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হতেন। কিন্তু তাঁর পরে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সারা পৃথিবী মাত্র একটি শহরের মত হয়ে যাওয়ার ফলেই আর দ্বিতীয় কোন নবীর প্রয়োজন হয় নি।

তিনি শরীয়তের কথা যা কিছু বলতেন নিজের তরফ থেকে বলতেন না। মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে যা প্রত্যাদেশ হত, তিনি তাই বলতেন। *(কুঃ ৫৩/৩-৪)* তাই তাঁর অমিয় বাণীতে অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই।

তাঁর প্রতি ঈমান আনার পর মুসলিমের উপর কয়েকটি জিনিস ওয়াজেব হয়ে পড়ে; তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে যথাসাধ্য জ্ঞানলাভ করা। তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর বর্ণিত সকল (সহীহ) বাণীকে সত্য জানা। তিনি যা আদেশ করেন, তা পালন করা, যা নিষেধ করেন তা বর্জন করা। তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া। সকল সৃষ্টির চেয়ে তাঁকে প্রিয় জানা। তাঁর প্রিয়কে প্রিয় বলে মানা। তাঁর শত্রুকে নিজের শত্রু বলে জ্ঞান করা।

নবী আবুল কাসেম ﷺ ছিলেন নবীকুল শিরোমণি। মানব-দানব কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ, বরং তিনি 'আশরাফুল মাখলূকাত' বা সকল সৃষ্টির সেরা ছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশোদ্ভূত।

কিয়ামতের মাঠে তিনি সকলের জন্য আল্লাহর দরবারে (বড়) সুপারিশ করবেন। 'মাকামে মাহমূদ' বা প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠান করবেন তিনিই। তাঁর হাতে 'হাম্দ' (স্তুতির) পতাকা হবে সেদিন। যে পতাকা তলে হযরত আদম ﷺ সহ সমগ্র মানবজাতি আশ্রয় নেবে। 'হাওযে কাওষার' বেহেশ্তের অমৃত-সরোবরের অধিকারী হয়ে উম্মতের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন তিনি।

তিনি আল্লাহর প্রিয়তম খলীল (বন্ধু)। আল্লাহর কাছে সমগ্র সৃষ্টি অপেক্ষা সর্বাধিক প্রিয় তিনি, যেমন তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় মহান আল্লাহ। তিনি মুত্তাকীনের ইমাম। সকল আম্বিয়ার ইমাম। আদম সন্তানের শিরোরত্ন। দুজাহানের অবিসংবাদিত নেতা। 'অসীলাহ' (জান্নাতের এক সু-উচ্চ স্থান) এবং 'ফযীলাহ' (পরম মর্যাদা)র অধিকারী। তাঁর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। হাশরের (পুনরুত্থানের) দিন তিনিই সর্বপ্রথম সমাধি

থেকে উত্থিত হবেন। যিনি বেহেশ্তের দরজা খুলবেন এবং সবার আগে তথায় প্রবেশ করবেন।

তিনি ছিলেন মনোরম শিশু, স্বভাব-সুন্দর কিশোর, চরিত্রবান ও আদর্শবান যুবক। অতি ঘোর অন্ধকার জাহেলিয়াতের যুগেও তিনি ছিলেন শিষ্ট-সুশীল, অমায়িক মধুর সদালাপী, বিনম্র, সৎ ও মহৎ মানুষ। তাঁর শত্রুরাও তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত আমানতদার বলে জানত। তাঁর সুশ্রী চেহারা মুবারকে সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট আভা ছিল। সত্য ও ন্যায়ের কাছে তিনি ছিলেন অতি কোমল ও নম্র। কিন্তু মিথ্যা, বাতিল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন অতি কঠোর ও সুকঠিন। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো কাছ থেকে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তাঁর মন ছিল উদার, বক্ষ ছিল প্রশস্ত। পরোপকারী ও পরের দুঃখে দুঃখী ছিলেন। তিনি ছিলেন সারা জগদ্বাসীর জন্য 'রহমত'। *(কুঃ ২১/১০৭)*

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মত রক্ত, মাংস ও অস্থির গড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের মত পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আমাদের মত তিনি খেতেন, পান করতেন। সুস্থ-অসুস্থ থাকতেন। বিস্মৃত হতেন, স্মরণ করতেন। বিবাহ-শাদী করেছেন, তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল। তিনি সন্তানের জনক ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। দুঃখ-শোক, ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা হত এবং তা অপবিত্র ছিল। তাঁর নাপাকীর ওযূ-গোসলের প্রয়োজন হত। *(তিঃ ২৪৯১ নং)* জীবিত ছিলেন, ইন্তিকাল করেছেন। মানুষের সকল প্রকৃতি ও প্রয়োজন তাঁর মাঝে ছিল।

তিনি ও সকল নবীই মানুষ ছিলেন। *(কুঃ ৬/৯১, ১৪/১১, ১৭/৯৩, ১৮/১১০, ২১/৩৪, ৪১/৬)* মুশরিক ও কাফেররা আম্বিয়াগণকে মানুষ বলে অস্বীকার করত। তাই তারা কখনো নবী ﷺ-কে গায়েবের খবর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করত। আল্লাহ বলেন, সে খবর তার কাছে নেই, আমার কাছে। *(কুঃ ৭৯/৪২)*

কখনো বলত, 'কখনোই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের বা আঙ্গুরের এক বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নদী-নালা প্রবাহিত করবে। অথবা তোমার ধারণা মত আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে। অথবা আল্লাহ ও ফিরিশ্তাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ-নির্মিত গৃহ হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে -কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনোও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করব।'

মহান আল্লাহ বলেন, 'বল, "পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল মাত্র।" *(কুঃ ১৭/৯০-৯৪)*

বলা বাহুল্য, মুশরিকরা তাঁকে মানুষ তথা নবী বলে মানত না। তাই মানুষের সাধ্যে যা নয় তাই তাঁকে করতে বলত। একজন মানুষ 'রসূল' হতে পারেন -এ কথায় তারা অবাক হত এবং তা অসম্ভব মনে করত। যার ফলে নবীকে মিথ্যাবাদী ধারণা করত। *(কুঃ ৭/৬৩-৬৪, ৬৯, ৩৬/১৫)* আবার কখনো তাঁকে সুদক্ষ যাদুকর মনে করত। *(কুঃ ১০/২, ২১/৩)*

তার নবীর জন্য মানুষ হওয়াকে দোষাবহ মনে করত। তাই বলত, 'মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে?' *(কুঃ ৬৪/৬)* বলত, 'এ কেমন রসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করে?' *(কুঃ ২৫/৭)* তারা তাদের সঙ্গী-সাথীদের বলত, 'এ তো

তোমাদেরই মত একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর, সে তো তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের অনুসরণ কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' *(কুঃ ২৩/৩৩-৩৪)*

পক্ষান্তরে কোন মানুষই তাঁর মত (সমান) নয়। আমরা তাঁর মত মানুষ নই। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কেউই তাঁর মত নয়। তিনি একটানা রোযা রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁর মত রাখতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'এ বিষয়ে তোমরা আমার মত নও। আমি তো রাত্রি অতিবাহিত করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।' *(মুঃ ১১০৩, মিঃ ১৯৮৬ নং)*

মুস্তাফা ﷺ সম্মুখে যেমন দেখতেন (বিশেষ করে নামাযে) পশ্চাতেও তেমনি দেখতেন। *(মুঃ ৪২৩ নং)* তাঁর অক্ষিদ্বয় নিদ্রাগত হত, কিন্তু হৃদয় সদা জাগ্রত থাকত। *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮ নং)*

শয়তান সকল মানুষের আকৃতি ধারণ করতে পারে, কিন্তু তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। *(বুঃ ১১০, মুঃ ২২৬৬ নং)* তাঁর দেহ ও ঘর্ম ছিল সুরভিত। *(মিঃ ৫৭৮৭ নং)* তাঁর ব্যবহৃত ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন (মলমূত্র ও রক্ত ছাড়া) সকল জিনিস ছিল মহৌষধ। তিনি ছিলেন সৃষ্টির সেরা মানুষ। আল্লাহর প্রিয়তম দোস্ত। তাঁর পূর্ব ও পরের ত্রুটি মার্জনা করা হয়েছিল। *(বুঃ ৪৮৩৬ নং, মুঃ)* সিনাচাক করে তাঁর হৃদয় পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ করা হয়েছিল। *(মুঃ ১৬৩ নং)*

মুজতাবা ﷺ ছিলেন উজ্জ্বল প্রদীপ। *(কুঃ ৩৩/৪৬)* তাঁর চেহারা ছিল পূর্ণিমার চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর। দেহের রঙ ছিল গৌরবর্ণ, যেন তা চাঁদি-নির্মিত। *(শাঃমুঃ ২৭, ২৯পৃঃ)* সমগ্র মানব জাতির প্রকৃতি থেকে তাঁর অত্যুচ্চ অতিপ্রাকৃত গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল। পৃথিবীতে কে ছিল, আছে বা হবে তাঁর মত? তাঁর সহিত সাধারণ মানুষের কি তুলনা? তিনি ছিলেন অসাধারণ, অতিমানুষ, মহামানব।

আল্লাহপাক তাঁর জন্য বহু-বিবাহ বৈধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় ও সংযমশীল। প্রায় তিনি ইবাদত, তাহাজ্জুদ ও রোযার মাধ্যমে দিবারাত্র অতিবাহিত করতেন। তিনি সংসার-বিরাগী ছিলেন না, কামুকও ছিলেন না। কামতৃষ্ণা নিবারণার্থে এত বিবাহ করেন নি। যদি তাই হত, তাহলে তিনি বেছে বেছে সবগুলিই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা কুমারী যুবতী বিবাহ করতেন। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে তিনি চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া সন্তানের মাতা এক বিধবাকে প্রথমা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর সেই প্রেমময়ী স্ত্রীর বর্তমানে (তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত) কোন বিবাহ করেন নি। আবার যখন তিনি একজন কুমারীকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন তখন তাঁর নিজের বয়স বাহান্ন বছর!

তিনি অপরকে কুমারী বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। *(বুঃ ৫০৮০, সঃজাঃ ৩৯৩২ নং)* কুমারী যুবতী এবং অকুমারী বিধবার মধ্যে পার্থক্যও জানতেন। কিন্তু তবুও তিনি প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে তাঁর মূল যৌবনে এক বিধবাকে এবং বার্ধক্যে একটি মাত্র কুমারী ও অবশিষ্ট অকুমারী এবং বিধবাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেছিলেন।

এ কথা জ্ঞানগম্যই নয় যে, যে পুরুষ কামাসক্ত হবে সে বিধবা বয়স্কাদের বিবাহ করবে এবং কুমারী যুবতীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। আবার পূর্ণ যৌবনকাল অতিবাহিত করে বৃদ্ধকালে বিবাহ করবে। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে সে যুগের আরবের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা যুবতীদেরকে অনায়াসে (অযাচিতভাবে) স্ত্রীরূপে বরণ করতে পারতেন।

আসলে তাঁর এই বহু-বিবাহের পশ্চাতে বহু মূল্যবান যুক্তি, তাৎপর্য ও কারণ আছেঃ-

১। **শিক্ষাগত কারণ ঃ** আদর্শ মানুষের একাধিক জীবন-সঙ্গিনী দ্বারা তাঁর চরিত্র, আভ্যন্তরীণ আচরণ, সাংসারিক আদর্শ এবং নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

২। **ধর্মীয় অনুশাসনগত কারণ ঃ** জাহেলিয়াতের এক প্রথা ছিল যে, পালিত পুত্রকে আপন ঔরসজাত পুত্রের সমান মনে করা হত। ওয়ারেস হত এবং তার স্ত্রী অর্থাৎ ঐ পুত্রবধুকে পালয়িতা শ্বশুরের জন্য চিরতরে বিবাহ হারাম মনে করা হত। অথচ শরীয়ত মতে মুখে বলা বা পাতানো অথবা পালিত পুত্র পালয়িত্রী মায়ের জন্য (যথাসময়ে পরিমাণ মত স্তনদুগ্ধ পান না করিয়ে থাকলে) মাহরাম নয়, আপোসে বিবাহ বৈধ এবং পর্দা ওয়াজেব। আর পালিত পুত্রের স্ত্রী পালয়িতা শ্বশুরের পক্ষে (চিরতরে) হারাম নয়। (তদনুরূপ পাতানো বোন ভায়ের জন্য, পাতানো খালা বা ফুফু বোনপোর বা ভাইপোর জন্য, পালয়িতা পিতা পালিতা কন্যার জন্য, পাতানো মামা বা চাচা ভাগ্নী বা ভাইঝির জন্য, পীর (?) কোন মহিলা মুরীদের জন্য, পীর-ভাই (?) পীর-বোনের জন্য অবৈধ বা মাহারেম নয়। এদের আপোসে বিবাহ বৈধ এবং পর্দা ওয়াজেব। কারণ শরীয়তে রক্ত, দুগ্ধ ও বিবাহের আত্মীয়তায় মাহারেম ছাড়া আর কোন মৌখিক আত্মীয়তায় মাহারেম গণ্য নয়। এ ধরনের আত্মীয়তা বন্ধুত্বরূপে গণ্য হয়।)

যেহেতু মুখে বলার চেয়ে কাজে পরিণত করে প্রদর্শনের প্রভাব মানুষের মনে অধিক পড়ে, তাই এই বাতিল প্রথার খন্ডন করে ঐ অনুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত যয়নাব (রাঃ) (তাঁর পালিতপুত্র যায়দের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী)কে মহান আল্লাহ আসমানেই তাঁর সহিত বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন।

৩। **সামাজিক কারণ ঃ** সুন্দর ও আদর্শ ভিত্তিক সমাজ গড়তে এবং সেই সমাজে যথার্থ প্রভাব অর্জন করতে, সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রতি অগ্রসর সহজ থেকে সহজতর হয়েছিল। সেই কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)কে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন।

৪। **রাজনৈতিক কারণ ঃ** শত্রুকে আপন করার জন্য বৈবাহিক সন্ধিস্থাপন এক পবিত্র নীতি। এতদ্ব্যতীত সম্মানদান, প্রবোধদান, আশ্রয়দান প্রভৃতি মানবিক নীতির অনুসরণ করে প্রিয় নবী ﷺ (হযরত সফিয়া, উম্মে হাবীবা, উম্মে সালামা, জুয়াইরিয়া প্রভৃতি মহিলাকে) বিবাহ-সূত্রে গেঁথে বহু মানুষকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। *(মাঃ মুঃ ১৯০)*

জ্ঞানের সাগর মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত বহু 'গায়বী খবর' জানতেন এবং জানাতেন। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর তিনি সংক্ষিপ্ত কথায় প্রকাশ করে গেছেন। ভূত-ভবিষ্যতের অনেক খবর তিনি প্রশ্নের উত্তরেও বলতেন। তিনি যে খবরই দিয়েছেন তা সূর্যবৎ সত্যরূপে ঘটেছে, বাস্তবে বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে।

ইসরা' ও মি'রাজ ভ্রমণের পরে মুশরিকরা তা মিথ্যা মনে করে সত্যতার প্রমাণ চেয়ে তাঁকে বায়তুল মাক্বদেসের নকশা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি মক্কা থেকেই তার ছবি দেখে পূর্ণরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পূর্বেই কোরাইশদলের কার কোথায় বধ্যভূমি হবে তার নাম ও স্থান চিহ্নিত করেছিলেন। *(মিঃ ৫৮৭১ নং)* খয়বরের এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁকে আমন্ত্রিত করে বিষ-মিশ্রিত মাংস খেতে দিয়েছিল, তা তিনি জানতে

পেরেছিলেন। *(মিঃ ৫৯৩১ নং)* মুসলিমদের গুপ্ত রহস্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্বলিত এক গোপন পত্র সহ এক মহিলা মুশরিকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাচ্ছিল, তার খবর জানিয়ে সাহাবা পাঠিয়ে তা প্রতিহত করেছিলেন। মুতা অভিযানে হযরত জা'ফর ও যায়দের (রাঃ) শহীদ হওয়ার সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ ফিরে আসার পূর্বেই মদীনায় অবস্থান করেই সকলকে জানিয়েছিলেন। *(বুঃ ৩৬৩০ নং)* তাঁর ইন্তিকালের পর আহলে বায়তের মধ্যে হযরত ফাতিমার (রাঃ) প্রথম মৃত্যু হবে তা জানিয়েছিলেন। ইত্যকার বহু বিষয়ের ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর তিনি জেনেছিলেন ও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ সব কিছু অহী (জিবরীল, স্বপ্ন বা ইলহাম) মারফৎ।

গায়বের খবর বলা হয়, বিনা কোন মাধ্যম বা অসীলায় জানা অদৃশ্য বা ভূত-ভবিষ্যতের খবরকে। আল্লাহর রসূল ﷺ গায়েব জানতেন না। আল্লাহ জাল্লা যিকরুহ অহীর মাধ্যমে তাঁকে যা জানিয়েছেন তাই তিনি জানতেন। নিজস্ব শক্তিতে গায়বী বা অদৃশ্যের খবর জানা একমাত্র সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সিফাত (গুণ)। এতে তাঁর কোন শরীক নেই। মহান আল্লাহ বলেন, "তাঁর নিকটেই গায়বের চাবি, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।" *(কুঃ ৬/৫৯)* "বল (হে নবী!) অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে। *(কুঃ ১০/২০, ১১/১২৩, ১৬/৭৭)* "তুমি বল, তারা কতকাল ছিল আল্লাহই জানেন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের (গায়বের) জ্ঞান তাঁরই।" *(কুঃ ১৮/২৬)* "বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে তা ওরা জানে না।" *(কুঃ ২৭/৬৫)* "বল, আমি তোমাদের এ বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে। অদৃশ্য (গায়বী বিষয়) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আমার প্রতি যা অহী (প্রত্যাদেশ) হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।" *(কুঃ ৬/৫০)*

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়বের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।" *(কুঃ ৭/ ১৮৮)*

"বল, --- আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে। আমি আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" *(কুঃ ৪৬/৯)*

"এ সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করেছি; যা এর পূর্বে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না।" *(কুঃ ১১/৪৯)*

"বল, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘ মিয়াদ স্থির করবেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত; সে ক্ষেত্রে আল্লাহ রসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।" *(কুঃ ৭২/২৫-২৭)*

অতঃপর আল্লাহর সম্মানিত আব্দ্ ও রসূলের জবানী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর রসূল। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে।" *(বুঃ ২৬৮৭, মুঃআঃ ৬/৪৩৬)*

একদা হযরত জিবরীল ﷺ তাঁকে কিয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি

বললেন, "এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত জিজ্ঞাসক অপেক্ষা অধিক অবগত নয়।" *(বুঃ, মুঃ ৮, আঃদাঃ ৪৬৯৫, তিঃ ২৬১৩, মিঃ ২নং)*

মুশরিকদের মৃত শিশুদের (মরণের পর) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "তারা কি কর্ম কি করত সে বিষয়ে আল্লাহই জানেন।" *(বুঃ ১৩৮৩, মুঃ ২৬৫৯)*

এক বিবাহ-আসরে রসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতে কতকগুলি ছোট ছোট বালিকা (মার্জিত) গীত গাচ্ছিল। এক ছত্রে তারা বলল, 'আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন, যিনি আগামী কালের খবর জানেন।' তা শুনে তিনি বললেন, "এটা বলো না, পূর্বে যা বলছিলে তাই বল।" *(বুঃ ৫১৪৭, মুঃ ৩১৪০ নং)*

প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশার (রাঃ) চরিত্রে কলঙ্ক রটলে তিনি মর্মাহত হলেন। গায়বের খবর জানলে রটা খবরে তিনি কর্ণপাত করতেন না। অতঃপর পবিত্রতার সাক্ষ্য নিয়ে সূরা নূরের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হলে নিঃসন্দেহে তিনি বুঝলেন যে, আয়েশা পবিত্রা। *(বুঃ ২৬৬১, মুঃ ২৭৭০ নং)*

তিনি হযরত যয়নাবের নিকট প্রত্যহ মধু পান করতেন। সপত্নী আয়েশা ও হাফসা (রাঃ) পরামর্শ করলেন যে, তাঁদের নিকট তিনি এলে প্রত্যেকেই তাঁকে বলবেন, 'আপনার নিকট মাগাফীর (এক প্রকার গাছ হতে নিঃসৃত মিষ্ট আঠালো রস) এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি মাগাফির খেয়েছেন।' বললেনও তাই। তিনি তাঁদের এ কথায় বিশ্বাস করে (যয়নাবের নিকট) মধু খাওয়া হারাম করলেন। যার উপর আয়াত অবতীর্ণ হল, "হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করার জন্য তা অবৈধ করছে কেন?" *(কুঃ ৬৬/১, বুঃ ৫২৬৭, দুঃমঃ ৮/২১৩)*

সুতরাং তিনি গায়েব জানলে স্ত্রীদের কথায় হালালকে হারাম করতেন না। মহান আল্লাহ বলেন, "স্মরণ কর, নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর তার সে স্ত্রী তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী এ বিষয়ে তার সে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না। নবী যখন তা তাকে জানাল, তখন সে বলল, 'আপনাকে কে অবগত করল?' নবী বলল, 'আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক্ অবগত।" *(কুঃ ৬৬/৩)*

আল-কুরআনের এই ঘটনা থেকেও বুঝা যায় যে, তিনি গায়েব জানতেন না।

এক সফরে হযরত আয়েশার (রাঃ) হার হারিয়ে গেল। একদল সাহাবার খোঁজাখুঁজির পরও তা পাওয়া গেল না। অবশেষে কুচ করার সময় উঁটের নিচে তা পাওয়া গেল। তিনি গায়েব জানলে অনর্থক খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট করতেন না।

তবুক অভিযানে তাঁর এক উঁট নিরুদ্দেশ হল। যায়দ বিন নুসাইব মুনাফিক বলল, 'মুহাম্মাদ নবী হওয়ার দাবী করে আসমানের খবর বলে দেয়, অথচ তার উঁট কোথায় তা তার জানা নেই!' তিনি বললেন, "এক ব্যক্তি এই কথা বলে। আল্লাহর কসম! তিনি যা জানান তা ব্যতীত আমার অন্য কিছু জানা নেই। *(আঃসিঃ ৩২৪পৃঃ)*

অনুরূপভাবে তিনি গায়েব জানলে বি'রে মাঊনায় ৭০ জন কারী শহীদ হতেন না এবং তাঁর অন্যান্য সকল বিপদ থেকে বাঁচার পথ পূর্বেই জানতে পারতেন।

এতদ্ব্যতীত আরো বহু পাক্কা দলীলের ভিত্তিতেই আহলে সুন্নাহ উপরোক্ত আকীদাহ রাখে। তাই ফাতাওয়া কাযীখান *(৪/৪৬৯)*তে বলা হয়েছে, 'ইলমে গায়েবের দাবীদার কাফের।' শারহে ফিকহে আকবার *(১৮৪পৃঃ)*তে বলা হয়েছে, 'আম্বিয়াগণ গায়েবের খবর জানতেন না।' দুর্রে মুখতার *(১/১৭)* এবং মুকাদ্দামাহ হেদায়াহ *(১/৫৯)*তে বলা

হয়েছে, 'ইলমে গায়েব আল্লাহ ছাড়া আর কোন মখলূকের নেই।'

পক্ষান্তরে গায়েব জানা নবুঅতের পরিপূরক কোন অংশ বা বিষয় নয়। তিনি গায়েব জানতেন না বললে তাঁর মর্যাদা ও নবুঅতের কোন প্রকার হানি হয় না। যেহেতু গায়েব জানা একমাত্র আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট্য। তাই তাতে কোন ফিরিশ্তা, নবী, অলী বা অন্য কেউ শরীক নয়। সেহেতু এই আকীদা প্রমাণ ও পোষণ করা এবং বিশ্বাস রাখা মহানবী ﷺ-এর প্রতি কোন প্রকার বেয়াদবী নয়। বরং তাঁর ও তাঁর নির্দেশের প্রতি যথার্থ আদব এবং আল্লাহর তাওহীদের উপর পূর্ণ ঈমান।

তিনি ইসলামের মুবাল্লিগ ও প্রচারক ছিলেন। তিনি ইসলামের রচয়িতা বা নির্মাতা ছিলেন না। তিনি আল্লাহর তরফ থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত পথভ্রষ্ট মানুষের জন্য প্রেরিত নূর (জ্যোতি বা আলো) ছিলেন। সেই নূর বা আলোতে জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগ ও সমাজ আলোকিত হল। দিশাহারা মানুষ সেই অলোকবর্তিকায় অন্ধকারে সরল পথের দিশা পেল। তাঁর দেহ নূরানী ছিল, কিন্তু তিনি নূর বা নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন না। মহান আল্লাহর সৃষ্টি বৃত্তান্তে একমাত্র ফিরিশ্তাই নূর থেকে সৃষ্টি। আর নবী মুস্তফা ﷺ ফিরিশ্তাও ছিলেন না। *(কুঃ ৬/৫০)* সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আরশ ও কলম সৃষ্টি করেন। *(মুঃআঃ ৫/৩১৭, শঃতাঃ ২৭৫পৃঃ)* নূরে মুহাম্মাদী আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি নয়। পক্ষান্তরে যে হাদীসে নূরে মুহাম্মাদীর কথা বলা হয়েছে, তা জাল বা বাতিল হাদীস।

মানুষের মত তাঁর দেহের ওজন ছিল। *(মিঃ ১১৪৭, ৫৭৭৪ নং)* তাঁর শরীরের ছায়া ছিল। বলা হয়, তাঁর নূরের ঝলকে দেহের ছায়া অপসারিত হত। কিন্তু তা সত্য হলে, তাঁর গৃহে কোন প্রদীপ বা আলোর প্রয়োজন পড়ত না। অথচ তাঁর সমস্ত বিবিগণই স্ব-স্ব প্রকোষ্ঠে প্রদীপ ব্যবহার করতেন। ([11])

তিনি বিনা 'আয়ন' বা 'আ'-এর 'আরব' (অর্থাৎ রব!) ছিলেন না। ছিলেন না বিনা 'মীম' বা 'ম'-এর আহমাদ (অর্থাৎ আহাদ!)। 'রব' ও 'আহাদ' তো আল্লাহ তাআলা। আর তিনি তো তাঁর 'আব্দ' ও 'রসূল' ছিলেন। তাঁকে যে আল্লাহর আরশে আসীন করে অথবা 'যিনি মুহাম্মাদ, তিনিই খোদা' মনে করে, সে পাক্কা মুশরিক এবং নাসারার মত কাফের। *(কুঃ ৩/৭৯-৮০, ফঃলঃ ১/৩১১)*

তিনি না হলে জগৎ সৃষ্টি হত না। অথবা 'সে ফুল যদি না ফুটিত, কিছুই পয়দা না হইত। না করিত আরশ-কুর্সী জলীল রব্বুল' বলে যে কথ্য বা হাদীস লোক মাঝে প্রসিদ্ধ আছে, তা ভ্রান্ত এবং জাল বা গড়া হাদীস। অতিরঞ্জনকারীরা ভক্তদের মনোরঞ্জনের খাতিরে কালিমাকে নয়নাঞ্জন বলে এরূপ হাদীস গড়ে লোক মাঝে প্রচার করেছে।

প্রত্যেক মানুষেরই আদি পিতা হযরত আদম ﷺ। সেই হিসাবে সকল মানুষই এক অপরের ভাই। এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। *(কুঃ ৯/১১, ৪৯/১০)* কিন্তু মানুষের পরিবেশে নিজের পিতা, পিতৃব্য, মাতুল অথবা সেই রকম কোন আত্মীয়কে ভাই বলা বেআদবী। তদ্রূপই আল্লাহর রসূল ﷺ একদিক থেকে আমাদের ভাই। তিনি নিজেও সাহাবাদের বলেছেন, "আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই।" কিন্তু সাহাবাগণ ﷺ কোন দিন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভাই বলে সম্বোধন করেন নি। তাঁরা তাঁর সহধর্মিনীগণ-কে 'আম্মা' বলতেন, কিন্তু তাঁকে 'আব্বা' বলতেন না। অতএব আমাদের জন্য তাঁকে 'আব্বা' বা 'বড় ভাই' বলা অনুচিত।

([11]) *প্রকাশ থাকে যে, তাঁর চেহারার নূরে হযরত আয়েশার (রাঃ) সূচ কুড়ানোর হাদীস শুদ্ধ নয়।*

তিনি আমাদের তা'যীমযোগ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, সম্মানের পাত্র, অনুসরণীয়, অনুকরণীয়, পথপ্রদর্শক, আল্লাহর রসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সকলের পিতা-ভ্রাতা থেকে বহু উর্ধ্বে।

যাঁরা আল্লাহর পথে মারা যান (শহীদ হন), তাঁরা মৃত নন, বরং জীবিত। *(কুঃ ২/১৫৪)* তাঁরা মরেও অমর থাকেন। এ ক্ষণস্থায়ী জীবন হারিয়ে তাঁরা অনন্ত সুখের জীবন পান। তবে সে জীবনের কথা আমাদের বোধগম্য নয়।

নবী করীম ﷺ কবরে বারযাখী জীবনে জীবিত আছেন। যেখানে তিনি অতিশয় শান্তির সামগ্রী লাভ করেছেন, যা আল্লাহ জাল্লা শা'নুহ তাঁর তাবলীগের প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে প্রদান করেছেন। পার্থিব জীবনের মত তিনি জীবিত নন। বরং সে জীবন ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্তী জীবন, মধ্যকাল যাকে 'হায়াতে বারযাখ' বলে।

অতএব অন্যান্য আম্বিয়ার মত তিনিও ইহলোক হতে ইন্তেকাল করেছেন। *(কুঃ ২১/৩৪, ৩৯/৩, ৫৫/২৬)* সাহাবায়ে কেরাম ﵃ তাঁর গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে তাঁর উপর জানাযার নামায পড়েছেন। অতঃপর হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় সমাধি খনন করে সমাধিস্থ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি পার্থিব জীবনের মত জীবিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় সাহাবাগণ তাঁকে জীবিত সমাধিস্থ করতেন না।

যদি না তিনি ইন্তেকাল করতেন, তাহলে মুসলিম জাহানে প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম নবী বিয়োগে সে হৃদয়-বিদারক শোক ও বেদনার ছায়া নেমে আসত না এবং আজ পর্যন্ত মুসলিম জাহানে এ নিকৃষ্টতম দুরবস্থা দেখা দিত না।

স্নেহময়ী কন্যা ফাতেমা (রাঃ) যখন পিতার নিকট তাঁর মৃত্যু আসার খবর শুনলেন, তখন তিনি কেঁদে উঠলেন। পুনরায় গুপ্তভাবে তিনি কন্যাকে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সহিত তাঁর (কন্যারই) প্রথম সাক্ষাৎ হবার (অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর) কথা জানালেন, তখন তিনি হেসে উঠলেন। কিন্তু তিনি যদি মৃত্যুর পরেও পার্থিব জীবনে জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি কাঁদতেন কেন? আবার মরণের পর তাঁর সহিত তাঁর প্রথম দেখা হবে শুনে খুশী হতেন কেন? *(মুঃআঃ ৬/২৮২)*

তিনি জীবিত নেই বলেই হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাক্র (রাঃ)-এর নিকট পিতার মীরাস চেয়েছিলেন। *(বুঃ ৪২৪০, আঃদাঃ ২৯৬৮ নং)*

সাহাবায়ে কেরাম ﵃ তাঁকে হারিয়েছিলেন বলেই খেলাফতের জন্য একত্রে জমায়েত হয়ে বিভিন্ন বাগ্‌বিতন্ডার পর হযরত আবূ বাক্র (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন।

তিনি যদি জীবিত থাকতেন এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের সাথে যদি তাঁর কোন আলাপ ও সম্পর্ক থাকত, তাহলে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ﵁ এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ﵁-এর যুগে মুসলিম জাহানে যে অঘটন ঘটেছিল তা ঘটত না। ফায়সালা ও নিষ্পত্তির জন্য নিশ্চয় সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনে এযামগণ তাঁর সমাধির নিকট এসে তাঁর পরামর্শ ও আজ্ঞা নিতেন। তিনি জীবিত থাকলে সে রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে কেউ নিজের প্রাণ দিত না।

বলা বাহুল্য তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর পবিত্র আত্মা বা রূহকে আল্লাহপাক 'আ'লা ইল্লিয়ীন' সর্বোৎকৃষ্ট উচ্চস্থানে স-সম্মানে স্থান দিয়েছেন।

ইহজগৎ থেকে ইন্তেকালের পর যেহেতু মানুষের সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তাই তিনি না কারো জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন, আর না কারোর মসীবত

বা দুঃখজ্বালা বিদূরিত করতে পারেন।[12] অথচ তিনিই আল্লাহর সৃষ্টিরত্ন, প্রিয় খলীল, মুস্তাফা ও মুজতাবা। তবুও তিনি তাঁর আব্দ্। আব্দ্ ও মা'বূদের আসন সদা ভিন্ন। দুঃখজ্বালা দূর করা তো মা'বূদের কাজ মাত্র।

উহুদ যুদ্ধে তাঁর চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হল। তিনি কাফের যোদ্ধাদের জন্য বদ্দুআ করলেন। আল্লাহর তরফ থেকে জবাব এল, "তোমার করণীয় কিছু নেই, তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন।" *(কুঃ ৩/১২৮)*

যখন "তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও" *(কুঃ ২৬/২১৪)* -এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ সকল আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে বললেন, "ওহে কুরাইশ দল! (তাওহীদ ও ইবাদত দ্বারা) নিজে নিজের প্রাণ বাঁচাও। আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। ওহে বনী আব্দে মানাফ! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন কাজে আসব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহর কাছে আপনার কোন উপকারে আসব না। হে ফুফু সফিয়্যাহ! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন সহযোগিতা করতে পারব না। হে বেটি ফাতেমা! যত ইচ্ছা আমার কাছে ধন-সম্পদ চেয়ে নাও। আমি আল্লাহর সমক্ষে তোমার কোন সাহায্য করতে পারব না।" *(বুঃ ২৭৫৩ নং)*

অর্থাৎ, তাঁর হিসাব ও আযাব হতে তিনি তাঁদের কাউকেও নিষ্কৃতি দিতে পারবেন না। একমাত্র নিজ নিজ ঈমান ও আমলই সকলকে মুক্তি দেবে।

বলা বাহুল্য, এইরূপ যদি আল্লাহর খলীলের হয় যে, তিনি না তাঁর বিনা অনুমতিতে কারোর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন, না পারবেন কাউকে তাঁর আযাব থেকে বাঁচাতে। আর না-ই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবেন। তাহলে অন্যান্য নবী এবং অলী-পীরদের কি হাল হতে পারে? "সেদিন একে অপরের জন্য কোন কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না এবং সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।" *(কুঃ ৮২/১৮)*

আবূ তালেবের মৃত্যুর সময় আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "চাচা! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলুন, আমি কিয়ামতে তা দলীলস্বরূপ আল্লাহর সামনে পেশ করে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করার সুপারিশ করব।" কিন্তু পার্শ্বেই আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া ও আবূ জেহল বসেছিল, তারা তাঁকে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করতে বাধা দিলে আবূ তালেব কালেমা পড়তে অস্বীকার করলেন। মহানবী ﷺ বললেন, "যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকব।"

কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল, "নবী এবং মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও বা তারা আত্মীয়-স্বজন হয়; যখন এ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা দোযখবাসী।" *(কুঃ ৯/১১৩)*

আবূ তালেবের ব্যাপারে আরো অবতীর্ণ হল, "(হে নবী!) তুমি যাকে প্রিয় মনে কর, তাকে হেদায়াত করতে (সৎপথে আনতে) পার না। ([13]) বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনতে পারেন। আর তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী।" *(কুঃ ২৮/৫৬)*

([12]) *অবশ্য সালামের জবাব ও নবীদের নামায পড়ার কথা স্বতন্ত্র।*

([13]) *কাউকে সৎপথে আনা কেবল আল্লাহর কাজ। আল্লাহর রসূল সৎপথ প্রদর্শন করে থাকেন। (কুঃ ৪২/৫২)*

আল্লাহর রসূল ﷺ একবার মায়ের কবর যিয়ারতে গেলেন। সঙ্গে কিছু সাহাবাও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কেঁদে উঠলেন। সাহাবাগণ কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আম্মার (আব্বার) কবর যিয়ারতের এবং ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ তাঁদের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি দিলেন না। আল্লাহর রসূল ﷺ এর মনে প্রশ্ন জাগল যে, হযরত ইবরাহীম ﷺ তো তাঁর পিতার জন্য (মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও) ইস্তিগফার করেছিলেন। আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল, "ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং তা (ইস্তিগফার) তাকে দেওয়া আল্লাহর একটি প্রতিশ্রুতির জন্য সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর যখন এ তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহীম তার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" *(কুঃ ৯/১১৪, তঃইঃকাঃ ২/৩৯৩)*

অতএব মহান আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের নিজস্ব ঘোষণা যে, তিনি আল্লাহর সৃষ্টির সেরা খলীল হওয়া সত্ত্বেও কাউকে হেদায়াত করতে, কারো বালা-মসীবত দূর করতে, কারো পাপ খন্ডন করতে, কাউকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবেন না। যদি তাই সম্ভব হত, তাহলে আপন স্নেহময়ী জননী, শ্রদ্ধাস্পদ পিতা, পিতৃব্য এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করতেন। ([14]) সুবহানাল্লাহ! তাঁর শান তাঁর হিকমতকে মানুষ নিজ কল্পনায় আনতে পারে না। *(ফাতহুল মাজীদ ১৬৮ পৃঃ)*

মোট কথা সকল মঙ্গলামঙ্গলের মালিক আল্লাহ। তিনি রসূল ﷺ বলেন, "বল, আমি তোমাদের কোন ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই। বল, আমাকে কেউই আল্লাহর পাকড়াও থেকে কখনোই বাঁচাতে পারবে না এবং আমি কখনো আল্লাহর প্রতিকূলে কোন আশ্রয় পেতে পারি না।" *(কুঃ ৭২/২১-২২)*

সালাফী বা আহলে হাদীস আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে যে, তিনি গায়েব জানতেন না। নিজস্ব এখতিয়ারে কারো মঙ্গলামঙ্গল সাধন করতে পারেন না। কারো বালা-মসীবত দূর করতে পারেন না। তাঁর অসীলায় দুআ করতে পারা যায় না। তিনি মানুষ ছিলেন এবং নূর বা আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন না। তিনি হাযির-নাযির নন। ইত্যাদি আকীদাহ রাখার ফলে তাঁর শান ও মর্যাদায় কোন কমি আসে না। তাঁর আসন তো বহু উপরে। তবে নিশ্চয় আল্লাহর সমতুল্য নয়। কারণ, এ সমস্ত কাজ ও গুণ তো শুধুমাত্র মহান আল্লাহর। এর বিপরীত আকীদায় তাঁকে আল্লাহর সমকক্ষ মানা হয়। অথচ আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই। অতিরঞ্জনে এরূপ বিপরীত আকীদাহ রাখলে আল্লাহর শান অবশ্যই কম করা হয়।

বরং এ ধরনের দাবী-দাওয়া জাহেলিয়াতের মুশরিকরা করত। তারা নবী ﷺ-কে কখনো গায়েবের খবর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করত। আল্লাহ বলেন, সে খবর তাঁর কাছে নেই; আমার কাছে। *(কুঃ ৭৯/৪২)*

কখনো বা বলত, "কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের বা আঙ্গুরের এক বাগান হবে। যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নদী-নালা প্রবাহিত

([14]) *পিতৃব্য আবূতালেব যেহেতু মহানবী ﷺ এর তবলীগে বড় সাহায্য করেছিলেন, তাই তাঁর সুপারিশে তাঁর কিছু আযাব হাল্কা করা হবে।*

করবে---।”

মহান আল্লাহ বলেন, “বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল মাত্র।” *(কুঃ ১৭/৯০-৯৪)*

মুসলিম তার প্রিয় নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে। সেই দরূদ, যা তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে শিখিয়ে গেছেন এবং পরবর্তী অনুগামীগণ যে দরূদ তাঁর উপর পাঠ করেছেন।

তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার সময় কেয়াম করা (দন্ডায়মান হওয়া) সাহাবা ও তাবেঈনদের আমল নয়। কারণ, তিনি হাযির-নাযির নন। (ইল্‌ম সহ) হাযির ও নাযির তো মহান আল্লাহ। তিনি কোন মহফিলে (ইন্তেকালের পর) উপস্থিত হন না। উম্মতি যে যেখান থেকেই দরূদ ও সালাম পাঠ ও পেশ করে, নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা সেই দরূদ আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বত মুসলিমের ঈমানের পরিপূরক। কোন মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার যাবতীয় প্রিয় বস্তু, নেতৃত্ব-সম্মান-গদি, ধন-সম্পদ, বাসস্থান, সকল মানুষ, নেতা-সর্দার, আত্মীয়-স্বজন, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা এবং নিজের জীবন থেকেও অধিক ভালোবেসেছে। *(কুঃ ৯/২৪, বুঃ ১৫, মুঃ ৪৪নং)*

এই ভালোবাসা বা মহব্বত শুধু দরূদ পাঠে বা (মনগড়া) মীলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয় না। বরং এই মহব্বতের জন্য একান্ত জরুরী তাঁর ইত্তেবা ও অনুসরণ করা। তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া। তাঁর যাবতীয় আদেশাজ্ঞা যথাসাধ্য পালন করা এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। *(কুঃ ৩/৩১)* তাঁর জন্মদিনে উৎসব করে আনন্দ উপভোগ করে নয়, তিনি যে জন্য বা যার জন্য জন্ম নিয়েছিলেন, তা বরণ ও পালন করে আনন্দ উপভোগ করা।

তাইতো রোযার ঈদ বা খুশী তাদের জন্য, যারা রোযাব্রত পালন করে। কুরবানীর ঈদ তাদের জন্য, যারা আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে অন্তর দিয়ে কুরবানী করে। উহুদের দিন মহানবী ﷺ হালোয়া বানিয়ে খেয়েছিলেন (কথাটি প্রমাণ-সাপেক্ষ) তাই সেদিনকে স্মরণ করে হালোয়া বানিয়ে খেলেই তাঁর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ হয় না। কারণ তিনি হালোয়া খেয়েছিলেন উহুদ যুদ্ধে তাঁর দন্ত মুবারক শহীদ হয়েছিল বলে। তাই প্রকৃত মহব্বতের পরিচয় দিতে হলে জিহাদে দাঁত ভেঙ্গে হালোয়া খেতে হবে। খুশীর বিষয়ে থাকা এবং কষ্টের বিষয়ে ফাঁকি দেওয়া মহব্বত নয়, ধৃষ্টতা। তাছাড়া কেউ কারো অবাধ্যতা করে তার মহব্বত ও ভালোবাসার আশা করতে পারে না। একজন স্ত্রী যদি তার স্বামীর মন ও কথামত না চলে শুধু স্বামীর মৌখিক তারীফ ও গুণগান করে, একজন ছাত্র যদি তার শিক্ষকের আদেশমত না চলে শিক্ষকের শুধু প্রশংসাগান গেয়ে বেড়ায় এবং ভালোবাসার দাবী রাখে, তাহলে তা সত্যই হাস্যকর।

মুসলিমের ভালোবাসা যেমন খুশী ও স্বার্থে থাকে, তেমনি কষ্ট, ত্যাগ ও বিসর্জনেও থাকে। তারই নাম তো ভালোবাসা।

কালে কালে পৃথিবীতে নবীর আগমন ঘটেছে। প্রত্যেক নবী নিজ শরীয়ত প্রচার শুরু করতেন, কিন্তু মানুষ তাঁকে চিনতে পারত না। যত তিনি তাদের মনে সত্যের বিশ্বাস আনার চেষ্টা করেন, ততই অভাগারা তাঁকে পাগল, কবি বা সুদক্ষ যাদুকর বলে দূরে সরিয়ে দেয় অথবা নিজেরা নবীর নিকট হতে সরে যায়। এমন সময় এক শক্তির প্রয়োজন ছিল, যা তাদের ভুলে ভরা অন্তরকে ধোলাই করে সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে দেয়। আর সেই শক্তিই ছিল আল্লাহর তরফ থেকে আসা অলৌকিক শক্তি বা মু'জেযা।

মু'জেযা সেই অলৌকিক বাক্যবিন্যাস, যা সাধারণতঃ কেউ বলতে বা রচনা করতে পারে না। অথবা এমন ঘটনা যা সাধারণতঃ ঘটে না। যা লৌকিক বা স্বাভাবিক নয়। সেই অলৌকিক, অসাধারণ ও অস্বাভাবিক কথামালা বা ঘটনাকে মু'জেযা বলে -যখন তা নবীর নবুঅতের বা রসূলের রিসালতের দাবীর সমর্থনে হয় এবং তাঁর অসমর্থকদেরকে চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু হুবহু সেই রকম অথবা প্রায় সেই রকম অঘটন ঘটাতে কেউ সক্ষম হয় না।

এই মু'জেযার কয়েকটি শর্ত রয়েছে ঃ-

১। মু'জেযা কোন কথামালা (যেমন আল-কুরআন) অথবা কোন ঘটনা-প্রবাহ হবে। যেমন নবী করীম ﷺ-এর আঙ্গুলের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া। হযরত ইবরাহীম ﷺ-কে আগুনে না জ্বালানো প্রভৃতি।

২। তা অলৌকিক ও অস্বাভাবিক হবে।

৩। কোন নবী বা রসূলের দ্বারা তা সংঘটিত হবে।

৪। নবুঅত বা রিসালতের দাবীর সমর্থনে হবে।

৫। দাবী অনুযায়ী সত্য হবে। বিপরীত হলে তা মু'জেযা নয়। যেমন যদি কেউ বলে, আমার সত্যতার নিদর্শন সমুদ্রের পানি দু'ভাগ হবে। কিন্তু তা না হয়ে পাহাড় বিদীর্ণ হল, তাহলে তা মু'জেযা নয়।

৬। মু'জেযা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে। সেই রকমটি করতে আর কেউ সক্ষম হবে না। অতএব যাদু বা জিন দ্বারা কোন কিছু ঘটানো মু'জেযা নয়।

মুসলিম আম্বিয়াগণের মু'জেযার উপর ঈমান রাখে, বিশ্বাস স্থাপন করে, অভ্রান্ত সত্য ও বাস্তব বলে জানে। হযরত নূহ নবীর (আঃ) তুফান, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) অগ্নির মাঝে থেকেও দগ্ধ না হওয়া, হযরত ইসমাঈল ﷺ-কে যবেহ করতে গিয়ে যবেহ না হওয়া, হযরত ইসমাইলের (আঃ) পদাঘাতে যমযম কুঁয়ার উৎপত্তি হওয়া, 'মাকামে ইবরাহীম' পাথরে তাঁর পায়ের নক্সা পড়া, হযরত দাউদের (আঃ) সাথে পর্বতের তসবীহ পাঠ, হযরত সুলাইমানের (আঃ) পাখীর ভাষা বুঝা, হাওয়ায় তক্তা চলা, হযরত মূসার (আঃ) লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, হাত বাহুমূলে রাখার পর নূরে চমকানো, সমুদ্র চিরে রাস্তা হওয়া, হযরত ঈসার (আঃ) মৃতকে জীবিত করা, স্পর্শ দ্বারা রোগীকে রোগমুক্ত করা, জন্মান্ধত্ব দূর করা, মাটির তৈরী পাখীকে জীবিত রূপ দেওয়া, ইত্যাদি সমস্ত মু'জেযা বা অনৈসর্গিক ঘটনাবলীকে মু'মিন খাঁটি সত্য ও বাস্তব বলে বিশ্বাস করে। কারণ, এ সব মু'জেযা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ

আমাদেরকে জানিয়েছেন।

আমাদের শেষ নবী ﷺ-কেও দেওয়া হয়েছিল বহু অলৌকিক শক্তি। তাঁর সবচেয়ে বড় মু'জেযা ছিল বিজ্ঞানময় গ্রন্থ, মুসলিমের জীবন-সংবিধান 'আল-কুরআন'। তাছাড়া তাঁর অঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। *(বুঃ ৩৬৩৬, মুঃ ২৮০০ নং)* তাঁর সত্যতার সাক্ষি দিতে হস্তমুষ্টিতে কঙ্কর তসবীহ পড়েছিল। *(দাঃনঃ ৩৩পৃঃ)* কয়েকটি বৃক্ষ চলমান অবস্থায় তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। *(মুঃ ৩০১২, মিঃ ৫৮৮৫ নং, শঃসুঃমিঃ ৫৯২২, দাঃমিঃ ৫৯২৫ নং)*

তিনি যে খেজুর গাছে খোতবা পাঠ করতেন নতুন মিম্বর তৈরীর পর তা বর্জন করলে কেঁদে উঠেছিল। *(বুঃ ৪৪৯ নং)* তিনি ইসরা' ও মি'রাজ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। *(কুঃ ১৭/১)* পূর্বে যা ঘটেছে এবং আগামীতে যা ঘটবে তার অনেক কিছুর তিনি নির্ভুল বর্ণনা দান ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বহুবার সামান্য খাদ্যদ্রব্য তাঁর হাতে বহু খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। *(দাঃনঃ ১৩৬-১৩৭ পৃঃ)* পানপাত্রে অঙ্গুলি রাখলে ঝরনা নির্ঝরিত হয়েছিল কয়েকবার। *(বুঃ ৩৫৭৯ নং)* এতদ্ব্যতীত আরো বহু অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী তাঁর হাতে সংঘটিত হয়েছিল। এ সব কিছুকে মুসলিম নিঃসন্দেহে প্রকৃত বাস্তব বলে বিশ্বাস করে।

ইসরা' ও মি'রাজ

হিজরতের পূর্বে এক রাত্রে আল্লাহর নির্দেশে বুরাকে সওয়াব হয়ে প্রিয় নবী ﷺ হযরত জিবরীল আমীনের সহিত বায়তুল মাকদেসে যান। সেখানে আম্বিয়াগণের সওয়ারী বাঁধার স্থানে বুরাক বেঁধে দুই রাকাআত নামায পড়েন। অতঃপর জিবরীল ﷺ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসমানের প্রতি চড়েন। কিছু প্রশ্নোত্তরের পর প্রথম আসমানের দরজা খোলা হয়। সেখানে হযরত আদম ﷺ-কে দেখেন। অতঃপর দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা ﷺ ও হযরত ইয়াহয়্যা ﷺ-কে, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসূফ ﷺ -কে, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস ﷺ-কে, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন ﷺ-কে, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা ﷺ-কে এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম ﷺ-কে দেখেন এবং সকলেই তাঁর জন্য অভ্যর্থনা ও দুআ করেন। সেখানে বায়তুল মা'মুর এবং সিদরাতুল মুনতাহা (এক অপরূপ সুবৃহৎ বৃক্ষ) দেখেন। হযরত জিবরীল ﷺ-কে দ্বিতীয়বার তাঁর প্রকৃতরূপে (ছয়শত পক্ষে) দর্শন করেন। অতঃপর আল্লাহপাক তাঁর প্রতি যা ওহী করার তা করেন। তাঁর বহু মহান নিদর্শনাবলী দর্শন করেন। যা দান করার তা দান করেন এবং পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন।

অবতরণের পথে হযরত মূসা ﷺ-এর অভিজ্ঞতা লব্ধ পরামর্শ আল্লাহ তাআলার নিকট কয়েকবার ফিরে গিয়ে পঞ্চাশের স্থলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে পৃথিবীতে (মক্কা মুকার্রামা) প্রত্যাবর্তন করেন। *(মুঃ ১৬২)*

মক্কা মুকার্রামা থেকে প্যালেস্টাইনের বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এই ভ্রমণকে ইসরা' এবং সেখান থেকে নভঃভ্রমণে আল্লাহর সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়াকে মি'রাজ বলে। বায়তুল মাকদেসের প্রতি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ছিল, পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের বিভিন্ন স্মৃতি প্রদর্শন, কুরাইশদের মনে মহানবী ﷺ-এর মি'রাজ প্রসঙ্গে প্রত্যয় জন্মানো। যেহেতু

শুধুমাত্র আসমানের খবর শুনলে তারা অবিশ্বাস করত। কারণ এসব তাদের গোচর বহির্ভূত। কিন্তু যখন তারা বায়তুল মাকদেসের নকশা এবং সেই পথে প্রত্যাবর্তনকারী তাদের বণিকদল সম্বন্ধে তাঁর নিকট হতে জানতে পারল, তখন তাদের অনেকে বিশ্বাস করেছিল।

মুসলিমরা মহানবী ﷺ-এর ইসরা' ও মি'রাজ সফরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁর প্রিয় হাবীবকে নিজ সান্নিধ্যে ডেকেছিলেন -তাঁর কিছু নিদর্শনাদি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। *(কুঃ ১৭/১)* যাতে শরীয়ত প্রচারে তাঁর মনোবল দৃঢ় হয়। এ নভঃভ্রমণ তাঁর স্বপ্নে নয়, খেয়ালে নয়। বরং সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় হয়েছিল। যদি তা কোন স্বপ্ন বা খেয়াল হত, তবে মুশরিকরা তা শোনা মাত্র অবিশ্বাস ও অস্বীকার কেন করত? পরন্তু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট এ সব অতি সহজ।

তিনি মি'রাজে এক রাত্রির কিছুকাল ছিলেন। মি'রাজে ২৭ বছর কাটানোর কথা ও ফিরার পরও ওযুর পানি বইতে থাকা, বিছানা গরম থাকা ইত্যাদি কথার কোন ভিত্তি কুরআন ও হাদীসে মিলেনা।

সঠিক কোন তারীখের রাত্রি ছিল তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। এ দিনটিকে স্মরণ করে কোন পালনীয় উৎসব ইসলামে নেই।

সৃষ্টির এক চির অবধারিত সত্য মৃত্যু। যার প্রতি কারো অবিশ্বাস নেই। যে জন্মেছে তাকে মরতেই হবে। *(কুঃ ৩/১৮৫, ২১/৩৫, ২৯/৫৭)* ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। *(কুঃ ৫৫/২৬)* এ মৃত্যু থেকে যদি কেউ পরিত্রাণ পেত, তবে সৃষ্টির সেরা মানুষ আল্লাহর খলীল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতেন না।

প্রতি জীবের জন্য মৃত্যের একটি নির্দিষ্ট সময় বাঁধা আছে। তার মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে না পেরে সকলেই ঐ নির্ধারিত সময়ে মরতে বাধ্য। *(কুঃ ৭/৩৪)* আবার সেই সময় এবং মৃত্যুর স্থান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। *(কুঃ ৩১/৩৪)*

মুমিন বান্দার যখন ইন্তেকালের সময় উপস্থিত হয় তখন আসমান হতে শুভ্র উজ্জ্বল-সূর্যবৎ রূপের ফিরিশ্তা সঙ্গে বেহেশ্তী কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে অবতরণ করেন এবং মুমিনের দৃষ্টি সমক্ষে উপবেশন করেন। অতঃপর মালাকুল মওত্ (আঃ) উপস্থিত হয়ে তার শীর্ষদেশে বসে বলেন, 'হে পবিত্র আত্মা ! আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমার প্রতি নির্গত হও।' তৎক্ষণাৎ কলসী থেকে গড়িয়ে আসা পানির ন্যায় অবলীলাক্রমে আত্মা বহির্গত হয়। মালাকুল মওত (আঃ) তা হাতে নেন। অতঃপর পলকের মধ্যে পূর্বের ফিরিশ্তাগণ তাঁর হাত থেকে নিয়ে সুগন্ধময় কাফনে রাখেন এবং তা থেকে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মিস্কের সুবাস নির্গত হতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সেই আত্মাসহ আসমানের প্রতি উড্ডীন হন। যাবার পথে প্রত্যেক ফিরিশ্তা দল তাঁদেরকে প্রশ্ন করেন, 'এ পবিত্র আত্মা কার?' তাঁরা পৃথিবীতে প্রচলিত তার সর্বোত্তম নাম নিয়ে বলেন, ওমুকের ছেলে ওমুকের। অতঃপর দুনিয়ার আসমানের (প্রথম আকাশের) নিকট পৌঁছে তাঁরা আসমানের দ্বারোদ্ঘাটন করতে বলেন। দুয়ার উন্মুক্ত করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক আসমানের নিকটতম ফিরিশ্তাদল ঐ আত্মার সম্মানার্থে তাঁদের পশ্চাদ্গামী হয়ে

পরবর্তী আসমান পর্যন্ত সঙ্গ দেন। আর এইভাবে সপ্তম আসমানে উপনীত হন। তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দার কিতাব ইল্লীয়ীনে লিপিবদ্ধ কর এবং তাকে পুনরায় পৃথিবীর দিকে প্রত্যাবর্তিত কর।" অতঃপর সেই আত্মাকে অবিলম্বে তার নিজ দেহের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

কাফেরের মৃত্যুর সময় আসমান হতে কৃষ্ণকায় ফিরিশ্তা সঙ্গে মোটা বস্ত্র নিয়ে অবতরণ করেন এবং তার দৃষ্টি সমক্ষে উপবেশন করেন। অতঃপর মালাকুল মওত (আঃ) উপস্থিত হয়ে তার শীর্ষদেশে বসে বলেন, 'রে খবীস (অপবিত্র) আত্মা! আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের প্রতি নির্গত হ'। তৎক্ষণাৎ আত্মাটি দেহের ভিতরে ভয়ে ছুটা-ছুটি করতে লাগে। অতঃপর সিক্ত পশম হতে (জং ধরা) শলাকাখন্ড নিষ্কাশিত করার ন্যায় দেহ থেকে আত্মাকে জোরপূর্বক বিছিন্ন করা হয়। মালাকুল মওত (আঃ) তা হাতে নেন। অতঃপর পলকের মধ্যে পূর্বের ফিরিশ্তাগণ তাঁর হাত থেকে নিয়ে সেই মোটা বস্ত্রে রাখেন এবং তা থেকে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম মৃত পচার দুর্গন্ধ নির্গত হতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সেই আত্মাসহ আসমানের প্রতি উড্ডীন হন। যাবার পথে প্রত্যেক ফিরিশ্তাদল তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ খবীস আত্মা কার?' তাঁরা পৃথিবীতে প্রচলিত তার সবচেয়ে মন্দ নাম নিয়ে (ঘৃণার সাথে) বলেন, 'ওমুকের বেটা ওমুকের।' অতঃপর প্রথম আসমানের নিকট পৌঁছে আসমানের দ্বারোদ্ঘাটন করতে বলেন। কিন্তু তার জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করা হয় না। (আল্লাহ বলেন, "অবশ্য যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয় আকাশের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না। আর তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দেব। তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরে (আযাবের) আচ্ছাদন হবে। এভাবে আমি অত্যাচারীদের প্রতিফল দেব।" *(কুঃ ৭/৪০-৪০)*

তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্লা বলেন, "ওর কিতাব পাতালের সিজ্জীনে লিপিবদ্ধ কর।" অতঃপর অবিলম্বে সেই আত্মাকে পৃথিবীর দিকে ঘৃণাভরে নিক্ষিপ্ত করা হয়। "যে আল্লাহর অংশী (শির্ক) করে তার অবস্থা ঃ সে যেন আকাশ হতে পড়ে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরীবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে।" *(কুঃ ২২/৩১)* তারপর সেই আত্মাকে তার দেহের সাথে সংযুক্ত করা হয়। *(মুঃ আঃ ৫/২৮৭, আঃ দাঃ ৪৭৫৩)*

কবর ও মধ্যকাল

মানুষের সকল জীবনের তিনটি কাল রয়েছে। ইহকাল, মধ্যকাল ও পরকাল। মরণের পর কবরে অবস্থান কালকে মধ্যকাল বা 'আলমে বারযাখ' বলা হয় এবং মহাপ্রলয় বা কিয়ামত হবার পর থেকে শুরু হয় পরকালের জীবন। যদিও মধ্যকাল এক প্রকার পরকালেরই অংশ।

মৃত মুমিনকে সমাধিস্ত করার পর যখন তার আত্মাকে দেহমধ্যে সংযুক্ত করা হয় তখন মুনকির ও নাকির (নীল চক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় দুই ফিরিশ্তা) কবরে উপস্থিত হয়ে তাকে বসান এবং প্রশ্ন করেন, 'তোমরা রব (প্রতিপালক) কে?' মুমিন বলে, 'আমার

রব আল্লাহ।' তাঁরা বলেন, 'তোমার ধর্ম' কি ? সে বলে, 'আমার ধর্ম ইসলাম।'

অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি ঈঙ্গিত করে তাঁরা প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের মাঝে প্রেরিত এ ব্যক্তি কে?' সে বলে , 'আল্লাহর রসূল' ﷺ। তাঁরা বলেন, 'কেমন করে জানলে তুমি?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পড়েছি এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে জেনেছি।'

তাঁরা পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ?' সে বলে ,'দুনিয়ায় আল্লাহকে দেখা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।'

অনন্তর আকাশবাণী আসে, "আমার বান্দা সত্যই বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতী পোষাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের প্রতি (কবর থেকে) একটি দুয়ার খুলে দাও।" অতঃপর জান্নাতী সুগন্ধময় শীতলবায়ু তার কবরে আসতে থাকে।

তার কবরকে দৃষ্টি বরাবর প্রসারিত করা হয়। অতঃপর সুশ্রী, সুসজ্জ, সুবাসিত এক সঙ্গী উপস্থিত হয়ে বলে, 'তুমি সুখ ও আনন্দের সুসংবাদ নাও। এটাই তোমার প্রতিশ্রুত দিন।' মুমিন বলে, 'তুমি কে?' তোমার চেহারা যেন মঙ্গলের বার্তা বহন করে। সঙ্গী বলে 'আমিই তোমার নেক আমল (সৎকর্ম)।' তখন (খুশী হয়ে) মুমিন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! কিয়ামত সংঘটিত কর! কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার আত্মীয়-সম্পদের নিকট ফিরে যেতে পারি।'

কিন্তু মুনকির নাকির যখন মৃত কাফেরকে (আত্মা ফিরে পাওয়ার পর) বসিয়ে প্রশ্ন করেন। 'তোর রব কে?' কাফের বলে, 'হায় হায়! আমি তো জানি না।' তাঁরা বলেন, 'তোর ধর্ম কি?' সে বলে, 'হায় হায় আমি তো জানি না!' অতঃপর তাঁরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি ঈঙ্গিত করে প্রশ্ন করেন, 'কে এই ব্যক্তি যাঁকে তোদের মাঝে প্রেরিত করা হয়েছিল?' সে বলে হায় হায়! আমি তাও তো জানি না! তখন লোকের মুখে যা শুনতাম তাই বলতাম।' ফিরিশ্তা বলবেন, 'তুমি পড়ও নি এবং জানও নি।' ([15])

অনন্তর আকাশবাণী আসে, "ও মিথ্যা বলছে। সুতরাং ওর জন্য জাহান্নামের (আগুনের) বিছানা বিছিয়ে দাও এবং ওর জন্য (কবর থেকে) জাহান্নামের প্রতি একটি দুয়ার খুলে দাও।"

অতঃপর তার কবরে জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। তার কবরকে সংকুচিত করা হয়। তাতে তার দু'-দিকের পঞ্জরাস্থি খাঁজাখাঁজি হয়ে যায়। অতঃপর কুশ্রী, কুসজ্জ দুর্গন্ধময় এক সঙ্গী উপস্থিত হয়ে (ব্যঙ্গ করে) বলে; 'তুই দুঃখ ও দুর্গতির সুসংবাদ নে'। এটাই তোর প্রতিশ্রুত দিন।' তখন কাফের (শঙ্কিত হয়ে) বলে, 'কে তুই? তোর মুখমন্ডল যেন অমঙ্গলের বার্তা বহন করে।' সঙ্গী বলে 'আমিই তোর মন্দ আমল (অসৎকর্ম)।' তখন সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কিয়ামত সংঘটিত করো না।' *(মুঃ আঃ ৫/২৮৭, ইঃ মাঃ ৪২৬৮)*

মহান আল্লাহ বলেন, "যখন ওদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে

---

(১৫) *বলা বাহুল্য, মুসলিম পড়াশোনা করে, শুনে একীন বা প্রত্যয় রেখে সব কিছু সত্য জানে বলেই কবরে এসব প্রশ্নের উত্তর তার পক্ষে সহজ। কিন্তু কাফের যেহেতু ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করে না অথবা কোন ধর্ম কথায় কর্ণপাত করে না কিংবা করলেও তার মনে একীন বা প্রত্যয় জন্মে না, বরং সব কিছু অলীক ও অবাস্তব ভাবে এবং তাতে সন্দেহ পোষণ করে তাই সে এ জগতে এসব প্রশ্নের উত্তর জানলেও অবিশ্বাসের কারণে সে জগতে পৌঁছে সব বিস্মৃত হবে।*

আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি।' না এ হবার নয়। এ তো ওর একটি কথার কথা। ওদের সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত যবনিকা (আলমে বারযাখ বা মধ্যকাল) থাকবে।" *(কুঃ ২৩/১০০)*

কবর আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। *(মুঃআঃ ১৬৩)* কাফের ও ফাসেকের জন্য ভয়ঙ্কর অন্ধকার ঘর। আবার মুমিনের জন্য আলোময়। কাফেরের জন্য অতি সংকীর্ণ জায়গা, সাপ-বিছু ও নানা আযাবের গৃহ। পক্ষান্তরে মুমিনের জন্য সুপ্রশস্ত স্থান, শান্তি ও রহমতের ঘর। তবে ভালো-মন্দ সকল মানুষের কবর অন্ততঃ একবারও তাকে চেপে ধরবে। *(সংজাঃ ৬৮-৬৪)*

নাবালক শিশু ও পাগলদের কবরে পরীক্ষা করা হবে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে কিয়ামতে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। *(ফঃইঃতাঃ ৪/২৫৭,২৭৭)*

কবরের আযাব ও রহমত, মুনকির-নাকীরের প্রশ্ন ইত্যাদিকে মুসলিম বিনা কৈফিয়তে সত্য ও বাস্তব বলে মানে ও বিশ্বাস রাখে। কি ও কেমন কোনই প্রশ্ন তার মনে উদ্রেক হয় না। কারণ, পার্থিব ও জাগতিক ধারণা, কল্পনা জ্ঞান পারলৌকিক ও গায়বী কোন আকৃতি বা রূপের নাগাল পায় না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে মরণের পরকালের কোন অবস্থা বা গুণ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। *(শঃতাঃ ৪৫০)*

শাস্তিযোগ্য প্রত্যেকেই সেই মধ্যকালে পৌঁছে শাস্তি ও আযাব ভোগ করবে। তাতে সে মাটির কবরে হোক কিংবা কোন জন্তুর জঠরে অথবা সমুদ্র গহ্বরে। আগুনে পুড়ে ছাই হোক কিংবা মরুভূমিতে ধূলিকণা হয়ে বাতাসে উড়ুক। কবরবাসীর যে অবস্থা সেই অবস্থা তাদেরও হবে। মুসলিম তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে।

কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে কবরের আযাব সম্পর্কিত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। *(কুঃ ৯/১০১, ১৪/২৭,৪০/৪৫-৪৬)*

আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি কোন কোন ব্যক্তি বিশেষকে কবরের আযাব শুনিয়ে ও দেখিয়ে থাকেন। যেমন, মহানবী ﷺ কয়েকবার নিজে শুনেছিলেন। *(বুঃ ২১৬, মুঃ ১৯২,২৮৬৭)*

যেমন নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার বারযাখী আযাব আল্লাহর নবী ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন ঃ

যার মিথ্যা বলা অভ্যাস সে বারযাখে লোহার আঁকুশি দ্বারা নিজের দুই গাল ঘাড় পর্যন্ত ফাড়ছে। অপরদিকে ফেড়ে পুনরায় প্রথমদিক ফাড়ায় পূর্বেই তা পূর্বেকার অবস্থায় অক্ষতরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এইভাবে মিথ্যাবাদী কিয়ামত পর্যন্ত নিজের হাতে নিজেকে শাস্তি দিতে থাকবে।

যার কাছে কুরআনী ইল্‌ম আছে (আলেম, ক্বারী) অথচ তার প্রতি অবহেলা করে রাত্রে নিদ্রায় বিভোর থাকে এবং দিনে তার উপর আমল করে না তাকে (এবং যে ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তাকে) বারযাখে চিৎ করে শায়িত করা হয়েছে। আর তার শীর্ষদেশে দন্ডায়মান একজন (ফিরিশ্তা) তার মস্তকে (ছোট) পাথর ছুঁড়ে মারছে। তাতে তার মস্তক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং ছুঁড়া পাথরটি পুনরায় কুড়িয়ে এনে পুনরায় ছুঁড়ে মারার পূর্বেই তার মস্তক অক্ষত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হচ্ছে। আর পুনঃ পুনঃ কিয়ামত অবধি এইভাবে তার আযাব হতে থাকবে।

ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীগণ নগ্নাবস্থায় এক অগ্নিকুন্ডের ভিতরে অবস্থান করছে। অগ্নিশিখা উপরে উঠলে তার সাথে তারাও ভেসে উঠছে। নীচে নামলে তারাও নামছে।

আর এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সেই কুন্ডে জ্বলতে থাকবে।

সূদখোর ব্যক্তি রক্তের এক নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর তীরে একজন ফিরিশ্তার সামনে রয়েছে পাথর। যখনই লোকটি নদীর তীরে উঠে আসার চেষ্টা করছে, তখনই ফিরিশ্তা তার মুখে পাথর মেরে (ভরে) নদীর মাঝে যেতে বাধ্য করছেন। আর এইভাবে কিয়ামত তক সে খুনের নদীতে হাবুডুবু খেতে থাকবে। *(বুঃ ১০৪৭,মিঃ ৪৬২১)*

অবোলা জন্তরা এই আযাব শুনতে ও বুঝতে পারে। *(মুঃ ২৮৬৭)* (গোরস্থানে পশু চকিত হলে বুঝা যায়। তবে কোন পশুর কবরের সাথে শিং-লড়াইকে আযাব হওয়ার লক্ষণ বলা যায় না।) তাছাড়া অন্যান্য মানুষও শুনতে বা দেখতে পারে। স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় বহু সালেহ ও নেককার লোকের দেখা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অনেকে কবরস্থানে আগুন বা আলো দেখে কবরের আযাব কিংবা রহমত মনে করে। কিন্তু তা জ্বলন্ত মিথেন গ্যাস, আলেয়া কিংবা খেঁকশিয়ালের দীপ্ত মুখও হতে পারে।

আল্লাহর সাধ্যে কিছুই অসম্ভব নয়। ঐ ছোট্ট সংকীর্ণ জায়গায় সব কিছু সম্ভব। একজন ঘুমন্ত মানুষ যেমন ছোট্ট কক্ষে ছোট বিছানায় থেকেও বসে, ওঠে, চলে ফিরে কথা বলে, কত কাজ করে, গাড়ি চড়ে মাইলের পর মাইল সফর করে। তার দেহ ও আত্মা উভয়ই কষ্ট অনুভব করে, কোন দুর্ঘটনায় বা কোন জন্তর দংশনে সে অস্থির হয়, চিৎকার করে। অথবা কোন রঙিন স্বপ্নে প্রিয়তমের সাথে আনন্দ ও সুখ উপভোগ করে থাকে। তা সত্ত্বেও তার শরীর শয়নমান থাকে। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত থাকে। মুখ বন্ধ থাকে। সর্বাঙ্গ স্থির থাকে। আবার কখনো স্বপ্নজগতে হৃদয়ের অধিক অস্থিরতা ও আন্দোলনের ফলে বিছানায় তার শরীরও দুলে ওঠে। কখনো বা উঠে বসে যায়, চলতে লাগে, কথা বলে, চিৎকার করে ওঠে, হেসে বা কেঁদে ওঠে। আত্মায় অধিক চাপ পড়লে এরূপ ঘটে থাকে। ঠিক তদনুরূপই কবরের ভিতরে মৃতদেহের অবস্থা। তার আত্মা (রূহ) বসে, তাকে প্রশ্ন করা হয়, প্রশ্নের উত্তর দেয়। শান্তি বা শাস্তি ভোগ করে থাকে, চিৎকার করে থাকে। আর সবকিছু তা দেহ সংলগ্নে ঘটে থাকে। অথচ তার শরীর কবরে শয়নমান থাকে। কখনো অধিক আযাবে অস্থিরতার ফলে তার শরীর আন্দোলিত হয়। কখনো তার শরীর কবরের বাইরেও দেখা যায়। *(মুঃ আঃ ৩/১২৯, মিঃ ৫৮৯৮)*

কিন্তু এইরূপ অবস্থা সকল দেহের জন্য জরুরী নয়। যেমন প্রত্যেক ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য বসা, ওঠা, চলা বা চিৎকার করা জরুরী নয়। *(ফঃ ইঃ তাঃ ৫/৫২৫)*

বিশেষ করে সেই সমস্ত মৃতের জন্য যারা কোন জন্তর পেটে হজম হয়ে বা আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে বিনাশিত হয়ে গেছে। *(ফঃ উঃ ২/১৬৫)*

রূহ বা আত্মা

রূহ বা আত্মা জীবের জীবনের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এক 'পাওয়ার' বা শক্তি (যেমন, বিদ্যুৎশক্তি) যা আল্লাহর এক আদেশ মাত্র। *(কুঃ ১৭/৮৫)* রূহ (আত্মা) ও নাফস (প্রাণ) একই জিনিস। দেহে যুক্ত থাকলে নাফ্স এবং দেহ থেকে বিছিন্ন হলে রূহ বলা হয়।

দেহে আত্মার কোন সুনির্দিষ্ট স্থান নেই বরং সারা দেহে তা মিলে থাকে। *(কঃসুঃ ৯২)* যে নাফ্স মন্দ কাজের দিকে বেশী ধাবিত হয় তাকে 'নাফসে আম্মারাহ' বলে। যে মন্দ

করে কিন্তু নিজেকে ভর্ৎসনাও করে এবং তওবা করে তাকে বলে, 'নাফসে লাওয়ামাহ।' যে সদা সৎকাজে ধীর ও স্থির, অবিচল ও দৃঢ় থাকে তাকে নাফসে মুতমায়িন্নাহ বলে, একই নাফসের এই তিনটি গুণ পাওয়া যায় বলে এর তিনটি ভিন্ন নামকরণ।

এই আত্মাকে যে পবিত্র ও শুদ্ধ করবে সে পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু যে তা অপবিত্র, অশুদ্ধ ও কলুষাচ্ছন্ন রাখবে সে ধ্বংস হবে। *(কুঃ ৯১/৮-৯)* তাকওয়ার দ্বারায় আত্মশুদ্ধি হয়। এর জন্য দেহকে নিপীড়িত করতে হয় না।

মানুষের মৃত্যু হলে তার দেহের মৃত্যু হয়, আত্মার নয়। দেহে অবস্থানকালীন পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করবে আলমে বারযাখে।

আম্বিয়াগণের আত্মা সর্বোচ্চ স্থানে আ'লা ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে। শহীদগণের রূহ সবুজ পাখীর বেশে আরশে ঝুলন্ত লণ্ঠনে স্থান পায়। *(মুঃ ১৮৮৭)* এবং জান্নাতে ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। আওলিয়া ও সালেহীনদের রূহও পাখীর বেশে জান্নাতের গাছে গাছে অবস্থান করে। *(মুঃআঃ ৩/৪৫৫, ইমাঃ ১৪৪৯)*

কাফেরদের রূহ সিজ্জীনে অবস্থান করে। এতদসত্ত্বেও সমস্ত রূহের সম্পর্ক স্ব-স্ব দেহের সাথেও থাকে। অতঃপর কিয়ামত কায়েম হলে তাদের স্থান জান্নাত অথবা জাহান্নামে নির্ধারিত হবে।

বারযাখে মুমিনদের রূহ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে। আবার জীবন্ত ঘুমন্ত মানুষের আত্মার সাথে স্বপ্নেও সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। কিন্তু কাফেরদের আত্মা তা পারে না। কারণ, তারা তো আযাব ও শাস্তি ভোগেই ব্যতিব্যস্ত থাকবে। *(রূহ, ইবনুল কাইয়েম)*

পার্থিব জীবন থেকে সরে গিয়ে আত্মা যখন ভিন্ন জগতে চলে যায়, তখন সে আত্মা আর (বাড়িতে বা অন্য কোথাও) হাজির হয় না, হাজির করাও যায় না। *(আঃজিঃ ৯৩)*

কেউ আত্মহত্যা করলে তার আত্মাও দৌড়ে-ছুটে বেড়ায় না। বরং তার নিজস্ব স্থানে অবস্থিত হয়ে যায়। তাই জীবিত কোন মানুষকে কষ্ট দিতে আসে না। ভুতও হয় না। অতএব যদি কেউ কোন মৃতের আত্মার নামে কোন আত্মা উপস্থিত করে, অথবা কোন আত্মার নাম নিয়ে জীবিত মানুষের উপর কিছু সওয়ার হয়ে কষ্ট দেয়, তবে নিশ্চয় তা কোন মৃতের আত্মা নয়। আত্মার নামে কোন শয়তান জিন অথবা মৃতব্যক্তির 'কারীন' জীন, যা প্রতি মানুষের সাথে আজীবন সঙ্গী থাকে। *(মুঃআঃ ১/২৫৭)* এই জন্য অনেক সময় আত্মার নামে এই 'কারীন' যখন কথা বলে, তখন ঠিক ঐ মৃতের ভাব-ভঙ্গি নিয়েই বলে। আবার তার জীবনের বহু কাহিনীও শুনিয়ে থাকে, যাতে মনে হয় যেন মৃত নিজে বলছে। কিন্তু আসলে 'কারীন' জীবনভর তার সাথে থেকেছে। সে তার সমস্ত না হলেও কিছু কিছু জীবনেতিহাস মনে রেখেছে, যা প্রশ্ন করলে ব্যক্ত করে। এই জন্য অনেক সময় মৃতের জীবনের সব উত্তর দিতে পারে না; যা স্বয়ং মৃতের আত্মা হলে খুব সহজে দিতে পারত। *(আঃ জিঃ ৯৬)*

গোর আযাব

কবরের আযাব পাপী মুসলিম ও কাফের সকলের উপর হবে। মৃতের জন্য যখন তার আত্মীয়রা মাতম করে তখন তার আযাব হয়। কারণ মৃত্যুর পূর্বে সে তার আত্মীয়দেরকে শিক্ষা দেয়নি যে, মাতম করতে নেই। যা এক জাহেলিয়াতের প্রথা।

সাহাবী হযরত জারীর ﷺ বলেন, 'দাফনের পর মড়া-বাড়িতে লোকজনের সমাবেশ এবং পান-ভোজনের ব্যবস্থাকে আমরা (জাহেলিয়াতের নিষিদ্ধ ও ঘৃণ্য) মাতম বলে গণ্য করতাম।' *(মুঃআঃ)* আত্মীয় বাড়ি হতে মড়া-বাড়ির জন্যই পানাহারের ব্যবস্থা হওয়া বিধেয়। মড়া-বাড়ির ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও মকরূহ।

শহীদ ও গাযীর কবরে আযাব হয় না। *(আঃ দাঃ ২৪৯৯,তিঃ ১০৬৩, সঃ জাঃ ৬৪২১)* তেমনি যে মুসলিম জুমআর দিন অথবা পেটের রোগে মারা যায় তারও কবরে আযাব হয় না। *(তিঃ ১০৭৪,আঃ জাঃ)*

বারযাখের আযাব ও শাস্তি কারো শুধু আত্মার উপর হয়। আবার আত্মা শরীর উভয়ের উপরই হয়। *(কিঃ মুঃ ১০৭)*

গোনাহের পরিমাণ হিসাবে এই আযাব কারো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আবার কারো কিছুকাল থেকে বন্ধ হয়ে যায়। পাপ থাকলেও কারো দুআ, সাদকা কাযা রোযা ও হজ্জের সওয়াবের কারণে আযাব বন্ধ হয়ে যায়।

ঈমান ও নেক আমল ব্যতীত কারো নাম, খ্যাতি, যশ, মান-মর্যাদা, বংশাভিজাত্য (শাজারানামা), কারো জামা, পাগড়ি, ইত্যাদি কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। *(কুঃ ৬০৬০/৩ মুঃ ২৬৯৯, ফঃ মাঃ ১৪৭)*

মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। বারযাখে নামায রোযা কিছু করতে হয় না। কেবলমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমলক্ষেত্র। ফলে মরণের পর কোন নেকীর আশা করা যায় না। তবে যে নেকীর বীজ মৃতব্যক্তি জীবিতকালে বপন করে গেছে তার দীর্ঘস্থায়ী ফল মৃত্যুর পরও পেতে থাকবে। যেমন, সাদকাহ জারিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, কুঁয়া খনন প্রভৃতি) ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া, লাভদায়ক পুস্তক রচনা, জমি-সম্পত্তি, বই-পত্রাদি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করা ইত্যাদির সওয়াব জারি থাকে। *(মুঃ ১৬৩১)*

তদনুরূপ মৃত ব্যক্তির জন্য কোন আত্মীয়-বন্ধুর নেক দুআ ও ইস্তেগফার, তার নামে দান, কুরবানী কিংবা হজ্জ করলে তার ফলও পেয়ে থাকে। *(বুঃ ৬৬৯৯, মুঃ ১১৪৯, মুঃ আঃ)*

যেমন তার কাযা রোযা কোন আত্মীয় রাখলে তার নেকীও সে পেয়ে থাকে। *(সঃ জাঃ ৬৪২৩)* কিন্তু তার নামে নামায ও কুরআন পাঠের সওয়াব পায় কিনা তা নিয়ে বড় মতভেদ রয়েছে। পোক্তা দলীল না থাকার কারণে সঠিক সমাধান এই যে, নামায ও কিরাআতের সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে না। তাই মৃতের নিকট বা কবরস্থানে কুরআন পাঠ করা। ([16]) ভাড়াটিয়া কারীর কুরআন খানী, ফাতেহা খানী, কুল খানী, শবিনা খানী, চালশে, চাহারম, মীলাদ পাঠ ইত্যাদি যা ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় সমস্তই বিদআত। এসব মৃতের কোন কাজে আসে না। উপরন্তু মৃত ব্যক্তি যদি নাস্তিক বা কাফের অথবা মুশরিক হয়, তাহলে তার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে এমন দুআ মজলিস করা বা দুআ করাই হারাম। *(কুঃ ৯/১১৩)*

([16]) *এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলি যয়ীফ।*

মানুষ যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় জাগ্রত পৃথিবীর কোন অবস্থা জানতে পারে না, কারো ডাক বা আহবানের শব্দ শুনতে পায় না, ঠিক তদ্রূপই মৃত ব্যক্তি মধ্য জগতে বাস করে ইহজগতের কোন অবস্থা জানতে পারে না। এ জগতের কারো ডাক বা শব্দ শুনতে পায় না। *(কুঃ ৩৫/১৪, ২২, ২৭/৮০, ৩০/৫২)* তবে বদর যুদ্ধে মৃত কাফেরদেরকে অধিক লাঞ্ছিত করার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাদেরকে নবী করীম ﷺ-এর ডাক শুনিয়েছিলেন। *(বুঃ ১৩৭০, মুঃ ২৮৭৩)*

আবার মৃতকে দাফন করার পর যখন মৃতের রূহ ফিরিয়ে প্রশ্নের জন্য তাকে বসানো হয় এবং লোকেরা ফিরে আসতে শুরু করে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। *(বুঃ ১৩৩৮, মুঃ ২৮৭০)* এ শুধু বিশেষ অবস্থায় আল্লাহর হিকমত বিশেষ।

মৃত ব্যক্তি যেমন ইহজগতের কোন অবস্থা জানতে পারে না, কিছু শুনতে পায় না। তেমনি ইহজগতের কারো কোন সাহায্যও করতে পারে না। অতএব নবী, ওলী, সালেহ, বুযুর্গ ইন্তেকালের পর যেহেতু তাঁদের আত্মা জান্নাতে থাকে, তাই তাঁদের সমাধির কাছে উপস্থিত হয়ে কিছু চাইলে না তাঁরা শুনতে পান, আর না-ই তাঁরা তা দিতে পারেন। পরন্তু মৃত্যুর পর আমল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে না তাঁরা আল্লাহর কাছে কারো জন্য দুআ করতে পারেন, আর না কোন সুপারিশ।

ডাকলে আল্লাহকে, চাইলে তাঁরই কাছে। অন্যের কাছে চাইলে তাঁর ইবাদতের শরীক করা হয়। তাই কোন কবরকে সিজদা করা, তওয়াফ করা, কবরবাসীর নামে মানত বা নযর মানা, তার কাছে সন্তান চাওয়া, রোগ-বালা থেকে মুক্তি চাওয়া, মঙ্গল চাওয়া, ধন-সম্পদ ব্যবসায় উন্নতি চাওয়া শির্ক আকবার। এতে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মুশরিক হয়ে যায়। *(কুঃ ৩৫/১৪, ১০/১০৬, ৭/১৯৭, ৩৯/৩৮)*

যারা পরলোকগত কোন নবী, ওলী বা বুযুর্গের নিকট বিপদ মুক্তি, সন্তান বা সুখ ইত্যাদি চায় তারা তাঁদের সম্পর্কে এই ধারণা রাখে যে, তাঁরা জীবিত আছেন, অথবা তাঁদের রূহ হাযির-নাযির, অথবা তাঁরা গায়েব জানেন এবং মনের গোপন কথা বুঝতে পারেন। অথবা তাঁরা পৃথিবীর সকল ভাষা বুঝেন এবং একই সময়ে একাধিক বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ শ্রবণ করেন। অথচ এর প্রত্যেকটিই আল্লাহর সিফাত বা গুণ। কারণ, তাঁরা কাছে থেকে, আর না দূরে থেকে কিছু শুনতে পান। না-ই তাঁরা হাযির-নাযির আর না-ই তাঁরা কারো মনের কথা বুঝতে পারেন এবং জানা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝতে পারেন। আর না-ই এক সঙ্গে একাধিক আবেদন শুনতে পারেন। তাই তাঁদের নিকট কিছু চাইলে আল্লাহর আসনে তাঁদেরকে সমাসীন করা হয়। পরন্তু সে চাওয়াতে লাভও কিছু হয় না।

কিন্তু বলা হয়, তাঁদের কাছে যে আশা নিয়ে যাওয়া হয় তা পূর্ণ হয়ে যায়। অতএব চাওয়াতে ফল হয় বৈ কি ?

অথচ প্রকৃতপক্ষে শয়তানের চক্রান্তে এমন লোকদের শুধু ঈমান লুটা যায়। কারণ, সবারই আশা পূর্ণ হয় না। সাত দর্গায় মাথা ঠুকেও অনেকের একটা সন্তান লাভ হয় না। আবার অনেকের মতে মাটি, পাথর ,গাছ, গরু, কুমীর, সাপ ইত্যাদির কাছে গেলেও নাকি আশা পূর্ণ হয়। তাহলে তারাই কি দিয়ে থাকে? কিংবা আল্লাহর দরবারে দেওয়ার সুপারিশ করে থাকে? যেমন মক্কার মুশরিকরা মনে করত। আবার যারা নাস্তিক, আল্লাহ -নবী-ফিরিশ্তা-জিন-ওলী-বুযর্গ কিছুই মানে না তাদেরকেই বা কে দিয়ে থাকে? যারা বিনা চাওয়াতে সবকিছু পায়। সকলকেই আল্লাহই দেন। তাঁর তকদীর লিখন, তাঁর

বিজ্ঞানময় হিকমত যাকে যা চাইবে তাকে তাই দেবে। তাই তো এমন অনেক জিনিস আছে যা আল্লাহর কাছে চাইলেও পাওয়া যায় না। আবার অনেক জিনিস না চাইলেও এসে যায়। কারণ, তাঁর হিকমতে যাচিঞ্চাকারীর জন্য যা চাওয়া মুনাসিব ও হিতকর তাই তাকে দিয়ে থাকেন। এ তো তিনিই শুধু জানেন যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ২/২১৬)* সকল পাওয়া তাঁরই হাতে। কিন্তু ভ্রান্ত মানুষ চাওয়ার দরজা চিনতে ভুল করে। আর তার চির শত্রু শয়তান তার ঈমানটি লুটার উদ্দেশ্যে তার মনে নানাবিদ্ প্রলোভন ও কুমন্ত্রণা দিয়ে শুধু সেই দরজায় নিয়ে যায়, যেখানে কিছু পাওয়া যায় না। দেন তো তিনিই, কিন্তু নাম হয় তাদের, যারা কিছু দিতে সক্ষম নয়। অতএব 'ঝড়ে কাক মরে আর ফকীর সাহেবের কেরামতি বাড়ে।'

সুতরাং মুসলিম যা কিছু চায় তাঁরই কাছে চায়। যা পায় তাঁর নিকট থেকেই পায় এবং যা পায় না তাঁরই না দেওয়াতে পায় না।

মুসলিম মুসলিমের কবরের হিফাযত করে এবং তার যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করে। কিন্তু তার উপর কোন ঘর বা মসজিদ অথবা কুব্বা নির্মাণ করে না। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ এ কাজের কর্তাকে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন,

"আল্লাহর অভিশাপ ইয়াহুদ ও নাসারার উপর, তারা তাদের আম্বিয়াদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুঃ ১৩৩০, মুঃ ৫২৯)*

"ওদের কোন সালেহ ব্যক্তির ইন্তেকাল হলে ওরা তাঁর কবরের উপরে মসজিদ তৈরী করেছে। অতঃপর তাঁর মূর্তি (বা ছবি) বানিয়েছে। তারা আল্লাহর নিকট কিয়ামতে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।" *(বুঃ ৪২৭, মুঃ ৫২৮, নাঃ ইঃ শাঃ ৪/১৪০)*

"অতএব তোমরা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করো না। আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুঃ ৫৩২)*

"হে আল্লাহ! আমার কবরকে পূজ্যপ্রতিমা বানিয়ে দিও না। আল্লাহর অভিশাপ সেই কওমের উপর যারা তাদের আম্বিয়াদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" *(মুঃ আঃ ২/২৪৬)* "সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে তারা, যাদের জীবনে কিয়ামতে কায়েম হবে এবং তারা যারা কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়।" *(মুঃ আঃ ১/১৯৫, ইঃ শাঃ ৪/১৪০)*

তাই মুসলিমের জন্য কবরের উপর বা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া ও দুআ করা, তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং সেখানে নামায পড়াতে ফযীলত মনে করা হারাম। *(তাঃ সাঃ ২৯)* তেমনি মসজিদে কাউকে সমাধিস্থ করাও বৈধ নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ কোন নবীর কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীর উপর অভিসম্পাত করলেন, তাহলে কোন অনবীর গোরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী কিসের যোগ্য? তেমনি সেও অভিশপ্ত যে কোন নবীর কবরে তাবার্রুকের আশায় আল্লাহর জন্যই নামায পড়ে। অতএব কোন অনবীর কবরে আল্লাহর জন্য নামায পড়া কি হতে পারে? আবার কোন অনবীর কবরের ধারে পাশে তারই জন্য নামায পড়া অথবা কবরকে সিজদা করা, তার কাছে আশা পূরণের দুআ করা কি হতে পারে ?

তেমনি কোন কল্পিত বা মিথ্যা কবরকে মসজিদ বা সিজদার জায়গা বানিয়ে সিজদা করে নযর মেনে, ফুল বা চাদর চড়িয়ে পশু বলিদান দিয়ে মঙ্গলের আশা রাখা কি

হতে পারে? নিঃসন্দেহে এসব শির্কে আকবার।

ইসলাম পৌত্তলিকতার পরিপন্থী। আর প্রথম পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজা শুরু হয় এই কবর থেকেই। কবরের ধারে পাশে ইবাদতক করা থেকেই। তাই কবর পূজা (মাযার বা দর্গাপূজা) ও মূর্তিপূজার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর মসজিদে হয়নি। আর তাঁর উপরে বা তাঁর কবরকে মসজিদ বানানোও হয়নি। তাঁর কবরের উপর কোন ঘর তৈরী করা হয়নি। বরং তাঁর কবরই হযরত আয়েশার (আঃ) হুজরার মধ্যে হয়েছে। যা মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। যেহেতু তিনি হযরত আয়েশার (গৃহে) ইহলোক ত্যাগ করেন এবং আম্বিয়াগণের যে স্থানে মৃত্যু হয় সেই স্থানেই তাঁদেরকে সমাধিস্থ করা হয়, তাই তাঁর সমাধিও হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরের ভিতরেই হয়েছিল এবং পরে হযরত আবূবাকার ও হযরত উমারের (রাঃ) কবরও তাঁর পাশে সেই ঘরেই হয়েছিল। তখন তা ছিল মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহ। কিন্তু পরবর্তীকালে সন অষ্টাশি অথবা একানব্বই হিজরীতে অলীদ বিন আব্দুল মালেকের রাজত্বকালে মসজিদ ভেঙ্গে পুনর্নির্মিত ও প্রশস্ত করা হয়।

সেই সময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত স্ত্রীগণের হুজরা ও মসজিদে শামিল করে নেওয়া হয়। তার মধ্যে হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরাও ঐ প্রশস্তায় এসে যায় এবং পৃথক করে হযরত আয়েশার গৃহকে সুউচ্চভাবে নির্মাণ করা হয়। আর ঐ সময়েই মসজিদকে সৌন্দর্যখচিত করা হয়। যেহেতু সেই সময় মদীনা শরীফে কোন সাহাবা অবশিষ্ট ছিলেন না, তাই নবী ﷺ-এর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর কবর মসজিদের সম্প্রসারণে শামিল হয়ে যায়। *(বিঃনিঃ ৯/১৯৪)* পরবর্তী সন ৬৭৮ হিজরীতে সুলতান সালেহ মিসরী হুজরার উপর কুব্বা (গম্বুজ) নির্মাণ করেন। এরপর সন ৭৫৫ হিজরীতে বাদশাহ নাসের হাসান বিন মুহাম্মাদ পিতলের পাত দ্বারা খচিত ও পুনর্নির্মিত করেন। এই অতিরঞ্জন যা সহীহ হাদীসের প্রতিকূল ছিল তা অনেক বিদআতীর দলীলরূপে আজ পর্যন্ত থেকে গেল। *(মিরআতুল হারামাইন, আল ইরশাদ ৯৯ পৃঃ)*

পরন্তু হুজরাকে মাটি থেকে গম্বুজ পর্যন্ত উঁচু দেওয়াল দ্বারা ঘেরা হয়েছে এবং উত্তর দিক থেকে কোণাকার দেওয়াল তৈরী করা হয়েছে। আর তার পরেও এক দেওয়াল এবং অন্যান্য দিকে রেলিং-বিশিষ্ট দেওয়াল নির্মিত হয়েছে। যাতে পিছন থেকে কেউ নামায পড়লে যেন ঠিক কবরের দিকে সম্মুখ না হয় এবং তাঁর কবর পূজ্য প্রতিমা, উৎসব, ঈদ বা খুশীর মিলন ক্ষেত্র না হয়ে যায়। *(তাঃ সাঃ ৮৫-১০০ পৃঃ)*

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ যেমন শরীয়ত পরিপন্থী, তেমনি তার উপর কুব্বা গম্বুজ বা মিনার তৈরী করা, কবর উঁচু ও পাকা তৈরী করা, তার উপর বসা ও ধূপ বা বাতি জ্বালানো প্রভৃতি শরীয়ত বিরোধী কাজ। যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের উপর আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। *(মুঃআঃ ১/২২৯, ৩/২১৫, মুঃ ৯৭০, তিঃ ১০৫২, আঃদাঃ ৩২৩৬, নাঃ ১/২৮৫)*

অনুরূপভাবে কবরবাসীর সন্তুষ্টি বা নৈকট্যলাভের জন্য ফুল চড়ানো, চাদর চড়ানো, নযর ও নিয়ায, ফল, মিষ্টি বা কোন খাবার, টাকা-পয়সা উৎসর্গ করা, হাঁস-মুরগী খাসি বা কোন পশু বলিদান করা, কবরকে ঘিরে তওয়াফ করা, কবর চুম্বন করা, স্পর্শ করা তাবার্রুক নেওয়া ইত্যাদি হারাম ও শির্কে আকবার, যার গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না। *(ফঃলঃ ১/২৫৯)*

রসূল ﷺ মুসলিম পুরুষকে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। *(মুঃ ৯৭৭)* আর নারীকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। বরং কবর যিয়ারতকারিণীর উপর অভিসম্পাত করেছেন।

মুসলিম কবর যিয়ারত দুই উদ্দেশ্যে করতে পারে। প্রথমতঃ মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়তঃ কবরবাসীর জন্য দুআ ও ইস্তেগফারের উদ্দেশ্যে। তবে কোন (নামধারী) মুসলিম মুশরিক বা কাফের কবরবাসীর জন্য দুআ ও ইস্তেগফার করতে পারে না। *(কুঃ ৯/৮৪, ১১৩)*
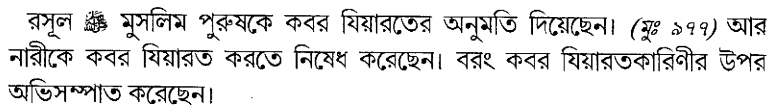
এই দুই উদ্দেশ্য ছাড়া কবরে তার দুআ আল্লাহর নিকট কবুল হবে এই আশায় অথবা কবরবাসীর কাছে চাইলে পাওয়া যাবে এই আশায়, তাবার্রুকের আশায়, কবরবাসীকে স্মরণ করলে লাভবান ও সফল হবে-এই আশায়। কবরবাসীর সুপারিশ বা অসীলা পাবার আশায়, পাপক্ষয় ও পবিত্রতার আশায় কবর যিয়ারত হারাম ও শির্ক।

মসজিদে নববীর যিয়ারতকালে কবরে নববীর যিয়ারতের সময় তাঁর উপর এবং তাঁর দুই খলীফা হযরত আবু বকর ও ওমরের (রাঃ) উপর সালাম পেশ করতে হয়। সেখানে গিয়ে তাঁর নিকট কিছু চাওয়া, গোনাহ ঝরার আশা রাখা, রেলিং স্পর্শ করে তাবার্রুক নেওয়ার অনুমতি শরীয়ত দেয় না।

তাঁর কবর যিয়ারত হজ্জের কোন অংশ নয়। যিয়ারত করা ওয়াজেবও নয়। শুধুমাত্র তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও যায় না। কারণ মক্কা মুকার্রামার মসজিদে হারাম, মদীনা শরীফের মসজিদে নববী এবং ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা ছাড়া আর কোন মসজিদ বা মাযারের দিকে যিয়ারত বা তাবার্রুকের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়। *(বুঃ ১১৮৯, মুঃ ৮২৭)*

বলা বাহুল্য, অন্য কোন ওলী বা বুযুর্গের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা অধিকন্তু নিষিদ্ধ।

নবী করীম ﷺ-এর উপর সালাম ও দরূদ পাঠ করার জন্য তাঁর কবর যিয়ারত করাও শর্ত নয়। যেমন বিধেয় নয় কারো মাধ্যমে মদীনায় সালাম পাঠানো। বরং তাঁর উপর পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকেই দরূদ পাঠ করলে নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা সে দরূদ ও সালাম তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন। *(ইঃ শাঃ আঃ দাঃ ২০৪২)* রসূল ﷺ তাঁর ঘর ও কবরে ঈদ মানাতে বা কোন উৎসব ঘটা করতে নিষেধ করেছেন। *(ইঃ শাঃ আঃ দাঃ ২০৪২)* ঈদ খুশীর ঐ সম্মেলনকে বলা হয়, যা (প্রতি বছর বা মাস অথবা সপ্তাহান্তে নিয়মিতভাবে ফিরে আসে। যেমন ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল-আযহা, জুমআ ইত্যাদি।)

সৃষ্টির সেরা মানুষ, তাঁর সমাধিক্ষেত্রে কোন প্রকারের অনুষ্ঠান-উৎসব করতে যদি বাধা হয়, তাহলে কোন অন্য কবরের পাশে বাৎসরিক অনুষ্ঠান, ওরস, মেলা ইত্যাদি উৎসবে কি প্রকারের বাধা হওয়া প্রয়োজন? অমুসলিম কাফেরদের অনুকরণে এই সব মেলা-ওরসে যে সব শির্ক, বিদআত, নারী পুরুষের অবাধ মিলা-মিশা, গাঁজাখোরী, গান-বাদ্য, নাটক-যাত্রা, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদির সরগরম আকর্ষণ হয়ে থাকে তাতে যে ইসলাম

ও শরীয়তের কোন সুগন্ধই থাকে না, তা সহজেই অনুমেয়। প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলতে বাধ্য হবেন যে, নিঃসন্দেহে মানুষ আবার পুরানো জাহেলিয়াতে ফিরে যেতে চলেছে। যে সব আচার-অনুষ্ঠান এ ধরনের মেলায় হয়ে থাকে তাতে কোন ওলী বা বুযুর্গ রাজী বা নিমরাজী তো নন-ই; উপরন্ত তাতে তাঁরা ঘৃণাবোধ করেন। (অবশ্য কবর থেকে তাঁরা এসব কিছু বুঝতে পারেন না।) অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হন মহান প্রভু আল্লাহ। আর রাজী, সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয় শুধু শয়তান ও তার বন্ধু-বান্ধবেরা। ভক্তদের পয়সা অপচয় এবং আনন্দোপভোগ ছাড়া কোন লাভও হয় না। আর "নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" *(কুঃ ১৭/২৭)*

এ বিশাল জগৎকে আল্লাহ তাআলা বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি। মানব-দানবকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় চিহ্নিত করেছেন। পৃথিবীতে কেউ অপরাধী, কেউ নিরপরাধ। অপরাধ জানার জন্য মুনসিফ আদালত চাই, সুবিচার চাই। তাই এ বিশ্বচরাচর একদিন ধ্বংস হবে। মানব দানবের বিচার হবে। ভবের বাজারে এসে লাভালাভ ও পুঁজির হিসাব দিতে হবে। সকলকেই পুনরায় জীবিত হতে হবে সেই হিসাব-নিকাশের জন্য। *(কুঃ ২৩/১১৫, ৬৪/৭)*

মুসলিম পরকাল, পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করে। যিনি মানব-দানবকে বিনা নমুনায় প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পর জীবিত করবেন। তাঁর কাছে এ অতি সহজ। *(কুঃ ৩০/২৭, ৩৬/৭৮-৭৯)*

যিনি এ বিশাল বিশ্বজগৎ রচনা করেছেন, তিনি মানুষকে পুনর্জীবিত করতে নিশ্চয় সক্ষম। মানুষ মৃত্যুর পর তার অস্থি মাটিতে পরিণত হলেও তিনি তাকে অতি সহজে জীবিত করবেন। *(কুঃ ১৭/৪৮-৫২)*

যিনি প্রথম মানুষকে মাটি থেকে অতঃপর পানি (বীর্য) থেকে মাংসপিন্ড সৃষ্টি করেছেন। তারপর অস্থি তারপর মাংস চড়িয়ে আত্মা দান করে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি এই দেহ আবার মাটি হয়ে গেলেও তার মেরুদন্ডের নিম্নাংশের অস্থিখন্ড (যা পচে না বা মাটিতে পরিণত হয় না তা) থেকে পুনর্বার তাকে সৃষ্টি করবেন। *(কুঃ ২৩/১২-১৬,বুঃ ৪৮১৪, মুঃ ২৯৫৫, মুঃ আঃ ২/৪২৮)*

প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে এই পরকাল সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করেছেন। *(কুঃ ৩৯/৭১)* যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী, আর তাঁর সময়কাল অনুপাতে পরকাল বা কিয়ামত অতি নিকটবর্তী তাই তিনিই সবচেয়ে বেশী তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আর কুরআন মাজীদেও সে কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে।

মুসলিম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয়। মানুষ তার মৃত্যুর পর পুনরায় নিজ পাপ-পুণ্য অনুযায়ী মানুষ কিংবা কোন প্রাণীরূপে পৃথিবীতে জন্ম নেয় এবং এ জন্মের ফল পরজন্মে ভোগ করে, আর এইভাবে চিরকাল জন্ম-মৃত্যু বারবার হতেই থাকবে -এ কথা মুসলিম আদৌ বিশ্বাস করে না। *(কুঃ ২৩/৩৭, ৪৫/২৪)* কারণ, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানিয়েছেন জন্ম দুইবার। মাতৃগর্ভ থেকে ইহলোকে জন্ম এবং মৃত্যুর পর

মৃত্তিকাগর্ভ থেকে পুনর্জন্ম নিয়ে পরলোকে অবস্থান। তারপর আর কোন জন্ম নেই, কোন মৃত্যু নেই।

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, নক্ষত্রমন্ডলী যখন বিক্ষিপ্ত হবে, সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে এবং কবর যখন উন্মোচিত হবে, তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কি লাভ করেছে এবং কি ক্ষতি করেছে। হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন, তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। কক্ষণই না। বরং (উপদেশ সত্ত্বেও) তোমরা হিসাব ও প্রতিফলকে মিথ্যা ভাবছ। অথচ নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে; সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ (কেরামান কাতেবীন ফিরিশ্তাবর্গ) ওরা জানে যা তোমরা কর। সুকৃতকারীগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, এবং দুষ্কৃতিকারীগণ তো থাকবে জাহান্নামে; ওরা কর্মফল দিবসে ওতে প্রবেশ করবে। সেথায় ওরা স্থায়ী হবে। আর কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? অতঃপর কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? সেদিন একের অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।" *(কুঃ ৮২)*

কিয়ামতের আলামত

পৃথিবীর বয়স কমে আসছে। অচিরেই এ বিশ্ব ধ্বংস হবে। কিয়ামত অতি নিকটে। *(কুঃ ১৬/৭৭, ২১/১, ৭৫/৬-৭)* আর নিঃসন্দেহে মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। *(কুঃ ৪০/৫৯)*

কিন্তু তা কখন সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেউ জানে না। তাঁর প্রিয়মত খলীলকেও তিনি একথা জানান নি। *(কুঃ ৭/১৮৭, ৩৩/৩৬, ৩১/৩৪, ৭৯/৪২-৪৪)*

মুসলিম সেই মহাপ্রলয় দিবসের উপর প্রত্যয় রাখে এবং সেই দিনকে বড় ভয় করে। তার ভয়ঙ্করতা থেকে নিষ্কৃতির জন্য সম্বল সংগ্রহ করে। আর সেদিন নির্দিষ্টভাবে কবে আসবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। অপরের নিকটে কিয়ামতের কোন নির্দিষ্ট সন বা তারীখ শুনলে তা অবিশ্বাস করে। তবে ভাবে যে, তা অতি নিকটে।

অবশ্য কিয়ামতের পূর্বে তার বহু লক্ষণ দেখা দেবে। সেই সমস্ত লক্ষণ যখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তখন নিঃসন্দেহে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

এই সমস্ত লক্ষণ বা নিদর্শন দুই প্রকারের; ছোট ও বড়। আবার ছোট তিন শ্রেণীর। কিছু তো অতীতে প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিছু প্রকাশিত এবং ঘটমান বর্তমান। আর কিছু ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে।

অতীতে ঘটিত ছোট লক্ষণ যেমন, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবী হয়ে আগমন এবং পরলোকগমন। *(বুঃ ৬৫০৩, মুঃ ৮৬৭)*

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া যা নবুয়তে মুহাম্মাদিয়ার এক বড় মু'জেযা ছিল। *(কুঃ ৫৪/১-২)* হিজায থেকে অগ্নি উদ্গিরণ, যার ছটা বুসরা পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। আর এটি ছিল সন ৬৫৪ হিজরীতে। *(বুঃ ৭১১৮, মুঃ ২৯০২)* জিযিয়া কর বন্ধ হওয়া ইত্যাদি। *(কিঃসুঃ ১৫৪)*

পুরাঘটিত বর্তমান নিদর্শন যেমন, মুসলিমদের বিভিন্ন দেশ জয়। প্রায় ৩০ জন মিথ্যা নবুঅতের দাবীদার প্রকাশ। *(বুঃ ৭১২১, মুঃ ২৯২৩)*

বিভিন্ন অন্ধ ফিতনা ও বিপত্তির প্রাদুর্ভাব। যাতে বহু মুসলিম কাফের হয়ে যায়। দুনিয়ার জন্য দ্বীন বিক্রি করে। ফিতনার ভয়াবহতায় মানুষ মৃত্যু কামনা করে। এমন যুদ্ধ ও খুনাখুনি হয় যাতে হত্যাকারী বুঝতে পারে না যে, সে কেন হত্যা করল এবং হত ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে, তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হল। *(মুঃ ২৯০৮)*

যে সমস্ত ফিতনা পূর্বে ঘটে গেছে যেমন, তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমানের শাহাদত বরণ। খাওয়ারেজের ফিতনা।

বর্তমানেও মুসলমানদের মাঝে বহু ফিতনা দৃশ্যমান। তা থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল তা থেকে দূরে থাকা। কোন পক্ষকে সমর্থন না করা।

এই শ্রেণীর অন্যান্য লক্ষণ যেমন, মানুষের শরয়ী জ্ঞান লোপ, মূর্খতার আধিক্য, ইসলাম পরিত্যাগ, বিভিন্ন পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতার বহিঃপ্রকাশ, ইজ্জতের লুটমার, খুনাখুনি দাঙ্গা, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি অন্যায়াচরণের আধিক্য। (ভবিষ্যতে) যুদ্ধের কারণে পুরুষের সংখ্যা কম হয়ে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেশী হবে। পঞ্চাশ জন নারী একজন মাত্র পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকবে। *(বুঃ ৭১২১)*

নেতৃত্ব অযোগ্য লোকের হাতে সমর্পণ। বিলাসিতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা যাদেরকে নেতৃত্বাধীন মানুষের অবস্থা খেয়াল করতে বাধা দান করে এবং অবিচার ও অরাজকতা বৃদ্ধি পায়।

দাসী তার প্রভুকে জন্ম দেবে। (যুদ্ধ বন্দিনী ও তার সন্তান-সন্ততির আধিক্য দেখা দেবে, দাসীর গর্ভে রাজাদের জন্ম হবে, অথবা দাসী ক্রয়-বিক্রয় অধিক রূপে হবে) মূর্খ মেষ ও ছাগলের রাখালদেরকে সম্পদশালী এবং অট্টালিকা নিয়ে গর্বকারীরূপে দেখা যাবে। আর এ ধরনের লোক মানুষের নেতা হবে। *(মুঃ ৮/১০)*

সকল বিজাতি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন একই ভোজপাত্রের উপর বহু ভোজনকারী ভোজনের জন্য সম্মিলিত হয়। (অর্থাৎ, সকল বিজাতি একজোট হয়ে মুসলিমদেরকে গ্রাস বানিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে।) মুসলিমগণ সংখ্যায় অধিক থাকলেও তারা স্রোতে ভাসমান আবর্জনার মত (ক্ষমতাহীন) হবে। তাদের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব থাকবে না। আল্লাহ তাআলা শত্রুদের বক্ষ হতে মুসলিমদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন। আর মুসলিমদের হৃদয়ে ভীরুতা দুর্বলতা, পার্থিব প্রেম ও মৃত্যু-বিরাগ সঞ্চার করে দেবেন। *(সিঃ সঃ ৯৫৮)*

আমানত বিনষ্ট হওয়া। মুসলমানদের ঐক্য হারিয়ে যাওয়া। গান-বাজনা, নট-নৃত্য ও মদ্য ব্যবহার প্রকাশ্যে হওয়া, বিভিন্ন অশ্লীলতা ও নগ্নতার ফলে বিভিন্ন ভূমিকম্প হওয়া, ধস নামা, মানুষের আকৃতি পরিবর্তন হওয়া। *(সঃ জাঃ ৩৫৫৯)*

সময় সংকীর্ণতা, মাল ও সম্পদের প্রাচুর্য। কেবল পরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দান। ব্যবসার ব্যাপকতা। আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং সত্য সাক্ষ্য গুপ্ত করণ। *(সিঃসঃ ৬৪৭)* মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান। খেয়ানতকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারকে খেয়ানতকারী ভাবা। বাজে লোকের অধিক মুখ চলা। *(সিঃসঃ ১৮৮৭)* অত্যাচার ও যুলুমের বৃদ্ধিলাভ। চাবুকের আঘাতে মানুষের অতিষ্ঠ হওয়া। *(সিঃ সঃ ১৮৯৩)*

ঘটিতব্য লক্ষণ যেমন, মাল-ধন এত বেশী হবে যে, যাকাত ও সাদকা গ্রহণকারী লোক খুঁজে মিলবে না। আরব্য ভূমি বিভিন্ন নদী নহরে এবং সেচ সুবিধায় ফুলে-ফসলে শ্যামল হয়ে উঠবে। *(মুঃ ১৫৭, মিঃ ৫৪৪০)* প্রথম দিনের চাঁদ বড় আকারে দেখা দেবে। মসজিদের

পবিত্রতাহানি করা হবে। আকস্মিক মৃত্যু বেশী হবে। *(সঃজাঃ ৫৭৭৫ নং)*

অবোলা জন্তু মানুষের সহিত কথা বলবে। উরু তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর কর্মাকর্ম প্রসঙ্গে খবর দেবে। *(সিঃসঃ ১২২)* এগুলি অনৈসর্গিকভাবে সত্য ঘটবে। অথবা বিজ্ঞানযন্ত্রের চরম উন্নতির কারণে এসব সম্ভব হবে।

ফুরাত নদীতে এক সোনার পাহাড় প্রকাশিত হবে। যার জন্য ভীষণ যুদ্ধ বাধবে এবং তাতে প্রতি এক শতের নিরানব্বই জন হত হবে। *(বুঃ ৭১১৯, মুঃ ২৮৯৪)* মাটি তার সমস্ত গুপ্ত খাজানা (খনিজ পদার্থ) বহির্গত করবে। সোনা-চাঁদি ইত্যাদি দেখে খুনী বলবে এরই জন্য আমি খুন করেছি। আত্মীয়তা ছিন্নকারী বলবে, এরই জন্য আমি আত্মীয়তা ছিন্ন করেছি। চোর বলবে, এরই জন্য আমার হাত কাটা গেছে। অতঃপর কেউ তা গ্রহণ করবে না।

জাহজাহ নামক এক পরাক্রমশালী বাদশার আবির্ভাব হবে। *(মুঃ ২৯১১)* ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশা হবেন। তখন পৃথিবী শান্তি ও ইনসাফে ভরে উঠবে। যেমন, তাঁর আগে অশান্তি ও যুলমে পরিপূর্ণ থাকবে। আহলে বায়ত হযরত ফাতেমার বংশে তাঁর জন্ম হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নাম ও তাঁর নাম এবং উভয়ের পিতার নাম এক হবে। তিনি বড় সুদর্শন পুরুষ হবেন। আল্লাহ তাঁর দ্বারায় ইসলামের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। *(সঃ জাঃ ৫১৮০)*

উল্লেখ্য যে, ইমামিয়া শিয়াগণ যার অপেক্ষা করছে তিনি সে মাহদী নন।

কিয়ামতে বড় লক্ষণ যেমন, আকাশ ধূমায়িত হবে। *(কুঃ ৪৪/৯-১০)* চল্লিশ দিন যাবৎ এ ধোঁয়া বিদ্যমান থেকে কাফেরদের শ্বাসরোধ করবে। আর মুমিনদের অবস্থা সর্দি লাগার মত হবে। *(শঃনঃ ১৮/২৭)* পৃথিবীতে তিনটি ধস নামবে। একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং অপরটি আরব্য উপকূলে।

এই সময় মুসলমানরা বড় শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী হবে। তাদের সহিত রোমের সন্ধি হবে। দুই শক্তি মিলে তাদের শত্রুদের উপর জয়লাভ করবে। *(মিঃ ৫৪২৮)* কিন্তু খ্রীষ্টানরা (ক্রুশ) উত্তোলন করে তাদের নিজস্ব বিজয় মনে করবে। তা দেখে মুসলিমরা সলীব ভেঙ্গে ফেলবে। যার ফলে রোম বিদ্রোহ করে বসবে এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে মহাযুদ্ধ শুরু হবে। ঐ যুদ্ধে মুসলমানরা কনষ্টান্টিনোপল (দ্বিতীয়বার) জয়লাভ করবে। তিন বছর আকাল দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। *(সঃ জাঃ ৭৭৫২)*

দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। তার ফিতনা মানুষের পক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক বৃহৎ ফিতনা হবে। *(মুঃ ২৯২০)* দাজ্জাল আদমেরই বংশধর। দেখতে স্থুলাকার লালবর্ণের হবে। তার একটি চক্ষু অন্ধ (কানা) হবে। দুই চোখের মাঝে ললাটে 'কাফের' লিখা থাকবে। প্রতি মুমিনই তা পড়তে পারবে। প্রকাশ পাওয়ার পরই খোদায়ী দাবী করবে। বিভিন্ন অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ফলে মানুষ তার ধোকায় পড়বে। বড় তীব্র গতিতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবে। তবে মক্কা মুকার্রামা ও মদীনা নববীয়ায় সে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। কারণ, নগরীদ্বয়ের প্রতি প্রবেশ-পথে ফিরিশ্তার কড়া পাহারা থাকবে। *(মুঃ ২৯৪৩)*

লোকে তার সঙ্গে জান্নাত-জাহান্নাম এবং পানি ও আগুন দেখবে। কিন্তু আসলে তার জান্নাতই জাহান্নাম, জাহান্নামই জান্নাত এবং পানিই আগুন ও আগুনই পানি থাকবে।

শয়তানের দল তার সহায়তা করবে। খোদায়ী দাবীর সত্যতায় সে মানুষের মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেখাতে চাইবে। শয়তান তার পিতা-মাতার রূপ নিয়ে

দেখা দিয়ে মানুষকে (পুত্রকে) দাজ্জালের অনুসরণ করতে বলবে। তখন অনেকে তাকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে নেবে। *(সঃ জাঃ ৭৭৫২)*

সেই সময় আল্লাহ পাক বান্দার নিকট হতে এমন কঠিন পরীক্ষা নেবেন, যাতে প্রকৃত মুমিন ব্যতীত কেউই দাজ্জালের জাল থেকে নিস্তার পাবে না। সে মেঘকে বর্ষণের আদেশ করলে বৃষ্টি হবে, ফসল ফলবে, পশুকে ডাক দিলে পশু তার অনুসরণ করবে, মাটিকে আদেশ দিলে তার খনিজ পদার্থ বহির্গত করবে। মানুষকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। তখন বহু মানুষ ধোকায় পড়ে তাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু মুমিন কোনদিন তা করবে না। যার ফলে মুমিনকে হত্যা করে দাজ্জাল তার জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। অথচ সে জাহান্নাম প্রকৃতপক্ষে জান্নাতই হবে। *(মুঃ ২ ১৩৭)*

দাজ্জাল খুরাসানে আবির্ভূত হবে। *(সিঃ সঃ ১৫৯১)* কিন্তু তার আসলত্বের পরিচিতি ও প্রচার হবে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায়। *(মুঃ ২ ১৩৭)*

সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। কিন্তু সে সময়ে একদিন হবে একটি বছরের সমান। একটি এক মাসের সমান। একটি এক সপ্তাহের সমান দীর্ঘ এবং তার বাকী দিনগুলি সাধারণ দিনের মত হবে। দীর্ঘ লম্বা দিনে মুসলিম সাধারণ দিনের হিসাবে অনুমান করে নামায আদায় করবে। *(মুঃ ২ ১৩৭, মিঃ ৫৪৭৫)* মিথ্যুক দাজ্জালের অধিক অনুগামী হবে ইয়াহুদ। (তারা এখন থেকেই সেই নেতাকে নিয়েই সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করার স্বপ্ন দেখছে।) আবার তার অনুগামীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশী হবে। *(মুঃ আঃ ৪/২ ১৬-২ ১৭)*

দাজ্জালের দলের সহিত মুসলিমদের সংঘর্ষ হবে। মুসলিমরা তার ফিতনায় ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

সেই সময় আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা ﷺ-কে আসমান হতে দক্ষিণ সিরিয়ার এক মসজিদের মিনারে অবতীর্ণ করবেন। দাজ্জালের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলবে। ফজরের নামাযের জন্য একামত হবে ঠিক সেই সময় তিনি আবির্ভূত হবেন। মুসলিমদের ইমামের পশ্চাতে নামায পড়ে তিনিও যুদ্ধের জন্য তৈরী হবেন এবং ফিলিস্তিনের পথে (যেখানে দাজ্জাল তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মুসলমানদেরকে অবরোধে রাখবে) রওনা হবেন। দাজ্জাল, ইয়াহুদ এবং মুসলিমদের মাঝে বিরাট সংঘর্ষ হবে। মুসলিমরা জয়লাভ করবে। ইয়াহুদ চিরতরে ধ্বংস হবে। যেখানেই কোন ইয়াহুদী আত্মগোপন করে বাঁচতে চাইবে সেখানকার (গারকাদ নামক এক কাঁটাদার গাছ ছাড়া) সমস্ত গাছ, পাথর ও প্রাণী মুসলিমকে ইয়াহুদীর প্রতি ইঙ্গিত করে তাকে হত্যা করতে বলবে! অবশিষ্ট সমস্ত আহলে কিতাবগণ হযরত ঈসার (আঃ) উপর ঈমান আনবে। *(কুঃ ৪/১৫৯, সঃজাঃ ৭৭৫২)* আর দুরন্ত দুর্ধর্ষ দাজ্জালকে হযরত ঈসা (আঃ) নিজ হাতে হত্যা করবেন।

এর কিছুদিন পর ইয়া'জুজ ও মা'জুজের প্রাদুর্ভাব হবে। তারাও একশ্রেণীর দুরন্ত ভীষণ অত্যাচারী অসংখ্য আদম সন্তান। বাদশাহ যুল-কারনাইন যে প্রাচীর দিয়ে তাদেরকে এক পর্বতের মাঝে বন্দি করে রেখেছিলেন, সেই প্রাচীর ছেদ করে তারা বাইরে এসে তছনছ শুরু করবে। *(কুঃ ১৮/৯৪-৯৯)* যে জলাশয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে (সংখ্যাধিক্য ও পিপাসার তাড়নার ফলে) তার সমস্ত পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। তাদের চরম উৎপাত শুরু হবে। তখন হযরত ঈসা ﷺ দুআ করবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে একপ্রকার পোকা প্রেরণ করবেন। যার দংশনে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার তাদের শবদেহের পচন গন্ধে সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

আল্লাহ তাআলা বড় বড় পাখী প্রেরণ করবেন। সেই পাখির দল সমস্ত শবদেহকে কোথাও দূরে ফেলে দেশ পরিষ্কৃত করবে। অতঃপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হবে এবং সবকিছু ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে যাবে। *(মুঃ ২১৩৭)*

অতঃপর শুরু হবে সোনার যুগ। ফুলে-ফসলের পৃথিবী সবুজ হয়ে উঠবে। সকল মানুষ ধনবান হবে। ন্যায় পরায়ণতা এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা হবে। লোভ, দ্বেষ, শত্রুতা ও মাৎসর্য ইত্যাদি অন্যায়াচরণ ধরণী থেকে বিদায় নেবে। বিষধর জীবজন্তুকে বিষহীন করা হবে। কোন হিংস্রজন্তুর হিংসা থাকবে না। কেউ কারো শত্রু থাকবে না। মানুষ ও পশু কেউ কাউকে দেখে ভয় পাবে না। শান্তির আলোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এক হবে। এক মন, এক ধর্ম এক রাজ। সকলেই মুসলমান হবে। তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা আদৌ হবে না। কোন কলহ-বিবাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না। জগতে বিরাজ করবে শুধু বরকত বা প্রাচুর্য, সুখ আর শান্তি। *(সঃ জাঃ ৭৭৫২)*

হযরত ঈসা ﷺ কোন নতুন ধর্ম বা খ্রীষ্টান ধর্ম নিয়ে আসবেন না। তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্মীয় অনুশাসনই প্রতিষ্ঠিত করবেন। এইভাবে তিনি চল্লিশ বৎসর যাবৎ দুনিয়ায় অবস্থান করবেন। তারপর তাঁর তিরোধান হবে।

তদনন্তর অধিক স্বাচ্ছ্যন্দ ও বিলাসিতায় পুনরপি মানুষ আল্লাহকে ভুলতে বসবে। ধীরে ধীরে ধর্মীয় জ্ঞান বিলীন হয়ে যাবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইসলামী ধর্মকর্ম মানুষ পরিহার করবে এবং ভুলেও যাবে। কুরআন শরীফ অন্তর্হিত হবে। একটি আয়াতও পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না। (হাফেয তো থাকবেই না।) সাদা মুসহাফ পড়ে থাকবে। কিছু বৃদ্ধ মানুষ কেবল কলেমাটি মনে রাখবে। *(সিঃ সঃ ৮৭)*

আজব এক জন্তুর আবির্ভাব হবে। যা মানুষের সহিত কথা বলবে। *(কুঃ ২৭/৮২)* অতঃপর একপ্রকার বাতাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যাতে প্রত্যেক মুমিনের মৃত্যু হবে। অবশিষ্ট থাকবে শুধু কাফের ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ। মানুষ পুনরায় জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে ফিরে যাবে। শুরু হবে আবারও মূর্তিপূজা। প্রকাশ হবে যত মহাপাপের। মানুষ রাস্তা-ঘাটে পশুর ন্যায় একে অপরের সম্মুখে ব্যভিচার করবে।(যদিও তা পশ্চিমী সভ্যতায় বর্তমানেও বিদ্যমান।) *(মুঃ ২৯৩৭)* খাটো পা বিশিষ্ট এক কৃষ্ণকায় হাবশী বায়তুল্লাহ কা'বা শরীফ ধ্বংস করে তার সমস্ত সম্পদ লুটে নেবে। *(সঃ সঃ ১/২৪৫)*

অতঃপর পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে। মানুষ তা দেখে ভয়ে ঈমান আনতে চাইবে। কিন্তু তখন 'তওবা'র দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কারো ঈমান তখন কোন কাজে দেবে না। *(কুঃ ৬/১৫৮, বুঃ ৪৬৩৬, মুঃ ১৫৭)*

কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত এক ভীষণ ক্ষিপ্ত অগ্নি; যা মানুষকে হাশরের মাঠের দিকে জমায়েত করবে। *(মুঃ ২৯০১)*

এসব ভবিষ্যদ্বানী কোন বস্তুবাদীর ঠনঠনে জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য না হলেও মুসলিমের নিকট তা খাঁটি বাস্তব ও সত্য। "তোমার সম্প্রদায় তো ওকে মিথ্যা বলেছে অথচ উহা সত্য। বল 'আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই।' প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।" *(কুঃ ৬/৬৬-৬৭)*

কিয়ামত

আল্লাহর ইচ্ছায় যখন কিয়ামত আসার সময় হবে তখন হযরত ইসরাফীল ﷺ-কে শিঙ্গায় ফুৎকারের নির্দেশ দেওয়া হবে। জুমআর দিন সুবৃহৎ শিঙ্গায় ফুৎকার করলে সমস্ত জীব মৃত্যুকবলিত হবে। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। *(কুঃ ৬৯/১৩-১৪)* প্রকম্পিত হবে সারা দুনিয়া এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। *(কুঃ ৭৩/১৪)* আকাশ হবে গলিত ধাতুর এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত, *(কুঃ ৭০/৮০, ১০১/৫)* উন্মূলিত মরীচিকাবৎ। *(কুঃ ৭৮/২০)*

সেদিন পৃথিবী হবে শূন্য প্রান্তর। *(কুঃ ১৮/৪৭)* মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত হবে; যাতে কোন উঁচু-নীচু দৃষ্ট হবে না। *(কুঃ ২০/১০৬-১০৭)* তার গর্ভে যা আছে সব নিক্ষিপ্ত হবে। *(কুঃ ৮৪/৪)* সেদিনকার পৃথিবীর মাটি হবে পূর্বের থেকে ভিন্নতর। শুভ্র পরিষ্কৃত চিহ্নহীন বিস্তৃত ও বর্ধিত ভূমিতে পরিণত হবে। *(বুঃ ৬৫২১)*

সমুদ্র উদ্বেলিত হবে। *(কুঃ ৮২/৩)* এবং প্রজ্বালিত হবে। *(কুঃ ৫২/৯)*

সেদিন আকাশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে। *(কুঃ ৫২/৯)* বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। *(কুঃ ৬৯/১৬,৮২/১, ৮৪/১)* লিখিত দফতর গুটানোর ন্যায় গুটিয়ে ফেলা হবে। *(কুঃ ২১/১০৪)*

সেদিন সূর্য নিষ্প্রভ হবে। *(কুঃ ৮১/১)* চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে। সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে *(কুঃ ৭৫/৭-৮)* নক্ষত্র মন্ডলী বিক্ষিপ্ত হবে এবং খসে খসে পড়বে। *(কুঃ ৮২/২,৮১/২)*

সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হবে। কেবল আরশ, কুর্সী, লওহ, কলম এবং সূর (শিঙ্গার) ধ্বংস হবে না। সেদিন আল্লাহ পাক পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন এবং আকাশ মন্ডলীকে তাঁর দক্ষিণ হস্তে গুটিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন, 'আমিই বাদশাহ। কোথায় পৃথিবীর বাদশাগণ?' *(কুঃ ৩৯/৬৭, বুঃ ৪৮১৯)*

অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে। যাতে সমস্ত আত্মা স্ব-স্ব দেহে (বা দেহাংশে) সংযুক্ত হয়ে যাবে। মানুষের সবকিছু মাটি হয়ে গেলেও মেরুদন্ডের নিম্নাংশ অবশিষ্ট থাকে। সেই অস্থি থেকেই উদ্ভিদের ন্যায় মানুষ সজীব হয়ে উঠবে। *(কুঃ /৫৭ বুঃ ৪৮১৪,মুঃ ২৯৫৫)*

যাদের দেহ মাছের পেটে থেকে সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায় অথবা অগ্নিদাহে ভষ্ম হয়ে যায়, তাদের দেহেরও কোন না কোন অণুপরিমাণ অংশ নিয়ে (অথবা না নিয়েই) আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহ তাদেরকেও পুনরুত্থিত করবেন। আর তা আল্লাহর নিকট অতি সহজ।

সারা সৃষ্টজীব পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রথম জীবনের চেয়ে এ জীবন কিছুটা ভিন্নতর হবে। যেমন, এ জীবনে যত কষ্টই হোক, যতই মৃত্যু আসুক কিন্তু তবুও কারো মরণ হবে না। *(কুঃ ১৪/১৭)*

পার্থিব জীবনে যা দৃশ্য ছিল না, তা এ জীবনে দৃশ্য হবে। যেমন, ফিরিশ্তা ও জিন সম্প্রদায়কে দেখা যাবে। জান্নাতে জান্নাতীদের থুথু, প্রস্রাব, পায়খানা আদি অপবিত্রতা বলতে কিছু থাকবে না, ইত্যাদি। *(কিঃকুঃ ৫৪)*

মাটি থেকে সর্ব প্রথম উঠবেন আমাদের মহানবী ﷺ। *(মুঃ ২২৭৮)*

প্রত্যেক জিন ও ইনসান চাহে তার সমাধি মাটিতে হোক কিংবা পানিতে, কোন জন্তুর জঠরে হোক কিংবা কোন পাখী বা মাছের উদরে, মোট কথা যে যেখানেই থাক না কেন সেদিন সকলকে একত্রিত হতেই হবে। সকলকেই আল্লাহ জমায়েত করবেন। *(কুঃ ২/১৪৮)* ভুলক্রমে কেউ কোথাও থেকে যাবে না। আল্লাহ্ জাল্লাত কুদরাতুহ্ সকলকে বিশেষভাবে গণনা ও হিসাব করে রেখেছেন। *(কুঃ ১৮/৪৮, ১৯/৯৩-৯৫)* এমনকি অন্যান্য প্রাণীসমূহকেও একত্রিত করা হবে। *(কুঃ ৪২/২৯,৮১/৫)* এবং সেদিন তাদের আপোষের ইনসাফ দিয়ে মাটিতে পরিণত করা হবে। যখন কাফেররা বলবে, হায়! যদি আমরাও মাটি হতে পারতাম! *(দুঃ মঃ ৮/৪০১)*

সেদিন মানুষ উলঙ্গ বে-খতনা অবস্থায় খালি পায়ে হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে। কিন্তু সেদিনকার ভয়ঙ্কর কঠিনতায় কেউ কারো দিকে দৃকপাত করে পর্যন্ত দেখবে না। *(বুঃ ৬৫২৬,মুঃ ২৮৫৯)*

যারা হজ্জ বা ওমরার ইহরাম অবস্থায় ইন্তেকাল করে তারা কিয়ামতে তালবিয়াহ পড়তে পড়তে উত্থান করবে। শহীদগণের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। আর সে রক্তের সুগন্ধ হবে মিশ্‌ক আম্বরের মত। *(বুঃ ২৮০৩)*

অতঃপর সকলকে পরিধেয় বস্ত্র দেওয়া হবে। সর্বাগ্রে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ ﷺ -কে বস্ত্র পরানো হবে। *(বুঃ ৬৫২৬, মুঃ ২৮৬৯)*

কিয়ামতের ভয়াবহতা

কিয়ামত- মহাপ্রলয় দিবস।

সে এক মহাদিন। যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। *(কুঃ ৮৩/৪-৬)* কঠিন ভয়ানক সে দিন। *(কুঃ ৬৭/২৭)* তার ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার। প্রত্যক্ষকারী সেদিন দেখতে পাবে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন। *(কুঃ ২২/১-২)* সেদিন মানুষের হৃদয় সন্ত্রস্ত এবং দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। *(কুঃ ৭৯/৮-৯)* সেদিনকার ভয়াবহতা তরুণকে বৃদ্ধে পরিণত করবে। *(কুঃ ৭৩/১৭)* সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না। আর একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না। *(কুঃ ২৩/১০১)* মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা পত্নী ও তার সন্তানদের পরিহার করবে। সেদিন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। *(কুঃ ৮০/৩৪-৩৭)* সেদিন পিতা সন্তানের কোন উপকারে এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। *(কুঃ ৩১/৩৩)* সেদিন কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবে না, কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কেউ কোন প্রকার সাহায্য পাবে না। *(কুঃ ২/৪৮)* সে দিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে, আর না বন্ধুত্ব বা সুপারিশ। *(কুঃ ২/২৫৪)*

পৃথিবীতে মানুষ সম্পদের বিনিময়ে, উপঢৌকন ভেট অথবা ঘুষ দিয়ে কিংবা বন্ধুত্ব ও পরিচয়ের মাধ্যমে, কিংবা সুপারিশ, তোষামদ বা চাটূক্তির মাধ্যমে নিজের স্বার্থে সিদ্ধিলাভ করে থাকে। কিন্তু সেদিন এর সবটাই অচল। পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ

প্রদান করলেও কখনো তা কবুল করা হবে না। *(কুঃ ৩/৯১)*

সেদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সেদিন সুহৃদ সুহৃদের খবর নেবে না। যদিও ওদেরকে একে অপরের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে রাখা হবে। সেদিন অপরাধী শাস্তি হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মুক্তি-পণ স্বরূপ দিতে চাইবে -তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু -যদি এ মুক্তি-পণ তাকে মুক্ত করতে পারত! না, কখনই না। এগুলি তাকে রক্ষা করবে না। *(কুঃ ৭০/৪-১৫)*

সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে। *(কুঃ ১০১/৪)* সেদিনের দীর্ঘতায় মানুষ মনে করবে, যেন সে পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতকাল অবস্থান করেছে। *(কুঃ ৭৯/৪৬, ১০/৪৫)* সেদিন সূর্য মাইল বরাবর মানুষের নিকটবর্তী হবে। *(মুঃ ২৮৬৪, মুঃ আঃ ৫/২৫৪)* এবং আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। *(বুঃ ৬৬০, মুঃ ১০৩১, মু আঃ ৪/১২৮)*

কাফেরদের অবস্থা

সেদিন কাফেরদেরকে ওদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করা হবে। *(কুঃ ১৭/৯৭, বুঃ ৬৫২৩)* সেদিন ওরা কবর হতে দ্রুতবেগে বের হবে। মনে হবে ওরা কোন একটি লক্ষ্য স্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। হীনতাগ্রস্ত হয়ে ওরা ওদের দৃষ্টি অবনত করবে। *(কুঃ ৭০/৪৩-৪৪)* অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন ওরা কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বের হবে। ওরা আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, 'ভয়াবহ এ দিন!' *(কুঃ ৫৪/৭-৮)* বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে সুপ্তোত্থিত করল?' *(কুঃ ৩৬/৫২)* সেদিন ওদের চক্ষুস্থির হবে। হীনতায় আকাশের দিকে চেয়ে ওরা ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছুটাছুটি করবে। ওদের নিজেদের প্রতি ওদের দৃষ্টি থাকবে না এবং ওদের অন্তর বিকল হবে। *(কুঃ ১৪/৪২-৪৩)* দুঃখে-কষ্টে ওদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। তাদের অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু হবে না; যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও হবে না। *(কুঃ ৪০/১৮)*

সেই দিন অপরাধীগণকে হস্ত-পদশৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখা যাবে। ওদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি ওদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করবে। *(কুঃ ১৪/৪৯-৫০)*

সূর্য অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে মানুষ অত্যন্ত ঘর্মসিক্ত হবে। স্বেদস্রাবে আমল অনুযায়ী কারো পায়ের গ্রন্থি অবধি, কারো হাঁটু অবধি, কারো কটি অবধি, কারো বা নাসিকা (ও কর্ণ) পর্যন্ত ডুবন্ত হবে। *(মুঃ ১৪৭৪, মুঃ ২৮৬৪)* ([16]) মাটির নিচে সেই ঘাম পৌঁছবে ৭০ হাত। *(বুঃ, মিঃ ৫৫৩৯নং)*

সেদিন বড় পরিতাপের দিন! সে কঠিন দিনে আল্লাহর ভয়ঙ্কর আযাব এবং নিজের লাঞ্ছনা দেখে কাফের অত্যাধিক আফসোস ও লজ্জায় ফেটে পড়বে। সে নিজের হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, যদি আমি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!

([16]) *সূর্য এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও কেউ পুড়ে যাবে না। কারণ, আখেরাতের শরীর পার্থিব শরীর থেকে ভিন্নতর। যেমন ৭০ গুণ তেজ আগুনে ও জাহান্নামে কেউ ভস্ম হয়ে শেষ হয়ে যাবে না।*

হায় দুর্ভোগ, যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছানর পর।' *(কুঃ ২৫/২৭-২৮)*

কাফেরদের অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করা হবে না। তাদের কোন ওযর-আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না। যখন তারা নিরাশ হয়ে পড়বে, তখন নিজেদের ধ্বংস কামনা করে মাটিতে পরিণত হতে চাইবে। *(কুঃ ৪/৪২, ৭৮/৪০)* সেদিন তাদের সমস্ত আমল বিফল ও ব্যর্থ করা হবে। কারণ, তাদের সব আমলই ছিল ভিত্তিহীন (তাওহীদহীন)। *(কুঃ ২৪/৩৯, ৩/৮৫, ১১৭, ১৪/১৮, ২৫/২৩)*

সেদিন মুত্তাকীন ছাড়া সকলের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হবে। *(কুঃ ৪৩/৬৭)* বাতিল পূজারী ও পূজিতের মাঝে বিতর্ক ও ঝগড়া হবে। *(কুঃ ২৬/৯১-৯৯)* পূজারীরা তাদের দেব-দেবী (মূর্তি, গাছ, পাথর, কবর ইত্যাদি) গুলিকে অস্বীকার করবে। *(কুঃ ৩০/১৩)*

যে সমস্ত ফিরিশ্তা নবী ও ওলীর তাঁদের অজান্তে ও অসম্মতিতে ইবাদত করা হয়েছে তাঁরা সকলেই তা অস্বীকার করবেন। আর এ ব্যাপারে তাঁদের অনবধনতা, নির্লিপ্ততা এবং উদাসীনতা প্রকাশ করবেন। *(কুঃ ৫/১১৬-১১৭, ১০/২৮-৩০, ১৬/৮৬-৮৭, ৩৪/৪০-৪১)*

সেদিন বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের নেতাদের সাথে তাদের অনুগামীগণ বিতর্ক ও কলহ করবে এবং এক অপরকে দোষী মনে করবে। *(কুঃ ৩৭/২৯-৩৫)*

দুর্বল শ্রেণীর মানুষ তাদের সবল মোড়ল মাতব্বরদের সহিত ঐ একই ধরনের বাদ-প্রতিবাদ করবে। এ দুর্দিনের জন্য তারা তাদের নেতাদেরকে দায়ী মনে করবে। *(কুঃ ১৪/২১, ৩৪/৩১-৩৩, ৩৮/৫৫-৬৪, ৪০/৪৭-৪৮)*

কাফের ও তার জীবন সাথী শয়তান কারীনের মাঝেও বাদ-বিসংবাদ ও বাগ্‌বিতন্ডা চলবে। *(কুঃ ৫০/২৩-২৯)* মানুষ তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথেও ঝগড়া করবে। *(কুঃ ৪১/১৯-২১)* তেমনি তার দেহ আত্মার সঙ্গে বিতর্ক করবে এবং একে অপরকে দোষারোপ করে জাহান্নাম যাওয়া ও আযাবের কারণ বলে মনে করবে। *(তঃ ইঃ কাঃ ৬/৯২)*

আযাবের কঠিনতায় একে অপরকে এর জন্য দায়ী করবে। প্রত্যেক অনুসারী ব্যক্তি তার অনুসৃত নেতার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার জন্য ডবল শাস্তি কামনা করবে। *(কুঃ ৭/৩৮, ৩৩/৬৬-৬৭, ৪১/২৯)*

শয়তান তার অনুসারী ও পূজারীদের কাছে নিজের সাফাই পেশ করবে। সমস্ত দোষ ও অপরাধ তাদের উপর চাপিয়ে দিবে। *(কুঃ ১৪/২২)*

যে আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় (কুরআন ও দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাকে সেদিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। *(কুঃ২০/১২৪)*

গোনাহগার মুমিনদের অবস্থা

সেই ভয়ানক দিনে গোনাহগার মুমিনদেরও বিভিন্ন আযাব হবে। যারা মালের যাকাত আদায় করেনি, তাদের মালকে বিষধর সর্পের রূপ দিয়ে তাদের কণ্ঠে জড়ান হবে। *(মিঃ ১৭৭৪)* তাদের সোনা চাঁদি ও মুদ্রাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগা হবে। *(কুঃ ৯/৩৪-৩৫)* যে সমস্ত পশুর যাকাত আদায় করেনি, সেই সমস্ত পশু তাদেরকে পদদলিত ও পিষ্ট করবে। এসব ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পক্ষে জান্নাত অথবা জাহান্নামের ফায়সালা না হয়েছে। *(মুঃ ৯৮৭)*

অহংকারী ও গর্বিত মানুষ সেদিন পিপিলিকার ন্যায় ক্ষুদ্ররূপে দন্ডায়মান থাকবে। সর্বদিক থেকে তাকে অপমান ও লাঞ্ছনায় বেষ্টন করবে। *(কুঃ ৫১১২)*

যাদের প্রতি আল্লাহপাক সেদিন ভীষণ রাগান্বিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বলবেন না, তাকিয়ে দেখবেন না এবং ক্ষমাও করবেন না তারা ঃ শরীয়তের কোন জ্ঞান কোন স্বার্থলোভে গোপনকারী আলেম। *(কুঃ ২/১৭৪)* অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী। স্বার্থবশে মিথ্যা কসমখোর। *(কুঃ ৩/৭৭)* পায়ের গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী (পুরুষ)। মিথ্যা কসম খেয়ে মাল বিক্রেতা। কারো প্রতি উপকার ও অনুগ্রহ করে তা প্রকাশ করে আত্মপ্রশংসাকারী। *(মুঃ ১০৮)* উদ্বৃত্ত পানি থাকা সত্ত্বেও যে পথিকের তৃষ্ণা নিবারণ করে না, স্বার্থের জন্য যে ইমামের হাতে বায়াত করে, *(মুঃ১০৮)* বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী রাজা, অহংকারী গরীব। *(মুঃ ১০৭)* পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী নারী, যে নিজের স্ত্রী-কন্যা-বোনকে পর-পুরুষের (যাদের সঙ্গে বিবাহ কোন কালেও বৈধ এমন লোকদের) সাথে অবাধ মিলামিশায় বাধা দেয় না। (বা বর্তমানের প্রগতিবাদী ও আলোকপ্রাপ্ত বা তথাকথিত সভ্যশ্রেনীর মানুষ যারা এ ধরনের নগ্নতা ও পর্দাহীনতাকে নারী স্বাধীনতা বলে মনে করে।) *(মুঃ জাঃ ৩০৬৬)* স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গমকারী। *(তিঃ ১১৬৫)*

সেদিন বিলাসপ্রিয় সম্পদশালী বড় সংকীর্ণতায় অবস্থান করবে। *(সিঃ সঃ ৩৪৩)* প্রত্যেক ধোকাবাজের কাছে সেদিন ধোকার পতাকা হবে। আমানতে খেয়ানতকারীর প্রত্যেক আমানত সেদিন উপস্থিত করা হবে। যার দরুন তারা সেই সুবিশাল জনসমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। *(কুঃ ৩/১৬১, মুঃ ১৭৩৬)*

যারা অপরের নিকট হতে না হক জমি আত্মসাৎ করে (জবর দখল করে বা লিখিয়ে নেয়) তাদেরকে ভূগর্ভস্থ করা হবে। *(বুঃ ২৪৫৪, মুঃ আঃ ২/৯৯)*

যারা দু'মুখে যেখানে যেমন সেখানে তেমন কথা বলে তাদের আগুনের জিভ হবে। *(সংজাঃ ৬৪৭১)* যারা সামর্থ্যবান অথচ যাচ্ঞা করে তাদের মুখে সেদিন মাংস থাকবে না। *(বুঃ ১৪৭৪, মুঃ ১০৪০)* কেবলার দিকে যে থুথু ফেলে তার থুথু সেদিন তার চক্ষুর সামনে হাযির করা হবে। *(সিঃসঃ ২২)* যারা মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়ে বর্ণনা করে তাদেরকে দু'টি যবের মাঝে সংযোগ সাধন করতে বলা হবে (যা কারো সাধ্য নয়।) গুপ্ত কথায় যারা কানাচি পাতে তাদের কানে গলিত সীসা ঢালা হবে। *(বুঃ ৭০৪২)*

মুত্তাকী মুমিনগণের অবস্থা

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সেদিন কোন ভয়-শঙ্কা থাকবে না। *(কুঃ ৪৩/৬৮-৬৯)* তারা সেদিন নিরাপদে অবস্থান করবেন। *(কুঃ ৬/৮২, ২১/১০১)* তবুও আল্লাহর ক্রোধ দেখে সকলেই চিন্তিত হবেন।

সেই রৌদ্র-প্রখর ছায়াহীন দিনে আল্লাহপাক যাদেরকে আরশের ছায়া দান করবেন তারা ঃ ন্যায়পরায়ণ বাদ্শাহ, যৌবনে ইবাদতকারী যুবক, মসজিদের প্রতি যার অন্তর ঝুলে থাকে, আল্লাহর তুষ্টি বিধানের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপনকারী দুই বন্ধু, এমন শরীফ ও সংযমী পুরুষ যে আল্লাহর ভয়ে কোন সম্ভ্রান্তা সুন্দরী অভিসারিকার ডাকে সাড়া দেয় না, গুপ্তভাবে দানশীল, নির্জনে আল্লাহকে স্মরণকালে অশ্রু বিসর্জনকারী ব্যক্তি। *(বুঃ ৬৬০,*

মুঃ ১০৩১) এবং যে ব্যক্তি তার ঋণীকে ঋণ-পরিশোধে অধিক সময় দান করে অথবা ঋণ মাফ করে দেয়। *(তিঃ ১৩০৬)*

অনেক মানুষের প্রতিদান তাদের আমলের সমরূপ হবে; যেমন যে অপরের কষ্ট দূর করে আল্লাহ কিয়ামতে তার কষ্ট দূর করবেন। যে অপরকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাকে সেদিন ক্ষমা করবেন, ইত্যাদি। যারা ন্যায় বিচার করে থাকে তারা সেদিন নূরের মেম্বারে উপবেশন করবে। *(মুঃ ১৮২৭)* ওযু করে যারা নামায কায়েম করে তাদের ওযুর অঙ্গগুলি কিয়ামতে নূরে চমকিত হবে। *(বুঃ ১৩৬)*

মুমিনদের জন্য এ দিন হবে মাত্র যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়কাল সমান। *(হাঃ ১/৮৪, সিসঃ ২৪৫৬ নং)*

শাফাআত বা সুপারিশ

কিয়ামত কি বিভীষিকাময় দিন! বান্দার প্রত্যেক কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। স্বয়ং আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লা তাদের হিসাব নেবেন। নবী, ওলী, শহীদ, সালেহ সকলেই চিন্তিত। সকলের ভাবনা নিজেকে নিয়ে। সেদিন না কোন উকিল থাকবে, না কোন বন্ধু। না কোন বিনিময়, ঘুস, জরিমানা আর না-ই কোন সাহায্য সুপারিশ। *(কুঃ ২/২৫৪)* সেই আদালতের হাকীম স্বয়ং আল্লাহ। তাঁর বিচারে না কোন উকিলের দরকার, না কোন সাক্ষী বা প্রমাণ-সবুত পেশ করার প্রয়োজন। কারণ, তিনিই হাকীম, তিনিই 'ওয়াকীল' (উকিল) তিনিই বান্দার সমস্ত কর্মের উপর সাক্ষী ও প্রত্যক্ষ দর্শী। *(কুঃ ৩/৯৮, ২২/১৭)*

তবুও বান্দাকে ন্যায়বিচারে সুনিশ্চিত করার জন্য আম্বিয়া, উম্মতে মুহাম্মাদিয়া এবং বান্দার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গকেও সাক্ষী মানা হবে। *(কুঃ ২/১৪৩, ২২/৭৮, ৩৯/৬৯, ২৪/২৪, ৩৬/৬৫, ৪১/২০)*

বান্দা যা কিছু মনে মনে করে অথবা কার্যে পরিণত করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তাঁর জানা। *(কুঃ ৩/২৯, ২৭/২৫, ৬০/১, ৩৩/৪৫)* সমস্ত সুপারিশের অধিকারীও তিনিই। কার ক্ষমতা যে, তাঁর দরবারে সুপারিশ করে? *(কুঃ ২/ ৪৮, ২৫৪, ৩৯/৪৪)*

কিন্তু সেই ভয়ানক দিবস কিয়ামত কোর্টের বিচারক আল্লাহ তাআলা চাইলে, তাঁর অনুমতিক্রমে কারো সুপারিশ চলবে। কিন্তু কে করবে, কার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি হবে তার কয়েকটি জ্ঞাতব্য শর্ত রয়েছে ঃ

১। সুপারিশকারীর সুপারিশ করার ক্ষমতা ঃ অতত্রব যার ক্ষমতা নেই, যে নিজেরই কৃতকর্ম নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত, তার কি হবে- তাই নিয়ে যে ব্যস্ত সে কোনদিন সুপারিশ করতে পারবে না। তাই বাতিল মা'বুদের বিশ্বাসীরা যারা আল্লাহ ব্যতীত কোন মাটি-পাথরের কাছে সুপারিশের আশা রাখে তাদের ধারণা ও আশা ভ্রান্ত। *(কুঃ ৩৪/২৩, ৪৩/৮৬)*

২। যার জন্য সুপারিশ করা হবে সে যেন তৌহীদবাদী মুসলিম হয় ঃ অর্থাৎ কোন মুশরিক বা কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ হবে না। *(কুঃ ৪০/১৮)* ([17])

৩। যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি ঃ

---

(১৭) *অবশ্য আবুতালেবের জন্য নবী ﷺ এর সুপারিশ কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট।*

অতএব তিনি যার জন্য সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজি ও সম্মত হবেন তার জন্য হবে। *(কুঃ ৫৩/২৬)*

৪। সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর অনুমতি ঃ তিনি যাকে অনুমতি দেবেন কেবল সেই ব্যক্তিই সুপারিশ করতে পারবে। *(কুঃ ২/২২৫, ২০/১০৯)*

অতএব নিজ ইচ্ছায় কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, দুনিয়ার কোন অজ্ঞ রাজার দরবারের সুপারিশের সাথে সেই সর্বজ্ঞ রাজাধিরাজের দরবারের সুপারিশের কোন মিল নেই, কোন তুলনা নেই। দুনিয়ায় রাজা বা শাসকের দরবারে এমন লোক সুপারিশ করে থাকে যার সে বিষয়ে কোন যোগ্যতা নেই। কিন্তু তার আধিপত্য, সম্মান বা ঐশ্বর্যের খাতিরে সুপারিশ গ্রহণ করে নেওয়া হয়। অথবা তার প্রতি অধিক প্রেম ও ভালোবাসা অথবা বন্ধুত্বের খাতিরে গ্রহণ করা হয়। অথবা তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বা মোসাহেবির কারণে মঞ্জুর করে নেওয়া হয়।

আবার এমন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হয় যে নেহাতই ক্ষমার যোগ্য নয়। কিন্তু আল্লাহর দরবারে এর কোনটাই চলবে না । বিচার তাঁর হাতে, সুপারিশ ডোরও তাঁরই হাতে। তাঁর বিনা অনুমতিতে কোন যোগ্য সুপারিশকারীরও মুখ পর্যন্ত খুলার ক্ষমতা হবে না। *(কুঃ ৭৮/৩৮)*

দুনিয়ার কোন বাদশাহর দরবারে কোন চোরকে চুরির দায়ে পেশ করা হলে রাজ্যের আইনানুসারে রাজা তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কোন মন্ত্রী বা সদস্যের সুপারিশের ফলে চোরকে কোন শাস্তি না দিয়েই মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কারণ, মন্ত্রী ও সদস্য নিয়ে তাঁর রাজত্ব চলে। রাজ্যের বিবিধ উন্নয়ন-ভার তাঁদের উপর; অতএব তাঁদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে চোরকে শাস্তি দিয়ে তাঁদের মর্যাদাহানী করে মন ভাঙ্গতে চান না। কারণ, তাতে রাজ্যের শৃঙ্খল-ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন পথে বাধা পড়তে পারে।

আল্লাহ জাল্লা শানুহর দরবারে এ ধরনের মর্যাদা বলে সুপারিশ একেবারেই অসম্ভব। কারণ, তাঁর রাজ্যে কোন মন্ত্রী, সদস্য, অমাত্য, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা বা সহায়কের প্রয়োজন নেই। তিনি সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদশাহ এবং স্বাবলম্বী কর্তা। সারাজাহানের নিয়ম-শৃঙ্খল তাঁর নিজ হাতে নিয়ন্ত্রিত। *(কুঃ ৩৪/২১)* অতএব কারো ইয্যত-মর্যাদা বা মনের খেয়াল তিনি করেন না। সারা সৃষ্টি যদি কাফের হয়ে যায় তবুও তাঁর কোন পরোয়া নেই। *(কুঃ১৪/৮, মুঃ ২৫৭৭)* তাঁর রাজ্যে কোন ক্ষতির ভীতি তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি তো ইচ্ছা করলে 'কুন' (হও) শব্দে অসংখ্য নবী, ওলী সৃষ্টি করতে পারেন। অতএব কারো সুপারিশে তাঁর বাধ্য হওয়ার কোন প্রসঙ্গই ওঠেনা। তাই মুসলিম এ ধরনের কোন সুপারিশে বিশ্বাসী নয়। কারণ, এ ধরনের শাফাআতে কাউকে সুপারিশকারী মানা শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

কিংবা চোরের জন্য বাদশার কোন আত্মীয়; বেগম বা রাজকুমার অথবা কোন বন্ধু মুক্তির দাবী নিয়ে সুপারিশ করে। বাদশাহ তাদের ভালোবাসার খাতিরে বাধ্য হয়ে চোরকে ক্ষমা করে দেন। এ ধরনের স্বজন-প্রীতির বলে কোন সুপারিশও তাঁর দরবারে অসম্ভব। মুসলিম এ ধরনের শাফাআতে বিশ্বাসী নয়। সে শাহানশাহ নিজ বান্দাকে যতই নৈকট্য ও মহব্বতে সম্মানিত করেন- কাউকে খালীলুল্লাহ, কাউকে কালীমুল্লাহ কাউকে রূহুল্লাহ কাউকে ওজীহ, কাউকে 'রসূলে কারীম', কাউকে 'মাকীন', কাউকে 'রূহুল কুদুস', কাউকে 'রূহুল আমীন' যেমন সুসম্মানিত উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন - তবুও বাদশাহ বাদশাহ্ই এবং প্রজা প্রজাই।। প্রভু প্রভুই, আর দাস দাসই। প্রত্যেকের

নিজ নিজ পৃথক আসন আছে। সে মহান সত্তার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই। তাঁকে কারো ভালোবাসা বা বন্ধুত্ব অথবা অন্য কোন কিছু কোন কাজে বাধ্য করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি কিছু করেন, নচেৎ না। তিনি ফায়সালা করেন, তাঁর ফায়সালায় কৈফিয়ত লেনেওয়ালা বা রদকারী কেউ নেই। *(কুঃ ১৩/৪১)*

কিংবা এ রকম হয় যে, চোরের চুরি তো সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এ চোর কোন পেশাদার চোর নয়। চুরি করা তার অভ্যাস নয়, স্বভাবও নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ শয়তানী কুচক্রে পড়ে সে চুরি করে ফেলেছে। রাজার দরবারে লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে সে ঘর্মসিক্ত। অপমানে তার মস্তক অবনত। দিবারাত্র শাস্তির ভয়ে বড় ভীত। রাজ্যের আইন-কানুনকে সে ঘাড় পেতে মানে এবং নিজেকে একজন অপরাধী, পাপী ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য মনে করে। দন্ড থেকে অব্যাহতি পাবার কামনা সে করে। কিন্তু তার জন্য বাদশার দরবার ছেড়ে কোন মন্ত্রী বা মেম্বারের দরজায় যায় না। আর বাদশাহ ছাড়া কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে বলে ধারণাও রাখে না। রাতদিন তাঁরই ফায়সালা ও ন্যায় বিচার জানার জন্য সদা উৎসুক থাকে এবং সদা তাঁরই করুণা ও দয়ার মুখাপেক্ষী থাকে। শঙ্কিত থাকে, না জানি মহামান্যের দরবারে অপরাধীর কি যোগ্য শাস্তির শুনানি হবে ?

অপরাধীর এই প্রকৃত অবস্থা বুঝে বাদশার মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করতে চান, কিন্তু রাজ্যের সংবিধান ও আইন-শৃঙ্খলারও খেয়াল রাখতে চান, যাতে লোকসমাজে আইনের মর্যাদা বিনষ্ট না হয়ে যায়। তাই তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে কোন মন্ত্রী বা সদস্য বা কোন বন্ধু সুপারিশের জন্য দন্ডায়মান হন। বাদশাহ তাঁর মর্যাদাবর্ধনের জন্য আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁর সুপারিশ মঞ্জুর করে চোরের অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

সুপারিশকারী অপরাধীর জন্য এ কারণে সুপারিশ করেননি যে, সে তাঁর কোন আত্মীয় অথবা বন্ধু। কিংবা তিনি তার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বরং তিনি কেবলমাত্র বাদশার সম্মতি লক্ষ্য করে সুপারিশের জন্য দন্ডায়মান হয়েছিলেন। কারণ, তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশার বিশ্বস্ত মন্ত্রী বা অনুগত ও মতানুবর্তী বন্ধু, অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক নন। কারণ, অপরাধীর পৃষ্ঠপোষকও অপরাধী।

মহান আল্লাহর দরবারে এই শ্রেণীর অনুমতিপ্রাপ্ত সুপারিশ হবে। মুসলিম এই সুপারিশে বিশ্বাস ও আশা রাখে।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কিয়ামতে এই শ্রেণীর সুপারিশ করবেন। *(তাঃ ঈঃ)*

অন্যান্য আম্বিয়াগণ, কিছু ফিরিশ্তা, মুমেনীনও কিয়ামতে সুপারিশ করবেন। *(বুঃ ৭৪৩৯, মুঃ ১৮৩)* শহীদগণ নিজ পরিবারের ৪০ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। *(আঃ দাঃ ২৫৬৪, বাঃ ৯/১৬৪, সঃ জাঃ ৭১৪৯)* যে সব শিশু-সন্তান শৈশবেই মারা যায় তারা তাদের মুসলিম পিতা-মাতার জন্য কিয়ামতে সুপারিশ করবে। *(মুঃ ২৬৩৫)* রোযা রোযাদারের জন্য এবং কুরআন তার পাঠকারীর (তেলাঅতকারীর) জন্য আল্লাহর দরবারে মুক্তির সুপারিশ করবে। *(মুঃ আঃ ২/১৭৪, মুঃ ৮০৪)* সূরা মুল্ক তার নিয়মিত তেলাঅতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। *(তিঃ ২৮৯১)* কোন মৃত মুসলিমের জন্য একশ জন অথবা চল্লিশজন মুসলমান যারা কোনদিন কোন শির্ক করেনি জানাযার নামাযে তাদের সুপারিশ কবুল হয়। *(মুঃ ৯৪৭, ৯৪৮)* এ সকল সুপারিশ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুমতি ও সম্মতিক্রমে সম্ভব হবে। জানাযার নামাযে বা অন্যান্য দুআ ও ইস্তেগফারে সুপারিশের শিক্ষা যেহেতু আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল (আল্লাহ তরফ থেকেই) দিয়েছেন, সেই হেতু এ সুপারিশেরও তাঁর অনুমতি রয়েছে।

তিনি না চাইলে সুপারিশ সম্ভব নয় বলেই মুসলিম মহানবী ﷺ এবং অন্যান্যদের সুপারিশ পাওয়ার কামনা করে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা জানায়। যার সুপারিশ চলবে, তার কাছেই চায় না।

যারা কথায় কথায় মানুষকে লানতান বা তিরস্কার করে, তারা কিয়ামতে কারো জন্য সুপারিশ করতে (অনুমতি) পাবে না। *(মুঃ ২৫৯৮)*

যে ব্যক্তি মদীনা নববীয়ায় শত কষ্ট বরণ করেও বাস করে সেখানে মৃত্যুবরণ করে, *(মুঃ ১৩৬৩)* যে ব্যক্তি আযানের জওয়াব দেওয়ার পর মহানবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে 'অসীলাহ' (মহানবী ﷺ-এর জন্য জান্নাতের এক সুউচ্চ সুসম্মানিত স্থান) 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-স্মাহ' -এই দুআ পড়ে প্রার্থনা করে, *(বুঃ ৬১৪, মুঃ৩৮৪)* এবং যে ব্যক্তি অধিক নফল নামায পড়ে *(মাঃ যাঃ ২/২৪৯)* সেই সকল ব্যক্তির জন্য বিশেষ করে আল্লাহর রসূল ﷺ কিয়ামতে সুপারিশ করবেন।

কিয়ামতের ময়দানের কঠিনতা ও ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ প্রথমে আদি পিতা হযরত আদম ﷺ-এর কাছে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার জন্য আবেদন জানাবে। কিন্তু তিনি আল্লাহর গযব ও নিজের ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। সকলকে হযরত নূহ ﷺ-এর নিকট যেতে বলবেন। তিনিও একই কথা খেয়াল করে হযরত ইব্রাহীম ﷺ-এর নিকট যেতে বলবেন। তিনি হযরত মূসা ﷺ-এর এবং হযরত মূসা ﷺ হযরত ঈসা ﷺ-এর নিকট, আর তিনি একই ওযর পেশ করে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ (যার পূর্ব ও পশ্চাতের গোনাহ মাফ করা হয়েছে) এর নিকট যেতে বলবেন। তাঁর নিকট এই বিরাট আবেদন রাখলে তিনি মাকামে মাহমূদে সিজদায় পড়ে আল্লাহর অসীম স্তবস্তুতি বর্ণনা করবেন। অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা তোল, কি চাও বল, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, মঞ্জুর করা হবে।'

তদনন্তর তিনি মানুষের জন্য সুপারিশ করে হিসাব নিয়ে সকলকে কিয়ামতের কঠিন দিনের ভয়ঙ্কর ময়দানের অবস্থান থেকে নিস্তার দিতে বলবেন। *(বুঃ ৭৪১০, মুঃ ১৯৩)*

কতক উম্মতি যাদের নেকী-বদী সমান হলে তাদের জান্নাত প্রবেশের জন্য, কতক উম্মতিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য, কারোর কিছু আযাব হাল্কা করার জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। সেই সুপারিশের হকদার হবে প্রতি তওহীদবাদী মুসলিম; যারা কোনদিন শির্ক করে না। আল্লাহর আসনে কোন গায়রুল্লাহকে বসায় না। *(বুঃ ৯৯, মুঃ আঃ ২/৩০৭)*

গায়রুল্লাহর কাছে কোন সুপারিশ নেই। গায়রুল্লাহ তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তার নিকট সুপারিশ চাওয়া অথবা সুপারিশের জন্য তার পূজাপাট করা শির্কে আকবর।

অতএব মুসলিম চায় শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে, তাঁর বিচারে শুধু তাঁকেই 'শাফী-কাফী' মানতে। তিনি চাইলে কেউ তার হয়ে সুপারিশ করবে, নচেৎ না। তাই সে আল্লাহ ছাড়া কারো ভরসা রাখে না। যেখানে বড় বড় নবী ওযর পেশ করে সুপারিশে সাহস করবেন না, সেখানে আর কার উপর ভরসা রাখা যাবে?

পক্ষান্তরে আল্লাহর নবী-ওলী তো তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সবকিছু করেন। যারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, শির্ক করে, বিদআত করে, উলামাদের কথায় কর্ণপাত করে না, সারা জীবন পাপে লিপ্ত থেকে নবী-ওলীর সুপারিশের আশা রাখে তাদের আশা দুরাশা।

নবী-ওলী তো আল্লাহর তুষ্টি বিধানে নিজের জান-মাল, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, শাগরেদ-মুরীদ সকলকে কুরবানী দেন। যে আল্লাহর দুশমন তাকে তাঁদের দুশমন মনে করেন- চাহে সে তাঁদের পিতাই হোক অথবা পুত্র। অতএব আল্লাহ যাকে জাহান্নামবাসী করার ইচ্ছা করবেন তার জন্য নবী-ওলী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন সুপারিশ করে জান্নাতে ভরতে যাবেন? বরং তাঁরাও চাইবেন, তাকে ধাক্কা মেরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে। কারণ তাঁরা তো আল্লাহরই আজ্ঞানুবর্তী দাস। উপরন্তু নবী-ওলীর ইচ্ছানুযায়ী কেউ জান্নাত জাহান্নাম যাবে না। বরং আল্লাহ যাকে চাইবেন তাকে জান্নাতে এবং যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তিনি ছাড়া এ এখতিয়ার তো কারো নেই। *(তাঃ ঈঃ)*

হিসাব

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'শাফাআতে কুবরা'র ফলে আল্লাহ পাক সেই দীর্ঘ দিনের যন্ত্রণা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য বিচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আগমন করবেন। তাঁর নূরের ঝলকে সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। *(কুঃ ৩৯/৬৯)* সারা সৃষ্টি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়বে। কেবল হযরত মূসা ﷺ -যেহেতু আল্লাহর নূরে তূর পাহাড়ে অজ্ঞান হয়েছিলেন তাই- তখন মূর্ছিত হবেন না। অতঃপর শেষ নবী ﷺ সবার আগে জ্ঞান ফিরে পাবেন। *(বুঃ২৪১১, মুঃ ২৩৭৩)*

অতঃপর শুরু হবে হিসাব-নিকাশ। আল্লাহ জাল্লা শানুহ অন্তরাল ও দুভাষী বিনা প্রত্যেক মানব-দানবের প্রত্যেক কৃতকর্মের সূক্ষ্ম হিসাব নেবেন। তিনি সবকিছুই জানেন। তবুও বান্দার বিরুদ্ধে অধিক অধিক সবুত-প্রমাণাদি পেশ করে তাকে এ বিচারে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ফিরিশ্তা, আম্বিয়া, উলামা, মাটি, আকাশ, দিবারাত্রি এবং বান্দার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষী মানা হবে।

সেখানে মানুষের মিথ্যা বলা বা কিছু গোপন করার উপায় নেই। মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং হাত কথা বলবে আর পা কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। *(কুঃ ৩৬/৬৫)* তেমনি কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক সাক্ষ্য দেবে। ওরা ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন ? উত্তরে ত্বক বলবে, আল্লাহ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন---। *(কুঃ ৪১/২০-২১)*

উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। *(কুঃ ২/১৪৩)* এবং তারই হিসাব সর্বাগ্রে নেওয়া হবে।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়াবান। তাঁর ন্যায্য বিচারে কোন যুলম থাকবে না। বান্দার সমস্ত আমল হাযির করা হবে। অণু পরিমাণও নেকী বা বদীর হিসাব হবে সেদিন। *(কুঃ ২/৮১, ১৮/৪৯,৩১/১৬)* কারো পাপ অন্যের উপর চাপানো হবে না। সকলের নিকট হতে কেবলমাত্র নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। *(কুঃ ৬/১৬৪)* সেদিন বান্দা তার অণু পরিমাণ সতাসৎ কৃতকর্মও দেখতে পাবে। *(কুঃ ৯৯/৭-৮)*

সেখানে অবিচারের কোন সন্দেহ থাকবে না। আল্লাহ নিজ রহমতে অনেক নেকী ডবল তথা দশ থেকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে থাকেন। কিন্তু একটি গোনাহ একটিই থাকে। *(কুঃ ২/২৬১, ৬/১৬০,মিঃ ১৯৫৯)* আবার তওবার ফলে অনেকের গোনাহকে নেকীতে পরিবর্তন করে থাকেন। *(কুঃ ২৫/৭০)*

সেদিন বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ আল্লাহর প্রতি তার ঈমান ছিল কি না ? সে কার ইবাদত করেছিল ? আম্বিয়ার আহবানে সাড়া দিয়েছিল কিনা ? দুনিয়াতে কি আমল করেছিল ? *(কুঃ ১৫/৯২,২৬/৯২)*

তার আয়ু, যৌবন, কিভাবে কোথায় বিনষ্ট করেছে? সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে ? ইল্‌ম অনুযায়ী কি আমল করেছে ? *(সঃ জাঃ ৭১৭৬)*

আল্লাহর প্রত্যেক নেয়ামত ঃ আগুন, পানি খাদ্য ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যবহার ও তার উপর কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। *(কুঃ ১০২/৮)* অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে (পালন করেছে কি না?) *(কুঃ ১৭/৩৪)* কর্ণ চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কেও (কোথায় ও কি কাজে ব্যবহার করেছে?) প্রশ্ন করা হবে। *(কুঃ ১৭/৩৬)*

ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্নের ফলেই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ ধনী শ্রেণীর মানুষের পাঁচশত অথবা চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(মুঃ ২৯৭৯, আঃ দাঃ ৩৬৬৬, তিঃ ২৩৫৪, ইঃ মাঃ ৪১২২)*

কোন বিষয়ের হিসাব সর্বাগ্রে নেওয়া হবে ?

আল্লাহর হকুকের (অধিকারের) সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। *(সঃ জাঃ ২০২০)* মানুষের হকুকের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাব হবে খুনের। *(বুঃ ৬৫৩৩)* আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হবে সুস্বাস্থ্য ও ঠান্ডা পানি সম্পর্কে। *(সঃজাঃ ২০২২)*

সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে লোক প্রদর্শন ও নাম কেনার উদ্দেশ্যে শহীদ, আলেম, হাফেয বা ক্বারী এবং দাতা ব্যক্তির। যাদের প্রত্যেককেই মুখ ছেঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে! *(মুঃ, সঃজাঃ ২০১৪)*

মানুষের আমল অনুপাতে হিসাব কঠিন ও সহজ হবে। যাকে অধিক জেরা করা হবে সে ধ্বংস হবে। *(বুঃ ৬৫৩৬)* উম্মতে মুহাম্মাদিয়া থেকে সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশ করবে। *(বুঃ ৬৫৭২)* মুমিনের হিসাব নির্জনে এবং কাফেরের জন সমক্ষে নেওয়া হবে।

সেদিন মানুষ কেরামান কাতেবীনের তৈরীকৃত আমলনামা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। সেদিন প্রত্যেককে বলা হবে, 'তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।' *(কুঃ ১৭/১৩-১৪)*

মুমিন ও নেককার বান্দার আমলনামা তার সম্মুখ হতে ডান হাতে দেওয়া হবে এবং তার হিসাব অতি সহজতরভাবে নেওয়া হবে। *(কুঃ ৮৪/৭-৯)* তখন আনন্দে উচ্চস্বরে তার আমলনামা সকলকে পড়তে বলবে *(কুঃ ৬৯/১৯)* এবং সে জান্নাতবাসী হবে।

কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের আমলনামা পশ্চাৎ হতে তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তখন তারা 'হায় হায়' করে সর্বনাশের ডাক দেবে। *(কুঃ ৪৮/১১)* আর তাদের হায়-পস্তানির সীমা থাকবে না। বলবে 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হত এবং আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত। আমার ধন-সম্পদ কোন কাজেই এল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।' *(কুঃ ৬৯/২৫-২৯)* আর সে দোযখবাসী হবে।

পৃথিবীতে মানুষ অপরাধ করে বেঁচে গেলেও কিয়ামতে তার হিসাব ও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। যুলম করে কেউ কাউকে চাবুক মেরে থাকলে সেদিন তাকে চাবুক মেরে প্রতিশোধ আদায় করা হবে। *(সঃজাঃ ৬২৫০)* কেউ কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকলে তারও 'হদ্দ্' সেদিন কায়েম করা হবে। *(মুঃ)*

পরনিন্দা-পরচর্চা-চুগলী ইত্যাদি অপরাধের প্রতিশোধও বান্দাকে দেওয়া হবে।

সেদিন সকলের পুঁজি হবে নেকী। অপরাধের বদলে অপরাধীর নেকী নিয়ে যার প্রতি অপরাধ করেছে তাকে দেওয়া হবে। অপরাধীর যদি কোন নেকীই না থাকে তাহলে যার প্রতি অপরাধ করেছে তার গোনাহ নিয়ে অপরাধীর উপর চাপিয়ে অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। *(বুঃ ২৪৪৯, মুঃ ২৫৮১)*

অত্যাচার, যুলুম, উৎপীড়ন কিয়ামতের অন্ধকার। প্রকৃত গরীব সেই যার কাছে সেদিনের জন্য কোন নেকীর সম্পদ নেই। সুক্ষ্ম ও ন্যায্য প্রতিশোধ আদায় করা হবে সেদিন। এমনকি যাদের নেকী-বদী নেই এমন পশুদের মাঝেও প্রতিশোধ আদায় করা হবে। *(মুঃ ২৫৮২, মুঃ আঃ ১/৭২)* আর মুমিনদের আপোষের প্রতিশোধ পুলসিরাত পার হওয়ার পর জান্নাত প্রবেশের পূর্ব মূহুর্তে আদায় করা হবে। *(বুঃ ৬৫৩৫)*

যারা প্রকৃতই ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানেনি, শুনেনি তাদের কাছে এবং কাফেরদের নাবালক শিশু সন্তান এবং পাগলদের কাছে সেদিন আল্লাহর আনুগত্যের উপর এক পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাতে যারা উত্তীর্ণ হবে তারা জান্নাতবাসী এবং অবশিষ্ট দোযখবাসী হবে। *(তইঃ কাঃ ৩/২৯-৩২)*

আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন তাঁর রসূল খলীল ﷺ-কে হওয (অমৃত-হ্রদ) এবং কওসর (অমৃত-নদী) দান করবেন। *(কু ১০৮/১)* সুবৃহৎ হওয ও কওসর নহর থাকবে জান্নাতী শারাবে পরিপূর্ণ। যে পবিত্র শারাব বা পানীয় দুগ্ধ হতেও সাদা, বরফ হতেও শীতল, মধু হতেও মিষ্ট এবং মিস্‌ক চেয়েও সুগন্ধময়। ([18])

অতি প্রশস্ত সে হওয, যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান। এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত একমাসের পথ, যার তীরে স্বর্ণ ও মণিমুক্তার বৃক্ষ উদ্ভূত হবে। *(মুঃ ২২৯২)* যার পানপাত্র আকাশের তারকারাজির মত অসংখ্য হবে। *(বুঃ ৭৪৩৯, তিঃ ২৪৪২)*

সেদিন প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হওয হবে। কিন্তু শেষ নবী ﷺ-এর হওয সবার চেয়ে বড়, অধিক সুমিষ্ট পানিবিশিষ্ট এবং তা থেকে পানকারী অধিক হবে। যে একবার সে পানি পান করবে তাকে আর কোনদিন পিপাসা স্পর্শ করবে না। *(বুঃ ৬৫৭৯)*

মুমিন উম্মতিগণ সেদিন সেই পানি পান করতে পাবে। বিদআতীগণকে সেখান থেকে বিদূরিত করা হবে। *(বুঃ ৬৫৭৬, মুঃ ২২৯৫)* সেই হওয পূর্ব থেকেই প্রস্তুত রাখা আছে।

হিসাবের পর মানুষের আমল ওজন করা হবে। আমলের পরিমাণ অনুযায়ী জান্নাতে মুমিনের দর্জা এবং জাহান্নামে কাফেরদের দর্জা বা স্থান নির্ধারিত হবে। *(কুঃ ২১/৪৭, ২৩/১০৩-১০৪)*

আমল ওজন করার যন্ত্র 'মীযান' বা দাঁড়িপাল্লা। যার দুটি পাল্লা ও কাঁটা হবে। *(ফঃ বাঃ ১৩/৫৩৮)* পাপ ও পুণ্যকে কোন বস্তুর রূপ দিয়ে (অথবা না দিয়েই) ওজন করা হবে,

---

([18]) *উক্ত গুণের শারাব ইহকালে পানযোগ্য না হলেও পরকালে তা বাঞ্ছিত পেয়।*

যেমন সূরা বাকারাহ ও আলে ইমরান মেঘ কিংবা একপ্রকার পাখীর রূপে বান্দার জন্য মুক্তির সুপারিশ করবে। *(মুঃ ৮০৪)*

সচ্চরিত্রতা মীযানে সর্বাধিক ভারী হবে। মানুষকেও ওজন করা হবে। তার ঈমান অনুযায়ী সে হাল্কা অথবা ভারী হবে। স্থুলদেহ ভারী মানুষ হলেও যদি তার ঈমান না থাকে, তাহলে মশার ডানা বরাবরও তার ওজন হবে না। *(বুঃ ৪৭২৯, মুঃ ২৭৮৫)*

আমলনামাও ওজন করা হবে। কালেমা তাওহীদের একটি কার্ডের ওজন বড় বড় রেজিষ্টার থেকেও বেশী হবে। *(তিঃ ২৬৩৯, মুঃ আঃ ২/২১৩, সিঃ সঃ ১৩৫)*

হিসাব-নিকাশ শেষ হলে প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ মা'বুদের অনুসরণ করতে আদেশ করা হবে। তখন যারা আল্লাহ ছাড়া যার পূজা বা ইবাদত করত তারা তার অনুসরণ করবে এবং (ফিরিশ্তা ও সালেহীন যাঁদেরকে তাঁদের অজান্তে ও অসম্মতিতে পূজা হয়েছে তাঁরা ব্যতীত) তাদের মা'বুদসহ সকলে জাহান্নামে নিপতিত হবে। *(কুঃ ৩৭/২৩)*

এরপর কেবল মুমিনগণ অবশিষ্ট থাকবে এবং তাদের সহিত মুনাফিকরাও থাকবে। কারণ, দুনিয়াতে বাহ্যতঃ তারা তাদেরই দলে থাকত। অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাদের নিকট আগত হবেন এবং বলবেন, 'তোমরা কার অপেক্ষা করছ?' তারা বলবে 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষা করছি।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা জঙ্ঘা (পদনালী) উন্মোচন করবেন। তারা তা দেখে তাঁকে চিনে ফেলবে এবং তৎক্ষণাৎ সকলেই সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু মুনাফিকরা সিজদা করতে অক্ষম হবে। *(বুঃ ৪৯১৯)* যেহেতু তারা দুনিয়াতে লোকপ্রদর্শনের জন্য নামায পড়ত, তাই তাদের পৃষ্ঠদেশ পাটার ন্যায় হলে ঐ সময় তারা পিছন দিকে উল্টে পড়ে যাবে। তদনন্তর মুমিনগণ আল্লাহপাকের অনুসরণ করবে *(বুঃ ৭৪৩৯, মুঃ ১৮৩)* এবং পুলসিরাতের দিকে অগ্রসর হবে।

পুল-সিরাত

পুল-সিরাত জাহান্নামের উপর স্থাপিত এক সেতু। যা চুল থেকেও সুক্ষ্ম, তরবারি অপেক্ষাও ধারালো এবং পিচ্ছিল; জান্নাত যাবার তমসাচ্ছন্ন এক পথ। যাতে যুক্ত আছে বিভিন্ন কাঁটা ও আঁকুশি। *(বুঃ ৭৪৩৯, মুঃ ১৮৩)* জান্নাতের পথে এই পুল কেবল মাত্র মুমিনের জন্য স্থাপিত হবে। তাদের অগ্রভাগে নূরে চমকিত হবে। কারো আলো জোরাল হবে আবার কারো নিভুনিভু। অতঃপর তারা সেই পুল অতিক্রম করবে। সর্বপ্রথম আমাদের মহানবী ﷺ অতিক্রম করবেন। তাঁর পর অন্যান্য আম্বিয়া ও মুমিনগণ পার হবেন। মুমিনদের কেউ বিদ্যুতের মত, কেউ ঝড়ের মত, কেউ দৌড়ে, কেউ চলে, কারো পা পিছলে গেলে হাতে ধরে, হাত পিছলে গেলে পুনরায় পায়ে চলে সেতু অতিক্রম করবে এবং সকলে জান্নাত প্রবেশ করবে। সমস্ত উম্মতের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া প্রথমে পার হবে। *(বুঃ ৭৪৩৯)*

মুনাফিকদের সাথে কোন নূর বা আলো থাকবে না। তারা মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের কিছু আলো পাই।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলো সন্ধান কর।'

অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি একটি প্রাচীর স্থাপিত হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরভাগে রহমত (আশিস) এবং বহির্ভাগে থাকবে আযাব (শাস্তি)।

মুনাফিকরা মুমিনদের ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'ছিলে তো, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা আমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে। মোহ তোমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুহকাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আল্লাহ সম্পর্কে মহাপ্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটিই তোমাদের যোগ্য বাসস্থান, কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম। *(কুঃ ৫৭/১৩-১৫)* তদনন্তর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। *(মুঃ ১৮৩, হাঃ ২/৩৭৬, শঃ তাঃ ৪৭০)*

গোনাহগার তাওহীদবাদী মুসলিমগণও পাপের পরিমাণ মুতাবেক কিছু কালের জন্য পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর কিছু সুপারিশের ফলে, কিছু আল্লাহর রহমতে এবং কিছু সম্পূর্ণ শাস্তিভোগে (মরে যাওয়ার পর মৃতসঞ্জীবনী পানির নদীতে চুবিয়ে জীবন দান করে) পুনরায় তাদেরকে নতুন রূপ দিয়ে জান্নাতে স্থান দেওয়া হবে। যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে তাদেরকে কিছুকাল পরেও জান্নাতে স্থান দেওয়া হবে।

সৃষ্ট সমগ্র মানব জাতির প্রতি হাজারের একটি মাত্র জান্নাতবাসী এবং বাকী নয় শত নিরানব্বইটি জাহান্নামী হবে। জান্নাতীদের অর্ধভাগ উম্মতে মুহাম্মাদিয়া হবে। অথচ উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সমস্ত মানুষের তুলনায় একটি শুভ্র বলদের চর্মের একটি মাত্র কৃষ্ণ লোমের মত। *(বুঃ ৬৫২৮)*

অন্য বর্ণনা অনুসারে, একশত বিশ কাতার জান্নাতীর আশি কাতার উম্মতে মুহাম্মাদিয়া হবে এবং চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মত থেকে। *(তিঃ ২৫৪৬)*

মুমিনদের আপোষের প্রতিশোধ পুলসিরাত পার হওয়ার পর জান্নাত প্রবেশের পূর্ব মূহুর্তে (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে কান্তারায়) আদায় করা হবে। *(বুঃ ৬৫৩৫)*

জান্নাত

জান্নাত পরকালের সেই সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরা বাসস্থানের নাম যা আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন-মুত্তাকী ও নেককার বান্দার জন্য পূর্ব থেকেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। বান্দা দুনিয়ায় নেক আমল করে এবং হারাম ও নাফরমানী পরিত্যাগ করে আখেরাতে ঐ বাসস্থান লাভ করবে। *(কুঃ ২/৮২, ৩/১৩৩, ৪৩/৭২, ১৯/৬৩)*

জান্নাত এমন সৌন্দর্যময় বাসস্থান যা কোনদিন কোন চক্ষু দর্শন করেনি, যার কথা কোন কর্ণও শ্রবণ করেনি এবং কারো ধারণায়ও আসেনি। 'যত তুমি ভাবতে পারো, তার চেয়ে সে অনেক আরো' সৌন্দর্য ও শ্রীতে ভরা। কারো কল্পনা ও খেয়ালে সে সৌন্দর্য কোন দিন অঙ্কিত হয়নি এবং হবেও না। *(কুঃ ৩২/১৭, মুঃ ২৮২৪, বুঃ ৭৪৯৮)*

তার সৌধ মহল, সোনা-চাঁদি, হুর-গেলমান, নহর, বৃক্ষ, ফলমূল ইত্যাদিও কল্পনাতীত। নাম এক হলেও দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে জান্নাতের কোন জিনিসের কোন মিল নেই, কোন তুলনাই নেই। *(কুঃ ২/২৫, তঃ ই কাঃ ১/৬২-৬৩)*

আটটি জান্নাত ঃ- ফেরদাউস, আদ্‌ন, খুলদ, নায়ীম, মা'ওয়া, দারুস সালাম, দারুল মুকামা এবং রাইয়ান। তাতেও বিভিন্ন স্তর আছে। আমল অনুযায়ী সকলের স্থান নির্ধারিত হবে। জান্নাতের প্রধান প্রবেশ দ্বার ঐ আটটি। নির্দিষ্ট আমল অনুপাতে

প্রত্যেকে নির্দিষ্ট দুয়ারে প্রবেশ করবে। *(বুঃ ৩২৫৭)*

জান্নাতের মাটি জাফরান। তার নিম্নদেশে চারটি নহর প্রবাহিত। নির্মল পানির নহর, দুগ্ধের নহর; যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, সুস্বাদু সুধার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। *(কুঃ ৪৭/১৫)* জান্নাতের পানি, দুধ, শারাব, মধু প্রভৃতি দুনিয়ার মত নয়। এসব কিছুরই স্বাদ ভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়, বিনষ্ট হয় না, শারাবে জ্ঞান শূন্য হয় না, কোন শিরঃপীড়ায় ধরে না। *(কুঃ ৫৬/১৯)*

জান্নাতে বিভিন্ন সৌন্দর্যখচিত হিরন্ময় মহল ও কক্ষ, বহুতল বিশিষ্ট সু-উচ্চ প্রাসাদ আছে। *(কুঃ ৩৯/২০)* পাশাপাশি একটি সোনার ও অপরটি চাঁদির ইঁট এবং মধ্যখানে সংযোজক মিস্ক দ্বারা নির্মিত। *(তিঃ ২৫২৬, মুঃ আঃ ২/৩০৫)*

জান্নাতে একটি মুক্তানির্মিত তাঁবু আছে। যার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। *(মুঃ ২৮৩৮)* জান্নাতে রয়েছে হেলান দিয়ে উপবেশনের জন্য রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু ফরাশ। *(কুঃ ৫৫/৫৪)* স্বর্ণখচিত আসন, *(কুঃ ৫৬/১৫)* উন্নত মর্যাদা-সম্পন্ন শয্যা রয়েছে শয়নের জন্য এবং রয়েছে সারি সারি উপাধান, বিছানা, গালিচা। *(কুঃ ৮৮/১৩-১৬)*

সেখানে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে সোনার থালা ও পান-পাত্রে। *(কুঃ ৪৩/৭১)* রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র। *(কুঃ৭৬/১৫)*

বেহেশ্তের খাবার পর্যাপ্ত পছন্দমত ফল-মূল, ইপ্সিত পাখির মাংস। *(কুঃ ৫৬/২০-২১)*

সেখানে প্রত্যেক ফল দু'-প্রকার থাকবে। *(কুঃ ৫৫/৫২)* রকমারি ফলের বৃক্ষে ফল ঝুলে থাকবে। *(কুঃ ৫৫/৫৪)* যা সম্পূর্ণরূপে জান্নাতীদের আয়ত্তাধীন করা হবে। *(কুঃ ৬৯/২৩, ৭৬/১৪)* জান্নাতীগণ বসে বা শয়ন করেও ফল তুলে খেতে পারবে। জান্নাতের সর্বপ্রথম আতিথ্য হবে একপ্রকার মাছের কলিজা দ্বারা। *(বুঃ ৩৩২৯, মুঃ ৩১৫)* জান্নাতীরা ইচ্ছামত খাবে ও পান করবে; কিন্তু মলমূত্র হবে না। সব কিছু হজমে গন্ধহীন হাওয়া হয়ে ঢেকুরের সাথে অথবা কস্তুরীর মত সুগন্ধময় ঘাম হয়ে নির্গত হয়ে যাবে। *(মুঃ ২৮৩৫)*

জান্নাতের উদ্যান ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ। *(কুঃ ৫৬/৪৮)* সেখানে থাকবে কন্টকহীন বদরীবৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা ও সম্প্রসারিত ছায়া। *(কু ৫৬/২৮-৩০)*

জান্নাতে এমন এক সুবৃহৎ বৃক্ষ আছে যার নিচে আরোহী একশত বৎসর চললেও তার ছায়ার সমাপ্তি হবে না। *(বুঃ ৬৫৫২, মুঃ ২৮২৭)* জান্নাতের প্রস্থ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমান। *(কুঃ ৩/১৩৩)* সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতীকে পৃথিবীর দশগুণ পরিমাণ স্থান দেওয়া হবে। *(মুঃ ১৮৬)*

জান্নাতে তার বাসিন্দাদেরকে স্বর্ণকঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। *(কুঃ ২২/২৩)* তাদের বসন হবে সুক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম। তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কনে। *(কুঃ ৭৬/২১)*

সেখানে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে পবিত্রা সঙ্গিনী। *(কুঃ ২/২৫)* বেহেশ্তী পত্নী, হুর বা অপ্সরা। তাঁদের সহিত জান্নাতীদের বিবাহ হবে। *(কুঃ ৪৪/৫৪,৫২/২০)* (অতএব তাদেরকে স্বর্গ-বেশ্যা বা স্বর্গীয় বারাঙ্গনা বলা বেজায় ভুল)। তারা একই স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তারা দুশ্চরিত্রা, কুলটা বা ভ্রষ্টা নয়।

প্রতি জান্নাতী স্বীয় আমল অনুযায়ী দুই বা ততোধিক বেহেশ্তী স্ত্রী পাবে। সপত্নী (সতীন)দের মাঝে আপোষের কোন ঈর্ষা ও কলহ থাকবে না। *(কুঃ ৭/৪৩, ১৫/৪৭)* পার্থিব স্ত্রীর রূপ-গুণ বেহেশ্তী স্ত্রীদের তুলনায় অধিক হবে। হুরগণ তাদের পার্থিব সপত্নীর খিদমত করবে। অবিবাহিতা নারী এবং যার স্বামী দোযখবাসী হবে তাদের ইচ্ছামত

জান্নাতী কোন পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যে নারীর একাধিক বার একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ হয়েছিল তারা সকলেই জান্নাতে গেলে তার পছন্দমত একজন স্বামীর সহিত বাস করবে। নচেৎ শেষ স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকবে। *(সঃজাঃ ৬৬৯১)*

সকল স্ত্রীগণই সদা পবিত্রা থাকবে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের স্রাব, মল, কফ, থুথু, ঋতু ইত্যাদি কিছু থাকবে না। *(বুঃ ৩৩২৭, মুঃ ২৮৩৫)* স্বামী সহবাসেও চিরকুমারী এবং অনন্ত যৌবনা থাকবে। বীর্যপাত বা কোন অপবিত্রতাও থাকবে না। কেউ কোনদিন গর্ভবতীও হবে না। অবশ্য কোন জান্নাতীর শখ হলে তার ইচ্ছামত ক্ষণেকে তার স্ত্রী গর্ভবতী হবে এবং সন্তান প্রসব করবে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হবে। *(তিঃ ২৫৬৩, মুঃ ৩/৮০ দাঃ)*

বেহেশ্তী হুর। লজ্জা-নম্র, আয়তলোচনা তন্বীগণ -সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। *(কুঃ ৩৭/৪৮-৪৯)* সে আয়ত নয়না তরুনীগণ -যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। প্রবাল ও পদ্মরাগ-সদৃশ এ সকল তরুণীদের স্বচ্ছ কাচ সদৃশ দেহকান্তি। *(কুঃ ৫৫/৫৬,৫৮)* বাহির হতে তাদের অস্থি-মধ্যস্থিত মজ্জা পরিদৃষ্ট হবে। *(মুঃ ২৮৩৪)*

সম্ভ্রান্তা শয্যাসঙ্গিনী, যাদেরকে আল্লাহপাক জান্নাতীদিগের জন্য বিষেশরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারা চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। *(কুঃ ৫৬/৩৪-৩৭)* এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা তরুণী। *(কুঃ ৭৭/৩৩)* সেই বেহেশ্তবাসিনী, রূপের ডালি, ঝলমলে লাবণ্যময়ী, সুবাসিনী কোন তরুণী যদি পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন আকাশে উঁকি মারে, তাহলে তার রূপালোকে ও সৌরভে সারা জগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। অনন্ত যৌবনা - এমন সুরমার কেবলমাত্র শীর্ষস্থিত উত্তরীয় খানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সব কিছু হতে উত্তম ও মূল্যবান। *(বুঃ ৬৫৬৮)*

জান্নাতী জীবন এক চিরস্থায়ী বিলাসরাজ্য। যেখানে কোন দুঃখ-দুর্দশা নেই। ([19]) কোন দুশ্চিন্তা, ক্লেস ও ক্লান্তির স্পর্শ নেই। *(কুঃ ৪৪/৫৬)* চিরসুখ ও আনন্দোপভোগের স্থান জান্নাত। সেখানে আর মৃত্যু নেই। সেখানে নিদ্রাও নেই। *(সিঃসঃ ১০৮৭)* সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ মুমিন তার সঙ্গিনীদের সহিত তথায় ইচ্ছাসুখে অফুরন্ত মহানন্দে অনন্তকাল বাস করবে।

জান্নাতীদের দেহ হবে আদি পিতা হযরত আদম ﷺ-এর সমতুল্য ষাট হাত দীর্ঘ। *(বুঃ ৩৩২৬, মুঃ ২৮৪১)* শোভনীয় লোম ছাড়া দেহে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় লোম এবং শ্মশ্রু থাকবে না। চক্ষু হবে সুর্মাবরন। বয়স হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ। *(তিঃ ২৫৪৫)* অনন্তকাল ধরে তারা এই বয়স নিয়েই চির সুন্দর যুবক হয়ে থাকবে। *(মুঃ ২৮৩৬)* সেখানে যৌন-মিলনে অধিক তৃপ্তিলাভ করবে। প্রত্যেক জান্নাতীকে একশ জন পুরুষের সমান যৌন-শক্তি ও সঙ্গম ক্ষমতা প্রদান করা হবে। *(তিঃ ২৫৩৬)*

যেহেতু পান-ভোজন, বসনভূষণ, বাসভবন এবং নারী-সংসর্গ ও যৌন-সম্ভোগ ইত্যাদিতে মানুষের প্রকৃতিগত সুখ ও পরম আনন্দ, তাই তাদেরকে তাদের প্রকৃতি মত অভীষ্ট প্রতিদান দেওয়া হবে।

সেখানে কোন কর্মব্যস্ততা কিংবা কোন পালনীয় ইবাদত-বন্দেগী থাকবে না। শ্বাসক্রিয়ার ন্যায় সদা তসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) তাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হবে। তাদের পরষ্পরের অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম। শান্তিবাক্য ছাড়া তারা কোন অসন্তোষজনক বা অসার বাক্য শুনবে না। *(কুঃ ১০/১০, ৫৬/১৪-২৬, মিঃ ৫৬২০)*

([19]) *অবশ্য নেক আমল ত্যাগ করার জন্য অনেকের পরিতাপ হবে।*

সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ চির কিশোর (গেলমান)রা স্বর্ণনির্মিত পান পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা এবং বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর পাত্র নিয়ে জান্নাতীদের সেবায় সদা নিয়োজিত থাকবে। *(কুঃ ৫৬/১৭। ৪৩/৭১, ৭৬/১৯, ৫২/২৪)*

জান্নাতীগণ তো এমনিতেই শোভা সৌন্দর্য ও সৌরভের রাজা। তা সত্ত্বেও যখন তারা জান্নাতের বাজারে প্রতি শুক্রবার বিহারে (ভ্রমণে) যাবে, তখন এক প্রকার সুবাসিত উত্তরী বাতাস চলবে। যাতে তাদের মুখমন্ডল ও পোশাকাদি সুরভিত হয়ে উঠবে এবং তাদের অধিক সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি হবে। অতঃপর তারা যখন স্ব-স্ব বাসস্থানে স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসবে তখন দেখবে তাদেরও অধিক রূপ ও লাবণ্য বৃদ্ধি হয়েছে। *(মুঃ ২৮৩৩)*

মোট কথা, মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাত আল্লাহর তরফ থেকে এক অমূল্য উপহার ও যোগ্য প্রতিদান। এ তাদের কর্মের ফল। সেখানকার সব কিছুই ভোগ-বিলাস ও অতুল সুখ-সম্ভোগের উপকরণ। সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় সমস্ত কিছু। সেখানে কারো কোন বস্তুর উপর আশা, আকাঙ্খা, বা অভিপ্রায় অপূর্ণ থাকবে না। *(কুঃ ৪৩/৭১, ৭৬/২০, ৪১/৩১, বুঃ ৭৫১৯, মিঃ ৫৬৪৮)*

কিন্তু এ সমস্ত সম্পদ অপেক্ষাও এক বৃহত্তর সম্পদ রয়েছে বেহেস্তীদের জন্য; মহান প্রতিপালক রব্বুল ইযযাত অল-জালালের চেহারা করীম দর্শনের তৃপ্তি ও সৌভাগ্যলাভ। জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ পাক জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, "আরো অধিক (উত্তম সম্পদ) এমন কিছু চাও, যা আমি তোমাদের প্রদান করব।" তারা বলবে, 'আপনি আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছেন, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন (এর চেয়ে আবার উত্তম কি চাই প্রভু?)' ইত্যবসরে (ঊর্ধ্বদিকে) জ্যোতির যবনিকা উন্মোচিত হবে। তখন জান্নাতীরা সকলে আল্লাহর চেহারার প্রতি (নির্নিমেষ) দৃষ্টিপাত করবে। (তাতে তাদের নিকট অন্যান্য সব কিছু অবহেলিত হবে) এবং সেই দর্শন সুখই হবে জান্নাতীদের সর্বোৎকৃষ্ট মনোনীত সম্পদ। *(কুঃ ৫০/৩৫, ৭৫/২২-২৩, ১০/২৬, মুঃ আঃ ৪/৩৩২)* আর এক উত্তম সম্পদ যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর চির সন্তুষ্ট হবেন। কোন কালে আর অসন্তুষ্ট হবেন না। *(মুঃ ২৮২৯)*

সেথায় শান্তির সমাজে শান্তির বাস। ফিরিশ্তাগণ জান্নাতে জান্নাতীদের সহিত সাক্ষাত ও সংলাপ করতে আসবেন। বলবেন, তোমরা কষ্ট বরণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। এ পরিণাম কত ভালো! *(কুঃ ১৩/২৩-২৪)*

জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী হবে দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। *(মুঃ ২৮৪৬)*

আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও ওস্তাযগণকে সেই অনাবিল শান্তিরাজ্যের অধিবাসী করুন। আমীন।

জাহান্নাম পরকালের এক নিকৃষ্টতম বাসস্থান। যা আল্লাহপাক ধর্মদ্রোহী, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী। অবিশ্বাসী, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক এবং পাপীদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেখানে তারা স্ব-স্ব কৃতকর্মের শাস্তিমূলক প্রতিফল ভোগ করবে।

জাহান্নাম পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নীচে অবস্থিত। কিয়ামতের দিন তা উপস্থিত করা হবে। *(কুঃ ৮৯/২৩)* সেদিন তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতি লাগামে সত্তর

হাজার ফিরিশ্তা ধারণ করে আকর্ষণ পূর্বক আনীত হবে। *(মুঃ ২৮৪২)*

দোযখে সাতটি বিভাগ ঃ জাহান্নাম, জাহীম, সায়ীর, সাকার, হুতামাহ, হাবিয়াহ ও লাযা। সাধারণভাবে সবগুলিকেই জাহান্নাম বলা হয়।

দোযখের গভীরতা সত্তর বছরের পথ। *(মুঃ ২৮৪৪)* জাহান্নাম ও তার সবকিছু কৃষ্ণাকার, জাহান্নামবাসীরাও বীভৎস কৃষ্ণকায়। ওদের মুখমন্ডল যেন অন্ধকার নিশীথের আস্তরণে আচ্ছাদিত। *(কুঃ ১০/২৭)*

জাহান্নামের অগ্নি পার্থিব অগ্নি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার দাহিকা শক্তি ও উষ্ণতা এ অগ্নির চেয়ে সত্তর গুণ বেশী। *(বুঃ ৩২৬৫, মুঃ ২৮৪৩)*

প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ড! কি ভয়ঙ্কর তার লেলিহান শিখা। যখনই তা স্তিমিত হবে, তখনই অধিক অগ্নি বৃদ্ধি করা হবে। *(কুঃ ১৭/৯৭)* দূর হতে যার ভীষণ ক্রুদ্ধনিনাদ ও ভয়াল গর্জন শোনা যাবে। *(কুঃ ২৫/১২)* যে জ্বালাময় হুতাশনের ইন্ধন হবে (কাফের) মানুষ, (বারুদ জাতীয়) প্রস্তর, বাতিল মা'বুদ (যাঁরা তাদের ইচ্ছা ও খবর ছাড়াই পূজিত হন তাঁরা ব্যতীত) *(কুঃ ২১/৯৮)* এবং কাফের জিন। *(কুঃ ৭২/১৫)*

যার নিয়ন্ত্রণ-ভার অর্পিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশ্তাগণের উপর। *(কুঃ ২/২৪, ৬৬/৬)*

পার্থিব জীবনে কাফেররা সাধারণতঃ শীতল বায়ু, ছায়া এবং শীতল পানীয় দ্বারা বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পুনরুত্থান বা পরকালকে অবিশ্বাস করে অনমনীয়ভাবে ঘোরতর পাপে লিপ্ত থাকে। তাই সেদিন তার প্রতিফল স্বরূপ জাহান্নাম হতে সেবন করবে- অত্যুষ্ণ বায়ু, পান করবে উত্তপ্ত পানি এবং অবস্থান করবে (জাহান্নামের) কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়। *(কুঃ ৫৬/৪২-৪৭)*

জাহান্নামীদের খাদ্য ঃ

১। যন্ত্রণাদায়ক যাক্কুম বৃক্ষ ঃ এ বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশে উদ্‌গত হয়। এর গুচ্ছ শয়তানের মাথার মত। সীমালঙ্ঘনকারীরা তা ভক্ষণ করে উদরপূর্ণ করবে এবং (কণ্ঠে আটকে গেলে) তার সঙ্গে ফুটন্ত পানি তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় পান করবে। এটিই হবে জাহান্নামীদের আপ্যায়ন। *(কুঃ ৩৭/৬২-৬৭, ৫৬/৫২-৫৬)* যাক্কুম উদরে গিয়ে ফুটন্ত পানি ও গলিত তাম্রের মত ফুটতে থাকবে। আবার তার উপরেও তাদের মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। *(কুঃ ৪৪/৪৩-৪৮)* ঐ যাক্কুমের সামান্য পরিমাণ যদি জাহান্নাম হতে পৃথিবীতে আসে তবে পৃথিবীর খাদ্য ও পানীয় তার বিষাক্ততায় বিনষ্ট হয়ে যাবে। *(তিঃ ২৫৮৫)*

২। যারী' ঃ এক প্রকার কন্টকময় বিষাক্ত গুল্ম। যা জাহান্নামীরা ভক্ষণ করবে। যাতে তারা পুষ্টও হবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবে না। *(কুঃ ৮৮/৬-৭)*

৩। গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য। *(কুঃ ৭৩/১৩)*

৫। গিসলীন ঃ জাহান্নামীদের ক্ষতনিঃসৃত স্রাব। *(কুঃ ৬৯/৩৬)*

জাহান্নামীদের পানীয় ঃ

১। হামীম ঃ অত্যুষ্ণ ফুটন্ত পানি। *(কুঃ ৫৬/৫৪-৯৩)* যা পান করলে জাহান্নামীদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। *(কুঃ ৪৭/১৫)*

২। গাস্‌সাক ঃ অতিশয় দুর্গন্ধময় তিক্ত অথবা নিরতিশয় শীতল পানীয়। *(কুঃ ৩৮/৫৭, ৭৮/২৫)*

৩। সাদীদ ঃ জাহান্নামীদের পচনশীল ক্ষত-নির্গত পুঁজ-রক্ত বা ঘাম; যা তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। তারা অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। (তখন) সব দিক তেকে তাদের নিকট মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে, কিন্তু

মৃত্যু তাদের ঘটবে না। আর তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। *(কুঃ ১৪/১৬-১৭)*
৪। গলিত ধাতু অথবা তৈলকিট্টের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় ও দুর্গন্ধময় পানীয় ঃ যখন জাহান্নামীরা পানি চাইবে তখন এই পানীয় তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। যা ওদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কি ভীষণ সে পানীয়, আর কি নিকৃষ্ট তাদের অগ্নিময় আরামের স্থান! *(কুঃ ১৮/২৯)*

জাহান্নামীদের পোষাক হবে আলকাতরা, *(কুঃ ১৪/৫০)* লোহা এবং আগুনের। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, যাতে ওদের চামড়া এবং ওদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে। আর ওদের জন্য থাকবে লৌহ-মুদগর বা সাঁড়াশি। যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে আবার ওখানেই ফিরিয়ে দিয়ে বলা হবে, 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা!' *(কুঃ ২২/১৯-২২)*

জাহান্নামীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ঃ

শৃঙ্খল। *(কুঃ ৭৬/৪)* যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত। *(কুঃ ৬৯/৩২)* এবং ওদের গলদেশে বেড়ি পরানো হবে। *(কুঃ ৩৪/৩৩)* আর ওদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে পদবেড়িও। *(কুঃ ৭৩/১২)*

অধিক ও চিরস্থায়ী শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য যখনই অগ্নিদাহে তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই ওর স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করা হবে। *(কুঃ ৪/৫৬)*

তেমনি তাদের দেহের স্থূলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। একজন কাফেরের দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী অংশ দ্রুতগামী আরোহীর তিন দিনের পথ-সম দীর্ঘ হবে! একটি দাঁত উহুদ পর্বতসম এবং তার চর্মের স্থূলতা হবে তিনদিনের পথ! *(মুঃ ২৮৫১, ২৮৫২)* অথবা বিয়াল্লিশ হাত। আর জাহান্নামে তার অবস্থান ক্ষেত্র হবে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থান বরাবর। (অর্থাৎ ৪২৫ কিমিঃ।) *(তিঃ ২৫৭৭, মুঃ আঃ ২/২৬)* এসব বিচিত্র হলেও আল্লাহর কাছে অবাস্তবতার কিছু নেই।

অগ্নির বেষ্টনী জাহান্নামীদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। *(কুঃ ১৮/২৯)* অগ্নিদগ্ধে ওদের মুখমন্ডল বীভৎস হয়ে যাবে। *(কুঃ ২৩/১০৪)*

জাহান্নামে উটের মত বৃহদাকার এমন সর্প আছে, যদি তা একবার কাউকে দংশন করে তবে চল্লিশ বছর তার বিষাক্ত যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকবে। খচ্চরের মত এমন বড় বড় বিছা আছে যার দংশন জ্বালা চল্লিশ বছর বর্তমান থাকবে। *(মুঃ আঃ ৪/১৯১)*

দোযখে কাফেরদেরকে উল্টা করে মুখের উপর ভর দিয়ে টানা হবে। *(কুঃ ৫৪/৪৮)* যারা কোন অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে সেই অস্ত্র নিয়েই চিরদিন নিজেকে আঘাত করতে থাকবে। যে বিষপান করে নিজের জীবননাশ করে, জাহান্নামে সে সেই বিষ চিরদিন পান করতে থাকবে। যে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামে চিরদিন ঐভাবে পড়তে থাকবে। *(বুঃ ৫৭৭৮, মুঃ ১০৯)*

কেউ কেউ নিজের নাড়িভুড়ি ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে বেড়াবে। কোন কোন কাফেরকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা সেখানে নিজেদের ধ্বংস কামনা করবে। তখন ওদের বলা হবে, 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক।' *(কুঃ ২৫/১৩-১৪)*

জাহান্নামে অনেকের তার পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গলা পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হবে। *(মুঃ ২৮৪৫)*

জাহান্নামের সবচেয়ে ছোট আযাব ঃ

জাহান্নামীকে আগুনের তৈরী একজোড়া জুতা পরানো হবে, যার তাপে মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এই আযাব নবী ﷺ-এর পিতৃব্য আবু তালেবকে দেওয়া হবে। *(মুঃ ২ ১২, মিঃ ৫৬৬৭)*

আযাবের কঠিনতায় জাহান্নামীরা ভীষণ চীৎকার ও আর্তনাদ করতে থাকবে। *(কুঃ ১১/১০৬)* কিন্তু ওরা তো স্থায়ীভাবে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে। *(কুঃ ৪৩/৭৪-৭৫)* ওদের মৃত্যুরও আদেশ দেওয়া হবে না, যে ওরা মরবে। ওরা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা আর করব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের নিকটে তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" *(কুঃ ৩৫/৩৬-৩৭)* ওরা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঘিরে ছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! এ অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী (অবিশ্বাস) করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী (যালেম) হব।' আল্লাহ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বলিস না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি) তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে (মুমিন দলকে) নিয়ে তোমরা উপহাস (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ) করতে এত বিভোর ছিলে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের (ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের)কে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে। আমি আজ তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।" *(কুঃ ২৩/১০৬-১১০)*

"ওরা অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করবে এবং চীৎকার করে বলবে, হে মালেক (দোযখের অধিকর্তা)! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন।' সে বলবে, 'তোমরা তো এভাবেই অবস্থান করবে।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছায়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্য বিমুখ ছিল।" *(কুঃ ৪৩/৭৭-৭৮)*

জাহান্নামীরা কেঁদে এত অশ্রু ঝরাবে যে, তাতে নদী প্রবাহিত হবে এবং তার উপর নৌকা চলাও সম্ভব হবে। তারা রক্তের অশ্রুও ঝরাবে। *(সজাঃ ২০৩২নং)*

গোনাহগার তাওহীবাদী মুসলিমগণ নিজ নিজ গোনাহের পরিমাণ অনুযায়ী কিছুকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। অতঃপর আল্লাহর রহমতে, এবং শাফাআতকারীর শাফাআতে তাওহীদের গুণে জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পেয়ে জান্নাতবাসী হবে। কিন্তু জাহান্নামের দাগ থেকে যাবে তাদের দেহে।

দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী। *(বুঃ ৬৫৪৬, মুঃ ৭৯)*

জাহান্নামে অধিকাংশ মানব-দানব নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে, 'আরও আছে কি?' *(কুঃ ৫০/৩০)* তখন আল্লাহ পাক নিজের কদম (পা) দোযখে রাখবেন। তখন সংকুচিত হয়ে সে বলবে, 'ব্যস, ব্যস!' *(বুঃ ৭৩৮৪, মুঃ ২৮৪৮)*

জাহান্নামীগণ জাহান্নামে এবং জান্নাতীগণ জান্নাতে যখন স্থায়ী হয়ে যাবে তখন মৃত্যুকে এক মেষের রূপে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত করে সকলের সম্মুখে হত্যা করা হবে। এক আহবানকারী ডাক দিয়ে বলবে, 'হে জান্নাতীগণ! চিরঞ্জীব রহ, চিরসুখে রহ; এরপর আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামীগণ! চিরঞ্জীব রহ, চিরদুঃখে রহ; এরপর আর কোন মৃত্যু নেই।'

তা শুনে জান্নাতবাসীদের আনন্দসাগরে অধিক উচ্ছ্বাস বর্ধিত হবে এবং জাহান্নামীদের বিষাদ-সিন্ধু অধিক তরঙ্গিত হবে। *(বুঃ ৬৫৪৪, মুঃ ২৮৪৯)*

সেই দিনই তো অবিশ্বাসী, ধর্মদ্রোহী, নাস্তিক, বিশ্বাসঘাতক, অংশীবাদী এবং কপট বেঈমানদের জন্য চির পরিতাপ, আফশোষ, হা-হুতাশ, মনস্তাপ, অনুতাপ, খেদ, বিলাপ ও নিরতিশয় আক্ষেপের দিন।

আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক জায়গার নাম। এমন কতক মানুষ যাদের নেকী-বদী সমান হলে ঐ স্থানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করবে এবং পরে আল্লাহর রহমতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই জায়গা থেকে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের অবস্থা অবলোকন করা যাবে।

এই আ'রাফবাসীদের কিছু লোক যখন জান্নাতের দিকে তাকাবে তখন (কিছু) "জান্নাতবাসীদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে সালাম জানাবে। আর তাদের অন্তরে থাকবে বেহেশ্তে প্রবেশ করার প্রবল আশা।

আবার যখন তাদের দৃষ্টি দোযখবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে (এবং দোযখের ভয়ংকর দৃশ্য ও তার অধিবাসীদের ভয়ানক অবস্থা দেখবে), তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাপীষ্ঠদের সঙ্গী করো না।'

অতঃপর তারা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে কিছু লোককে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে (এবং দুনিয়াতে যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিভবশালী এবং দলবলশালী ছিল তাদেরকে একা একা নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় শাস্তি ভোগ করতে দেখে) তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের (পার্থিব) দল (যার দ্বারা তোমরা পৃথিবীতে প্রতাপ, প্রভাব ও বিভবশালী ছিলে) এবং (সত্য ও তার অনুসারীদের প্রতি) অহংকার (এখানে) কারো কোন কাজে আসল না।'

অতঃপর কিছু জান্নাতবাসী যারা দুনিয়ায় ক্ষীণবল দরিদ্র মুমিন ছিল -যাদের নিয়ে ঐ জাহান্নামীরা উপহাস ও হাসি-ঠাট্টা করত- তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে আ'রাফবাসীরা পুনরায় ওদেরকে বলবে, 'দেখ এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা (অহংকারে) শপথ করে বলতে যে, 'আল্লাহ এদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করবেন না? (কিন্তু তাদের জন্যই তো বলা হয়েছে,) 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন (ভাবী বিপদের) আশঙ্কা নেই এবং (বিগত কোন আপদে) তোমরা দুঃখিত হবে না।" *(কুঃ ৭/৪৬-৪৯)*

বেহেশ্তী ও দোযখীদের আপোষে কথোপকথন

দুনিয়াতে মুমিনগণ কাফেরদের কাছে বহু কষ্টদায়ক কথা শুনে থাকে। উপহাস, ব্যঙ্গ এবং বিভিন্ন কটুকথায় অনেক সময় উত্তর না দিয়ে নীরবে সহ্য করে থাকে। কিন্তু কাফেররা তাতে বড় আনন্দ পায়।

প্রত্যেককে এর প্রতিফল দিবার জন্য এবং মুমিনদের মনের ক্ষোভ মিটাবার জন্য পরকালে আল্লাহ তাআলা তাদের আপোষের মধ্যে আলাপনের সুযোগ করে দিবেন। তারা একে অপরকে দেখতে পাবে এবং আপোষের কথাও শুনতে পাবে।

বেহেশ্তীগণ দোযখীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের ঈমান ও সৎকার্যের উপর) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি (জান্নাত পেয়েছি) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের (কুফরী ও অধর্মের উপর) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য পেয়েছ কি?' ওরা বলবে, 'হ্যাঁ।'

অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, পাপিষ্ঠদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং তাতে বক্রতা (ও দোষ-ত্রুটি) অন্বেষণ করেছিল এবং তারাই ছিল পরকালে অবিশ্বাসী। *(কুঃ ৭/৪৪/-৪৫)*

কতক জান্নাতবাসী কতক জাহান্নাম (সাক্বার)বাসীকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদেরকে কিসে সাক্বারে নিক্ষেপ করেছে?' ওরা উত্তরে বলবে, 'আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না, যারা অন্যায় আলোচনা করত আমরা তাদের আলোচনায় যোগ দিতাম এবং আমরা (এই) কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করেছি। *(কুঃ ৭৪/৪০-৪৭)*

জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে আমাদেরকে কিছু দাও।' জান্নাতীরা উত্তরে বলবে, 'আল্লাহ এ দুটিকে অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। *(কুঃ ৭/৫০-৫১)*

(কাল দুনিয়াতে) পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতকারীরা বিশ্বাসী (মুমিনদের) মজাক উড়াতো, (তাদের -কে নিয়ে ব্যঙ্গ হাসত এবং উপহাস করত) এবং যখন তাদের নিকট দিয়ে যেত, তখন বক্রদৃষ্টিতে চোখ-ইশারা করত। ওরা যখন ওদের আপনজনের নিকট ফিরে যেত, তখন বড় উৎফুল্ল হয়ে ফিরত। (মনে মনে আনন্দিত হয়ে ভাবত, ওরাই সৎ পথের পথিক) এবং যখন ওদের (মুমিনদের)কে দেখত তখন বলত, 'ওরাই তো পথভ্রষ্ট।' (অথচ) ওদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। (কিন্তু পরকালে) আজ মুমিনগণ কাফেরদের মজাক উড়াবে (এবং উপহাস করবে) সুসজ্জিত আসন হতে ওদের অবলোকন করে। কাফেররা ওদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেল তো? *(কুঃ ৮৩/২৯-৩৬)*

তকদীর বা বিধাতার বিধান

মুসলিম তকদীর ও ভাগ্যকে বিশ্বাস করে। যে ভাগ্য আল্লাহ তাআলা বিশ্ব সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে লিখে রেখেছেন। *(মুঃ ২৬৫৩)*

মুসলিম বিশ্বাস করে যে, বিশ্বচরাচরে যা কিছু ঘটছে তা তিনি পূর্ব হতেই জানেন এবং সবকিছু তাঁর হিকমত ও ইচ্ছানুযায়ীই ঘটছে। এমন কি মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মও তাঁর ইচ্ছা বিনা ঘটা সম্ভব নয়। তিনি যার ভাগ্যে যা লিখেছেন তা ন্যায় সঙ্গত। তিনি কারো উপর যুলুম করেন না। ভাগ্যলিপি তাঁর হিকমতে ভরপুর। অতএব তিনি যা চেয়েছেন তা হয়েছে, যা চাননি তা হয়নি। যা চাইবেন তাই হবে। যা চাইবেন না তা কোনদিন হবে না। তাঁর ইচ্ছা ও সাহায্য ব্যতীত যে কোনও কর্মশক্তি নিষ্ক্রিয়। *(কুঃ ৬৫/৩,৫৪/৪৯, ৭৬/৩০, ৮১/২৯)*

তকদীরের প্রতি ঈমান আনার দুটি পর্যায়ঃ

প্রথমতঃ এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাঁর আযালী ইল্‌ম দ্বারা সকল সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে বিদিত ছিলেন। তারা কি করবে ও না করবে, তাদের পাপ-পূণ্য, রুজী ও মৃত্যুর বিভিন্ন অবস্থা এবং অন্যান্য সবকিছু বিষয় সম্পর্কে সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন।

অতঃপর তিনি সারা সৃষ্টির ভাগ্যবিধান 'লওহে মাহফুযে' লিপিবদ্ধ করলেন। সর্বপ্রথম এক কলম সৃষ্টি করে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিখার আদেশ দিলেন। বিধাতার বিধান তৈরী হল। অতএব সেই বিধান মতে যা ঘটার তা নির্ভুলভাবে ঘটবে এবং যা ঘটার নয় তা ভুলেও ঘটবে না। কলম শুকিয়ে গেছে এবং খাতা গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। *(বুঃ ৬৫৯৬, মুঃ আঃ ১/২৯৩)* পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মানুষের উপর যে বিপর্যয় আসে তা সংঘটিত হবার পূর্বেই (লওহে মাহফুযে) লিপিবদ্ধ থাকে। *(কুঃ ৫৭/২২)* আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না। অথবা সন্তানও প্রসব করে না। কারো পরমায়ু বৃদ্ধি হলে অথবা হ্রাস পেলে তা সংরক্ষিত ফলক (লওহে মাহফুয) অনুসারে হয়। *(কুঃ ৩৫/১১)* ([20])

তিনি আকাশ পৃথিবীর সবকিছু অবগত। এ সব এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ আল্লাহর নিকট সহজ। *(কুঃ ২২/৭০)* জলে-স্থলে যা কিছু আছে তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাত সারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুযে) নেই। *(কুঃ ৬/৫৯)*

আল্লাহ তাআলার ভাগ্যলিখন তাঁর জ্ঞানের অনুসারী। এই ভাগ্যলিপি প্রথমে সংক্ষিপ্ত ও পরে বিস্তারিত ভাবে লিখা হয়ে থাকে। প্রথমে লওহে মাহফুযে তিনি যা ইচ্ছা লিখেছেন। পুনরায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণে আত্মাদানের পূর্বে ফিরিশ্তা পাঠান। তখন মানুষের রুজী, তার মৃত্যুর সময় ও স্থান, তার কর্মজীবন, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। ([21])

([20]) *আকস্মিক বা অপমৃত্যু ও আত্মহত্যায় মৃতের মরণের সময় দুটি নয়, একটিই। যা আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়তের গতির অনুসারী।*

([21]) *মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে লিখে জন্ম নেয় না।*

এইভাবে আবার প্রতি বছর রমযান মাসে 'লায়লাতুল ক্বাদর' বা শবেকদরে বিস্তারিত ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। *(কুঃ ৪৪/৪, বুঃ ৬৫৯৪, মুঃ ২৬৪৩)*

ভাগ্যের উপর ঈমান আনার দ্বিতীয় পর্যায় ঃ এই যে, তাঁর ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবী এবং ক্ষমতা সর্বব্যাপী। অর্থাৎ বিশ্বাস করা যে, তিনি যা কিছু চেয়েছেন তা হয়েছে, যা চাননি তা হয়নি, এবং ভূমন্ডলে ও নভঃমন্ডলে কোন শব্দ অথবা স্পন্দ-নিস্পন্দ ও চল-নিশ্চলের ক্রিয়া তাঁর ইচ্ছার বাইরে নয়। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁর রাজ্যে কিছুই ঘটে না। তিনি বর্তমান অবর্তমান সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। তিনিই আসমান ও জমীনের সকল ভালো-মন্দ, ইষ্ট-অনিষ্টকর বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক। ([22])

এতদসত্ত্বেও তিনি এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি নেককার সৎকর্মশীল, পরোপকারী এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে ভালোবাসেন। যারা ঈমান এনে ভালো কাজ করে তাদেরকে পছন্দ করেন। কাফেরদেরকে ভালো বাসেন না। ফাসেক ও পাপাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। অশ্লীল ও মন্দ কাজ তাঁর অপছন্দ। মন্দ কাজে আদেশও দেন না। বান্দার কুফরী তাঁর নিকট অপ্রিয়। ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি এবং সন্ত্রাসকেও তিনি পছন্দ করেন না। *(কুঃ ৭/২৮-২৯)*

আল্লাহ পাক মন্দকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর কর্মে ও ভাগ্যলিখনে কোন মন্দ নেই। যেহেতু মন্দ সৃষ্টির দৃষ্টিতে মন্দ হলেও তাঁর সৃজনে তা কোন মন্দ নয়। কারণ, তা তিনি কোন হিকমতে সৃষ্টি করে থাকেন। তাই কোন মন্দ ও নোংরা কাজের সম্পর্ক তাঁর সাথে জোড়া যায় না। অতএব একথা কেউ বলতে পারে না যে, তিনি চুরি করান বা ব্যভিচার করান- নাউযু বিল্লাহে মিন যালিক। *(মাঃ যাঃ ১০/৩৭৭, সিঃ সাঃ ৮৫)*

তিনি বান্দার জন্য যা কিছু করেন সবই ভালো। এমনকি বান্দা যাকে মন্দ মনে করে তাও তার কোন ভালোর জন্যই। *(মুঃ ২৯৯৯, মুঃ আঃ ৬/১৫)* মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপদ-আপদ সবই আল্লাহর তরফ থেকে। *(কুঃ ৪/৭৮)* কিন্তু বিপদ আসে মানুষের কৃতকর্মের ফলে, আপন কোন দোষে। *(কুঃ ৪/৭৯)*

প্রকৃতপক্ষে কর্মের কর্তা বান্দাই। আল্লাহ তাদের কর্মের সৃষ্টিকর্তা। *(কুঃ কুঃ ৩৭/৯৬)* বান্দাই মুমিন, কাফের, নেককার, বদকার, নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং রোযাব্রত পালন-কারী হয়। বান্দার নিজস্ব কর্ম-ক্ষমতা এবং এখতিয়ার আছে। *(কুঃ ৮১-২৮)* আল্লাহ তাদের ও তাদের কর্মের এবং তাদের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সৃষ্টিকর্তা।

তিনি বান্দাকে জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং এমন উপকরণ দিয়েছেন যার দ্বারা সে নিজের মঙ্গল ও সফলতা নির্বাচন এবং অমঙ্গল ও অসফলতাকে বর্জন করতে পারে। ভালো-মন্দ, সুফল-কুফল, সৎ-অসৎ ইত্যাদির পার্থক্য করে চিনতে পারে। তাই আল্লাহ বান্দাকে ভালো কাজের আদেশ দিয়ে তার উপর পুরস্কার ও নেক বদলা প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ যা করে তা নিজের ইচ্ছা, এখতিয়ার ও কর্মক্ষমতায় করে থাকে, আল্লাহ তাকে কোন কাজের উপর বাধ্য, মজবুর বা নিরুপায় করেন না। তবে যা কিছু তার এখতিয়ারে করে তাই তার নিয়তি, যা পূর্বে লিপিভুক্ত হয়েছে। এবং সেই এখতিয়ার আল্লাহর ইচ্ছারই অনুসারী।

([22]) *অতএব আল্লাহই সকলের ভাগ্যবিধাতা, শুধু তাঁরই বন্দনা করা উচিত।*

বান্দা কোন পাথর, মূর্তি বা পুতুলের মত নয় যে, তাকে যেমন রাখা হয় তেমনি থাকে অথবা যেমন নাচানো হয় তেমনিই সে (নিজস্ব এখতিয়ার ছাড়াই) নাচে। সে কোন কলের গাড়ির মত নয় যে, চালক যেদিকে চালায় সেদিকেই সে চলে। বরং সে পুতুল নাচানে-ওয়ালাও। আল্লাহ্ পুতুল (বান্দা), তার নাচ (কর্ম) এবং তার নাচার বা নাচাবার এখতিয়ার ও শক্তির সৃষ্টিকর্তা। কিভাবে নাচতে বা নাচাতে হবে তাও তিনি শিখিয়েছেন। তেমনি বান্দা কলের গাড়ি এবং তার চালকও। আল্লাহ্ গাড়ির সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। কিভাবে গাড়ি চালাতে হবে, কোন রোডে চালাতে হবে তাও তিনি শিখিয়েছেন। বান্দা নিজের এখতিয়ারে অন্যভাবে নাচতে পারে, অন্য যে কোন রোডে গাড়ি যেমন ভাবে ইচ্ছা চালাতে পারে, তবে তার সে এখতিয়ার ও ইচ্ছা হবে তাঁর ইচ্ছার অনুসারী ও অধীনস্থ। তাঁর হিকমত, যুক্তি এবং ইল্‌ম অনুযায়ী এবং এইভাবে যার অদৃষ্টে যা হবার হবে তা তার জন্য অতি সজহ হয়েই হয়ে থাকবে। *(মুঃ ২৬৪৭)*

জিজ্ঞাসা যে, তিনি মানুষের মাঝে পাপ সৃষ্টি করে, প্রবৃত্তি প্রদান করে পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দেবেন কেন ?

যেহেতু আল্লাহ পাক মানুষের মাঝে কেবলমাত্র পাপই সৃষ্টি করেননি। বরং পুণ্য বা ভালো কাজও সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ৯১/৮)* এবং এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করার প্রকৃত দিয়ে তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। *(কুঃ ৩০/৩০)* কিন্তু মানুষ এখতিয়ার করার সময় পুণ্যের পথ এখতিয়ার না করে তার প্রকৃতির উপর প্রবৃত্তির প্রলেপ দিয়ে পাপের পথ এখতিয়ার করে। যার জন্য তার শাস্তি এবং মন্দ পরিণাম অবশ্যই হবে। *(শাঃ তাঃ ৪৯৭)*

আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন -এটা তাঁর দান ও অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন না -এটা তাঁর ইনসাফ, যুলুম নয়। কারণ, যুলুম হকদারের হক আদায় না করলে হয়। সেই বান্দা হেদায়াতের হকদার নয়। আবার তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, যাকে যা ইচ্ছা তাই দান করেন। কাউকে দেন -তা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ। কাউকে দেন না -তা তাঁর ইচ্ছা, অন্যায় নয়। কারণ, তাঁর কাছে কোন অধিকারের দাবীদার কেউ নয় *(কুঃ ৫৭/২১,২৯)*

বান্দা যা আল্লাহর কাছে চায় তা যদি তার ভাগ্যে পাওয়া বা না পাওয়া লিখা থাকে তবে দুআ করে লাভ কি?

বান্দার ভাগ্যে কি আছে তা সে জানে না। এমনও হতে পারে যে, সেই যাচিত বস্তুটি সে চাইলে পাবে- এই লিখা আছে। আবার দুআ একটি কারণ বা হেতু মাত্র। যেমন, স্ত্রী-সঙ্গম সন্তান লাভের এবং বীজবপন গাছ বা ফল লাভের কারণ মাত্র। কিন্তু বিনা সঙ্গমে বা বিনা বীজ বপনে সন্তান বা ফলের আশা করা যায় না। আর ভাগ্যে থাকলে ছেলে হবে বা ফসল হবে -তাও বলা যায় না। আবার সঙ্গম বা বীজ বপন করলেই যে সন্তান বা ফল লাভ হবে তারও নিশ্চয়তা থাকে না। তাই সঙ্গম বা বীজ রোপণ করে ভাগ্যের উপর ভরসা করতে হয়। তেমনি দুআ করে বা তাঁর কাছে চেয়ে নিয়তির উপর আস্থা রাখতে হয়। বরাতে থাকলে বান্দা পাবে, নচেৎ না।

ঠিক তদ্রূপই দুআ ভাগ্যকে পরিবর্তন বা খন্ডন করতে পারে। *(সিঃ সঃ ১৫৪)* এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হয়ে থাকে। *(মুঃ ২৫৫৭)* এসব এক একটা কারণ বা হেতুমাত্র। আবার ঐ খন্ডন, বর্ধন এবং চাওয়া-পাওয়াও নিয়ন্তার নিয়তির গতি।

মানুষ অনেক সময় আল্লাহর নিকট অনেক কিছু চায় অথচ পায়না

কেন ? প্রার্থনা মঞ্জুর হবার প্রতিশ্রুতি *(কুঃ ৪০/৬০)* থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুর হয় না কেন?

আসলে তিনি সৃষ্টিকর্তা, বিজ্ঞানময়। তাঁর প্রতিটি কর্ম হিকমত ও যুক্তিযুক্ত। বান্দা যা চায় তা সে তার নিজের জন্য মঙ্গল মনে করতে পারে। কিন্তু তিনি বান্দার জন্য তা মঙ্গলদায়ক মনে করেন না। ফলে বান্দার জন্য যা কল্যাণমূলক তাই তিনি তাকে প্রদান করে থাকেন, অথচ বান্দা তা বুঝতে পারে না। *(কুঃ ২/২১৬)* যার ফলে দুআ কবুল না হওয়ার অভিযোগ করে। মোটকথা, বান্দার জন্য তার চাওয়া মুনাসিব বা উচিত হলে (যাচিত বস্তু তার জন্য মঙ্গল ও উপযুক্ত হলে) তা পেয়ে থাকে, নতুবা পায় না। কিন্তু তার এ প্রার্থনা বৃথা যায় না। বরং তার জন্য মুনাসিব সেইরূপ কোন দ্বিতীয় কল্যাণ লাভ করে থাকে। অন্যথায় সমপরিমাণ কোন অমঙ্গল বা বিপদ থেকে নিরাপত্তা অর্জন করে থাকে। *(মুঃ আঃ ৩/ ১৮, শঃ তাঃ ৫২২)*

দুআ বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করার একটা কারণ বা হেতু এবং এটা একটি ইবাদত। যার কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে যেমন, ইখলাস, হালাল খাওয়া ও পরা ইত্যাদি। যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ না হলে কোন জিনিসই সম্পূর্ণ হয় না। ([23])

কোন আমল করার জন্য বান্দার সামর্থ এবং আল্লাহর 'তওফীক' সহায়তা অপরিহার্য আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু বান্দার উপর তার সামর্থ্যের বাইরে কোন দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। বান্দা যতটুকু দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা রাখে ততটুকু (বরং তার নুন্য) বোঝাই তিনি চাপিয়ে থাকেন। এটাই হল 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' -এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ও প্রয়াসদান ছাড়া কোন সৎকার্য সম্পাদন করার এবং অসৎ হতে বিরত থাকার ক্ষমতা কারো নেই। অনুরূপভাবে তাঁর 'তওফীক' বা প্রয়াসদান ছাড়া তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকার ক্ষমতা এবং আনুগত্য বরণ করা ও তার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার সাধ্য কারো নেই। যেমন আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া কোন প্রকার নড়া-সরার এতটুকু সাধ্য কারো নেই।

মুসলিম কোন রোগ-ব্যাধির নিজস্ব সংক্রমণে বিশ্বাসী নয়। কারণ, আল্লাহর তরফ থেকেই (প্রথম) আক্রমণ এবং (পরে) সংক্রমণ হয়ে থাকে। *(বুঃ ৫৭০৭, মুঃ ২২২০)* আবার সংক্রামক ব্যাধি থেকে সাবধানও থাকে। কারণ, সে তকদীর ও তদবীর দুয়েই বিশ্বাসী। তাই যে স্থানে কলেরা, বসন্ত বা অন্য কোন মহামারী দেখা দেয়, সে স্থানে সে বর্তমান থাকলে সেখান হতে ভয়ে বের হয়ে পলায়ন করে না। কারণ তকদীর হতে পালাবার পথ কোথায়? কিন্তু সে স্থানের বাইরে থাকলে সেখানে প্রবেশ করে না। কারণ, তদবীরও ফল দেয়। *(বুঃ ৫৭২৯, মুঃ ২২১৯, মুঃ আঁ ১/১৯২)*

তদনুরূপই কোন সংক্রামী ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কাছে থাকলে দূরে সরে যায় না। বা তাকে দূর বাসে না এবং দূরে থাকলে কাছে আসেনা (মুমূর্ষের সাহায্য ও চিকিৎসা করার কথা স্বতন্ত্র)। কারণ, মানুষের কাজ তদবীর করা বা সাবধানতা অবলম্বন করা। তকদীর

([23]) দুআ কবুল হওয়ার এটাও এক শর্ত যে, মানুষ দুআ করার সময় অনুভব করবে যে, সে আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী। তাঁর নিকট সর্বদা সে নিতান্ত ভিখারী এবং তিনিই এককভাবে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। বিপন্নকে বিপদমুক্ত করেন। অন্যথা যদি কেউ অনুভব করে যে, সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহর অনুগ্রহের তার প্রয়োজন নেই এবং অভ্যাসগতভাবে দুআ করে অথবা দুআর সময় সে তাঁর নিকট কি চায় তা নিজেই জানে না (যেমন আরবী দুআর মর্মার্থ না জেনে দুআ করে তাহলে) তা কবুল হওয়ার উপযুক্ত নয়।

তার নিজের কাজ করবে। *(বুঃ ৫৭০৭, মুঃ ২২৩১)*

আবার তার কাছে যাওয়ার পর যদি তারও সেই ব্যাধি হয়ে যায়, তবে সে এ বিশ্বাস বা ধারণা করে না যে, তার কাছে এসেই রোগটা হল। বরং বিশ্বাস রাখে যে, এটা তার নিয়তির গতি বা আল্লাহপাকের ইচ্ছা।

বিশ্ববিধাতার এই বিধান সারা সৃষ্টির উপর বলবৎ। এই বিধান থেকে এড়াবার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তিনি যা করেছেন, করেন বা করবেন তা সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ। তাঁর কোন কাজের উপর প্রতিবাদ বা কৈফিয়ত করা অথবা 'কেন এমনটি করলেন' বলে প্রশ্ন করার অধিকার কারো নেই। কারণ, এরূপ করা কুফরী। *(কুঃ ২১/২৩)*

দুর্ভাগ্যে ধৈর্যধারণ

আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তিনি সকলের প্রতি ইনসাফ করেন, ইনসাফ করতে আদেশ দেন। *(কুঃ ১৬/৯০)* তিনি কোনদিন কারো উপর যুলুম করেন না। *(কুঃ ৪/৪০, ১০/৪৪)* তিনি বান্দার জন্য যা কিছু ফায়সালা করেন তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন। *(মুঃ ২৯৯৯, মুঃ আঃ ৪/৩৩২)* তা কোন বান্দা বুঝতে পারে, আবার কোন বান্দা বিপদে বহির্দৃষ্টিতে ভুল বুঝে তা অন্যায় মনে করে। পীড়িত শিশু যখন তিক্ত ঔষধ সেবনে রাজী হয় না, তখন স্নেহময়ী মাতা জোরপূর্বক কখনো বা ধমক দিয়ে প্রহার করে শিশুকে খাওয়ালে, সে মনে করে মা তার প্রতি যুলুম করছে। সে ঐ তিক্ত ঔষধের মিষ্ট ফল না জানার জন্য মা-কে ভুল বুঝে। সে বুঝতে পারে না যে, মা তার মঙ্গলই চায়, তার সুস্থতা ও শান্তির জন্যই মা তাকে এই শাস্তি দিচ্ছে। তদনুরূপ, কর্মকার পুরাতন জং-ধরা লৌহাস্ত্রকে অগ্নিদগ্ধে উত্তপ্ত করে আঘাতের পর আঘাতে নিষ্পেষিত করে, তাকে ধ্বংস ও বিনাশ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং নতুন করে গড়ার উদ্দেশ্যে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দগ্ধ ও আঘাতকে যুলুম মনে হয়। সার্জন রোগনিবারণার্থে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার (অপারেশন) করলে তা আপাততঃ 'মারকাট' মনে হলেও বস্তুতঃ রোগীর মঙ্গল সাধনই করা হয়। ঐ নিষ্পেষণ এবং অস্ত্রোপচারের মতনই বিধাতার বিধানে মানুষের বালা-মসীবত এবং শরীয়তী সংবিধানের বিভিন্ন দন্ডবিধি; তাকে নতুন ও সুস্থ করে গড়ে তোলার জন্যই ঐ ব্যবস্থা।

মুসলিম আল্লাহকে এ ধরনের ভুল কোনদিন বুঝেনা। সে তাঁর সকল ফায়সালাকে নতশিরে মেনে নেয় এবং তাতেই নিজের মঙ্গল মনে করে। আল্লাহর তকদীর ও বিচারের উপর ধৈর্য ধারণ করে। নিয়তির উপর সদা সন্তুষ্ট থাকে। আপাতদৃষ্টিতে নিজের ভাগ্যকে দুর্ভাগ্য মনে হলেও সেটাকেই সে নিজের জন্য শুভ ও অনুকূল মনে করে। কারণ, সে জানে যে, আল্লাহ তার প্রতি কোন দিন যুলুম করেন না। শিশুর প্রতি মায়ের অনুকম্পা যতটা, তার চেয়ে বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা বহুগুণ অধিক। *(বুঃ ৫৯৯৯, মুঃ ২৭৫৪)*

অতএব মুসলিম যখন কোন বিপদে বা মসীবতে পরে তখন তকদীরকে বা আল্লাহকে (নিয়তি বা নিয়ন্তাকে) গালি দেয় না। যেমন, 'নিষ্ঠুর ভাগ্য, পোড়া কপাল, যালেম তকদীর, লিখনে ঝাঁটা মার, এমন কপালে ঝাঁটা মারতে হয়, কানা খোদা, খোদার হুঁশ নেই' (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক) ইত্যাদি বলে গালিমন্দ করে না। কারণ, এসব কথায়

মুসলিম কাফের হয়ে যায়।

মুমিন যখন কোন বিপদে পড়ে তখন সে মনে করে, এ বিপদ হয়তো তার কোন পাপের কুফল। *(কুঃ ৪২/৩০)* নতুবা গোনাহের কাফ্‌ফারা। *(বুঃ ৫৬৪৮, মুঃ ২৫৭২)* নচেৎ আল্লাহর তরফ থেকে তার কোন পরীক্ষা। *(কুঃ ২/১৫৫)* তাই সবর করে মেওয়া লাভের জন্য। যার ফলে তার পাপক্ষয় হয় অথবা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয়। কিন্তু অনেক সময় মানুষের শিশুমন আল্লাহর সে হিকমত ও যুক্তিকে বুঝে উঠতে পারে না। পরন্তু সেই সময় মুসলিমের উচিত, আল্লাহর তকদীর ও ফায়সালার কোন প্রকারের প্রতিবাদ, অভিযোগ বা আপত্তিমূলক কথা না বলে, বরং না ভেবে ধৈর্যের সাথে মঙ্গল কামনা করা এবং ভক্তিভরে তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া। বান্দা তাঁকে স্মরণ করলে তিনি তাঁকে স্মরণ করে থাকেন। *(কুঃ ২/১০২)*

কিন্তু মুসলিম শুধুমাত্র দুঃখ-কষ্ট ও মসীবতের সময়েই আল্লাহর নাম নেয় না, বরং সুখে ও দুঃখে, আনন্দ ও শোকে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে। দুঃখের পর সুখ পেয়ে তাঁকে ভুলে যায় না। কারণ, সে জানে, দুঃখ-সুখ সবই তাঁর নিকট হতেই আসে। তাই দুঃখ এলে সবর করে সুখ এলে শুক্‌র করে। কারণ, আল্লাহ কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যশীলতার আদেশ দেন এবং তিনি ধৈর্যশীল বান্দার সাথে থাকেন। *(কুঃ ২/১২২-১৫৩)*

মোট কথা বিপদের সময় বান্দার চার অবস্থা হতে পারে ঃ

১। বিপদে অধৈর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। আল্লাহ ও ভাগ্যের উপর অভিযোগ আনে। অদৃষ্টে বড় অসন্তুষ্ট হয়। নিজের উপর নসীবের বড় যুলুম মনে করে, কখনও বা গালাগালিও করে ফেলে। এরূপ বান্দার জন্য হারাম। কারণ, এতে সে কাফেরও হতে পারে। *(কুঃ ২২/১১)*

অথবা বিপদে অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে, ধ্বংস বা মৃত্যুকে ডাকে। অথবা গাল নোচে, কাপড় ও চুল ছিঁড়ে, বুক চাপড়ে ইত্যাদি- এর প্রত্যেকটাই বান্দার জন্য হারাম বা অবৈধ। ([24])

২। বিপদে ধৈর্য ধরে ও সহ্য করে। যদিও এটা বান্দার জন্য ভারি তবুও সে ঈমানের বলে সব কিছু বরণ করে নেয়। মসীবত তো চায় না, কিন্তু এলে সহনশীলতার পরিচয় দেয়। এটা বান্দার জন্য ওয়াজেব। (অবশ্যকর্তব্য)। *(কুঃ ৮/৪৬)*

৩। বিপদে সে সন্তুষ্ট থাকে। বিপদ এলেই বা কি, আর না এলেই বা কি -সব সমান এই বান্দার কাছে। বিপদ এলে আদৌ ভারি মনে করে না। এটা বান্দার জন্য মুস্তাহাব বা উত্তম।

৪। বিপদে শুক্‌র আদায় করে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে করে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং ভাবে যে এই মসীবত তার পাপক্ষয়, পুণ্যাধিক্য অথবা অন্য কোন মঙ্গলের কারণ। এটাই বান্দার জন্য সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ আসন।

মুমিনের জন্য ধন সম্পদ ও দারিদ্র উভয়ই পরীক্ষা ও ইমতিহানের বস্তু। *(কুঃ ৮৯/১৫-১৬)* তাই ধনী হলে তাঁর কৃতজ্ঞতা করার সাথে সাথে ধন তাঁর রাস্তায় খরচ করা উচিত। আর গরীব হলে ধৈর্যাবলম্বন করা উচিত। পাপী পাপ করেও সুখ পায়, কাফের কুফরী করেও বড় সম্পদশালী, প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হয়। আল্লাহপাক এ দুনিয়ায়

([24]) *অধৈর্য না হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষের করুণা ও প্রকৃতিগত কান্না তকদীরের উপর রাজী থাকা বা ধৈর্য ধারণ করার প্রতিকূল নয়। আল্লাহর নির্দিষ্ট ভাগ্যের উপর, তাঁর হারামকৃত বস্তু ত্যাগ করা এবং আদেশকৃত বস্তু পালন করার উপর ধৈর্য ধারণ করতে মুমিন আদিষ্ট হয়েছে।*

তাদেরকে ঢিল দিয়ে সুখ লুটে নেবার সুযোগ সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। *(কুঃ ৩/১৭৮, ৬/৪৪, ২৩/৫৫-৫৬, ৬৮/৪৪-৪৫)* বরং এ সম্পদ তাদের জন্য বড় ফিতনা। কাফেরদের সে সুখের প্রতি তাকিয়ে মুসলিমের মনঃকষ্ট পাওয়া উচিত নয়। *(কুঃ ১৫/৮৮,২০/১৩১)* আর একথা জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি (যাকে) যে পরিমাণ ইচ্ছা তাকে সে পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক্ জানেন এবং দেখেন। *(কুঃ ৪২/২৭)*

'বিপদে আল্লাহ মুমিনের সাথী। যার কেউ নেই তার আল্লাহ আছেন। তিনি অসহায়ের সহায়।' এ সবের অর্থ এই নয় যে, সুখে আল্লাহ তার সাথী নয়। যার সবাই আছে তার আল্লাহকে প্রয়োজন নেই বা যার সহায় আছে তিনি তার সহায় নন। বরং আল্লাহ মুমিনের সর্বক্ষণের সাথী এবং সহায়। তবে বিপদে কেউ তাকে সাহায্য না করলে আল্লাহ তার সাহায্য করে থাকেন।

বান্দা যখন কোন বিপদে পড়ে তখন বলে থাকে, 'ভাগ্যে ছিল তাই হয়েছে।' কিন্তু কোন পাপে লিপ্ত হয়ে ভাগ্যের দোহাই দিতে পারে না। কারণ, পাপে তার এখতিয়ার থাকে; কিন্তু বিপদে সে বাঁচতে চায়। তাই যে ইচ্ছা করে বিপদ আনে বা আত্মহত্যা করে সে মহাপাপী। অবশ্য পাপ থেকে তওবা করার পর সে বলতে পারে যে, 'ভাগ্যে ছিল, পাপ হয়ে গেছে।' *(ফঃউঃ ২/১৫৯)*

মোটকথা, ভাগ্যের উপর মুসলিম সম্পূর্ণ রাজি থাকে; কিন্তু পাপে চুপ থাকে না। কারণ, মানুষ স্বেচ্ছানুবর্তী। তবে তার ইচ্ছা বিধাতার বিধানের অনুসারী।

তকদীর বা ভাগ্যের কথাগুলি বাহ্যতঃ পরস্পর-বিরোধী মনে হয়। সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ বুঝে আসা সম্ভব হয় না। কিছু বিষয় আছে যা জ্ঞান ও গবেষণা দ্বারা উপলব্ধ হয়। তা অস্বীকার করা কুফরী, আবার এমন অনেক বিষয় আছে যা জ্ঞান-গবেষণা বা তর্কের দ্বারা উপলব্ধ নয়। এমন বিষয়ে জ্ঞানের দাবী করাও কুফরী। মুমিন এমন অসাধ্য সাধনে মন দেয় না।

তকদীর বান্দার জন্য তদনুরূপই একটি অনুপলবদ্ধ বিষয়, আল্লাহর একটি রহস্য। এ রহস্য তাঁর নিকটবর্তী কোন ফিরিশ্তা অথবা কোন নবী-রসূলও জানেন না। অতএব তা উদ্ঘাটন করার অপচেষ্টা করা অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া লাঞ্ছনার কারণ, বঞ্চনার সোপান এবং সীমালংঘনের পথ। অতএব এ বিষয়ে মুসলিমকে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কুমন্ত্রণা হতে বিরত ও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ, আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহ তকদীর সংক্রান্ত জ্ঞান ও ভেদকে মখলুক হতে গুপ্ত রেখেছেন এবং এর রহস্য উদ্ঘাটনের পথ খুঁজতে গিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন।

ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যে ব্যক্তি তকদীর সম্পর্কে আল্লাহর বিরুদ্ধে অযথা ও অসমীচীন মন্তব্য করে এবং রোগা অন্তর নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা ও বিতর্কে রত হয়। আর কেবল নিজ ধারণা ও কল্পনার বাহুবলে গায়বের একটি গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটনের দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে, যার ফলে সে মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীতে পরিণত হয়। *(আঃ তাঃ)*

আল্লাহর ইরাদা বা ইচ্ছা

আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তাই করেন। *(কুঃ ৮৫/১৬)* যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, যা চাইবেন তাই হবে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর বান্দার কোন ইচ্ছা ও সঙ্কল্প বাস্তবায়িত হয় না। বান্দার জন্য যা চান তা হয়, যা চান না তা হয় না।

পাপ তিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ পাপে লিপ্ত হয়; কিন্তু তিনি চাইলে পৃথিবীতে কোন পাপই হত না। *(কুঃ ২/২৫৩)* কিন্তু তাহলেও তিনি পাপ পছন্দ করেন না। পাপীর উপর রাগান্বিত ও ক্রুদ্ধ হন, পাপের পথে পা বাড়াতে নিষেধ করেন।

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন, রক্ষা করেন, আর এসব বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। আবার যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন, ধ্বংস করেন, বিপদগ্রস্ত করে শাস্তি প্রদান করেন। আর এ সব তাঁর হিকমতের অন্তর্ভুক্ত ন্যায়পরায়ণতা। তিনি কারও প্রতি যুলুম ও অন্যায় করা থেকে পাক নিরঞ্জন। *(কুঃ ৬/৩৯, ৭৪/৩১)*

আল্লাহ তাআলার ইরাদা বা ইচ্ছা দুই প্রকারেরঃ

১- ইরাদাহ কওনিয়াহ বা সৃষ্টিমূলক ইচ্ছা। যে ইচ্ছাশক্তিতে তিনি চাইলেই সবকিছু হতে বাধ্য। যখন কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন শুধুমাত্র 'হও' বললেই তা সৃষ্টি হয়ে যায়। *(কুঃ ১৯/৩৫, ৩৬/৮২)* তাঁর এই ইচ্ছায় যদি কোন জিনিস 'না হবার' হয় তাহলে সমগ্র জগতের মিলিত প্রচেষ্টাতেও তা হওয়া সম্ভব নয়।

২- ইরাদাহ দ্বীনিয়াহ বা দ্বীনী ও উপদেশমূলক ইচ্ছা, যা তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। বান্দাকে তা করতে আদেশ করেন ও উপদেশ দেন। বান্দা কখনো তা করে, কখনো করে না। *(কুঃ ২/১৮৫, ৪/২৭-২৮)*

যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর ইরাদাহ কওনিয়াহ ও দ্বীনীয়াহ উভয় দিয়েই হযরত আবু বকর ﷺ-এর ঈমান চেয়েছিলেন, ফলে তিনি মুমিন সাহাবী ছিলেন।

আর ইরাদাহ দ্বীনিয়ায় আবু জেহেলের ঈমান চেয়েছিলেন, কিন্তু ইরাদাহ কওনিয়ায় চাননি। যার ফলে আবুজেহেল ঈমান আনেনি। কিন্তু কওনিয়ায় চাইলে সে মুমিন হয়ে যেত।

এইভাবে প্রতি সৎকার্য তাঁর উভয় ইরাদায় সংঘটিত হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতি অসৎকার্য তাঁর শুধু ইরাদাহ কওনিয়ায় হয়ে থাকে।

ঈমান অন্তরে বিশ্বাস ও স্বীকার মুখে উচ্চারণ ও প্রকাশ, এবং বিভিন্ন দেহাঙ্গ দ্বারা কাজে পরিণত করায় নাম। তাই ঈমান কমে ও বাড়ে। কারণ কাজে পরিণত করা এবং অন্তরের বিশ্বাস সর্বদা সকলের এক সমান হয় না। যেমন কারো খবরে শুনে বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে বিশ্বাস সমান নয়। তেমনি একটি মানুষের কাছে শুনে যে বিশ্বাস জন্মে, তার চেয়ে দুটি মানুষের কাছে শুনে বিশ্বাস অধিক জন্মে। তাই তো হযরত

ইব্রাহীম ﷺ আল্লাহর কাছে মৃতকে জীবিত করা প্রত্যক্ষ দেখতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি কি (আমার মৃতকে জীবন দান করা) বিশ্বাস কর না?' তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই, তবে আমার মনকে প্রবোধিত করার জন্য দেখতে চাই।' *(কুঃ ২/২৬০)*

অতএব অন্তরে বিশ্বাস ও প্রত্যয়-দৃঢ়তা অনুযায়ী ঈমান কম বেশী হয়ে থাকে। যখন মুসলিম কোন কুরআন ও হাদীসের মহফিলে থাকে, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শোনে, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। আবার যখন সংসারে লিপ্ত হয়ে গাফলতি ও অবহেলায় থাকে, তখন ঈমান সেই পরিমাণ আর থাকে না। তেমনি যে দশবার আল্লাহর যিক্‌র করে তার ঈমান একশতবার যিক্‌রকারীর মত নয়। যে পূর্ণ সুন্নাহ মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করে তার ঈমান সেই ব্যক্তির থেকে বেশী, যে পূর্ণ সুন্নাহ মোতাবেক ইবাদত করে না। যে যত বেশী আমল ও ইবাদত করে, তার ঈমান তত পোক্তা ও বেশী হয়। কুরআন মাজীদে *(৯/১২৫, ৭৪/৩১)* এবং হাদীস শরীফে *(বুঃ ৭৪১০)* একাধিক স্থানে ঈমান কম-বেশী হবার কথা আলোচিত হয়েছে।

ঈমান বেশী হবার অনেক হেতু আছে, যেমনঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলী (আসমা ও সিফাত) দ্বারা তাঁর মারেফাত (পরিজ্ঞান)। যে যত তাঁর নাম ও গুণ জেনে তাঁর মারেফাত অর্জন করবে, তার তত ঈমান বৃদ্ধি হতে থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর সৃষ্টির উপর চিন্তা ও গবেষণা, তাঁর সৃষ্টিগত ও শরয়ী নিদর্শনকে ভিত্তি করে তাঁর মহত্ব ও মহিমা অনুসন্ধান করা। *(কুঃ ৫১/২০-২১)*

তৃতীয়তঃ অধিক আমল, ইবাদত ও আল্লাহর যিক্‌র করা।

আর এই তিনের বিপরীত করা ঈমান কম হওয়ার হেতু।

ঈমানের মূল রুক্‌ন (স্তম্ভ) ছয়টি ঃ আল্লাহর উপর ঈমান, তাঁর ফিরিশ্তার উপর ঈমান, তাঁর কিতাব বা ঐশীগ্রন্থসমূহের উপর ঈমান, রসূল ও আম্বিয়ার উপর ঈমান, আখেরাত বা পুনরুত্থান ও পরকালের উপর ঈমান এবং তকদীর বা বিধাতার বিধানের ভালো-মন্দ, মিষ্ট ও তিক্তের উপর ঈমান। *(বুঃ ৫০, মুঃ ৮)*

এতদ্ব্যতীত আরও বহু বিষয় রয়েছে যার উপর ঈমান ওয়াজেব।

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা আছে। এর বৃহত্তম শাখা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (মর্মার্থ বুঝে) বলা এবং ক্ষুদ্রতম শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। *(বুঃ ৯, মুঃ ৩৫)*

ঈমান থাকলেও পাপের কারণে (আল্লাহ চাইলে) জাহান্নাম যেতে হবে। তবে যার অন্তরে অণুপরিমাণও ঈমান বিদ্যমান থাকবে, পাপের শাস্তি ভোগের পর সে জান্নাতবাসী হবে।

মুসলিম যখন কোন সুন্দর মনোরম, মঙ্গলদায়ক বা আশ্চর্যজনক জিনিস দেখে বা এই ধরনের কোন কথা শোনে, তখন আল্লাহ আকবার 'সুবহানাল্লাহ' 'আল হামদুলিল্লাহ' অথবা 'মা-শাআল্লাহ' বলে। ভবিষ্যতের কোন অজানা কাজের জন্য বা কিছু 'করব' বললে তার সঙ্গে 'ইনশা আল্লাহ' বলে। ([25])

([25]) এর অর্থ 'যদি আল্লাহ চান।' বলা হয় এ কারণে যে, যে কোনও কাজ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। যদিও তাতে বান্দার পূর্ণ ইচ্ছা থাকে। (কুঃ ১৮/২৩-২৪,৩৯)

'ইনশা-আল্লাহ' নিশ্চয়তাবোধক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'ইনশা-আল্লাহ আমি যাব।' এরূপ বলে না যাওয়ার সন্দেহ দূর করা হয়। এই অর্থে মুসলিম 'ইন শা-আল্লাহ আমি মুমিন' বলতে পারে না। কারণ, এতে সুনিশ্চিতভাবে নিজেকে মুমিন হওয়ার সাক্ষি দেওয়া হয়। তাতে অহমিকা বা বড়াই হতে পারে। যা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। *(কুঃ ৫৩/৩২)* আবার 'ইনশা আল্লাহ' সন্দেহ বা অনিশ্চয়তাবোধক অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন, 'যাব ইনশা-আল্লাহ।' অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে যাব, না চাইলে যাব না। বরং মনে মনে বলা হয় যে, 'যেতেও পারি, নাও যেতে পারি।' এইরূপ সন্দেহের অর্থে বা দ্বিধা বুঝাতেও মুসলিম 'ইনশা-আল্লাহ আমি মুমিন' বলতে পারে না। কারণ, সন্দেহে ঈমান থাকে না।

তবে হ্যাঁ, অনিশ্চয়তাবোধক অর্থে 'ইনশা-আল্লাহ আমি মুমিন' বলে যদি সেই মুমিন উদ্দেশ্য হয় যার প্রশংসা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে করেছেন, তবে তা বলতে পারে। কারণ সেরূপ মুমিন হওয়া অনিশ্চয়তা বা সন্দেহের কথাই বটে। আবার যেহেতু ভবিষ্যতের খবর আল্লাহর কাছে। বর্তমানে সে নিজেকে মুমিন মনে করে। কিন্তু আগামীতে তার মুমিন হয়ে থাকায় আল্লাহর ইচ্ছা থাকবে কিনা -সেদিকে লক্ষ্য করে বললেও বলতে পারে। *(কিঃঈঃশঃতাঃ ৩৯৫-৩৯৮)*

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ (কিয়ামত) পর্যন্ত রসূল ও আম্বিয়াগণের মাধ্যমে আনীত ও প্রচারিত আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহরই ইবাদত, আনুগত্য এবং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করা তথা শির্ক থেকে দূরে থাকার নাম ইসলাম। হযরত আদম ﷺ থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল আম্বিয়া ও রসূলগণের প্রচারিত ধর্ম, জীবনাদর্শ বা বাঁচার পদ্ধতির নাম ইসলাম। *(কুঃ ৪২/১৩)* (যদিও তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনে কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান ছিল।) তাই সকলের দ্বীন এক (ইসলাম) হলেও শরীয়ত বিভিন্ন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তের পর শুধু তাঁরই শরীয়তকে ইসলাম বলা হয়। কারণ, তাঁর শরীয়ত সমস্ত শরীয়তকে মনসুখ (রহিত) করে দিয়েছে। তাই যে তাঁর ও তাঁর শরীয়তের অনুকরণ করে একমাত্র আল্লাহর (শির্কহীন) ইবাদত করে সে মুসলিম। আর যে তাঁকে নবী বলে ও তাঁর শরীয়তকে ধর্ম বলে মানতে চায় না এবং সেই শরীয়তের অনুকরণ করে না, সে (যদিও আল্লাহরই ইবাদতক করে তবুও) কাফের। কারণ, তাতে সে আল্লাহর নিকট আত্মনিবেদন না করে নিজের প্রবৃত্তির কাছে আত্মনিবেদন করে।

অতএব ইয়াহুদী হযরত মূসা ﷺ-এর যুগে মুসলিম ছিল। খ্রীষ্টান হযরত ঈসা ﷺ এর যুগে মুসলিম ছিল। (ইয়াহুদী ও নাসারা বা খ্রীষ্টান পরবর্তীকালের নাম।) কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ যখন নবী হয়ে প্রেরিত হলেন এবং আল্লাহ পাক সমগ্র মানব-জাতিকে একমাত্র তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল। আল্লাহর নাফরমানী করল এবং তাদের নবীদেরও অবাধ্য হল; যাঁরা তাদেরকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনার আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে তারা কাফের হল।

যেহেতু সমস্ত আম্বিয়ার দ্বীন এক, আহবান এক এবং ইসলাম হল আল্লাহর মনোনীত

দ্বীন। তাই তা ছেড়ে কোন পথেই তাঁর সন্তুষ্টিলাভ সম্ভবপর নয়। *(কুঃ ৩/ ১৯, ৮৫, ৫/৩)*

ইসলামের রুক্ন পাঁচটি ঃ কলেমা ('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বা আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত দাস বা রসূল- এই কথা বিশ্বাস করা ও বলা এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করা।) পাঁচ অক্তের নামায কায়েম করা, ধনের যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা পালন করা এবং মক্কা মুকার্রামায় অবস্থিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম (ইবাদত) গৃহ কাবা শরীফের হজ্জ জিয়ারত পালন করা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ফরয আমলও ইসলামে রয়েছে।

জ্ঞাতব্য যে, ঈমান, জান, জ্ঞান, মান ও ধন মানুষের এই ৫টি সম্পদকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের আগমন হয়েছে এ বিশ্বে।

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

যখন ঈমান ও ইসলাম শব্দ দুটিকে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন উভয়ের সংজ্ঞার্থ এক। অতএব ইসলাম বলতে বোঝায়, আল্লাহর নিকট বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করা, যাতে পুরো দ্বীনই শামিল হয়ে যায় -আকিদা (বিশ্বাস) আহকাম ও আমল (কাজ) এবং কথাও। তদনুরূপ ঈমানও অন্তরে বিশ্বাস মুখে কথন ও বিভিন্ন দেহাঙ্গের দ্বারা কার্যে পরিণত করার নাম।

কিন্তু যখন ঈমান ও ইসলাম একই সঙ্গে পাশাপাশি ব্যবহার করা হয় তখন ইসলাম বলতে বাহ্যিক আমল, কথা ও কাজকে বুঝায়, এবং ঈমান বলতে আন্তরিক ও আভ্যন্তরীণ আমল, প্রত্যয়, ভক্তি ও প্রেমকে বুঝায়। *(কুঃ ৪৯/ ১৪,৫১/৩৬, বুঃ ৫০, মুঃ ৮)*

অতএব মানুষ প্রথমে বিশ্বাস করে মুমিন এবং পরে আমল করে মুসলিম হয়। আবার যেই মুমিন সেই মুসলিম। কারণ, মুমিন ইসলাম ছাড়া এবং মুসলিম ঈমান ছাড়া হতেই পারে না।

ঈমান ও ইসলামের সাথে ইবাদতের জন্য ইখলাস একান্ত জরুরী। তাছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। 'ইখলাস' বলে, বিশুদ্ধ মনে, একাগ্রচিত্তে, একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তন্ময় হয়ে কোন ইবাদতে অভিনিবিষ্ট হওয়াকে, এবং সেই ইবাদত যেন অন্য কারো ধ্যান, কারো সন্তুষ্টি বা মনোরঞ্জন, নিজস্ব কোন স্বার্থলাভ উদ্দেশ্য না হয়। অন্যথায় তা শির্কে পরিণত হবে। 'ইহসান' বলে এমনভাবে ইবাদত করাকে, যাতে আবেদ মনে করে যেন সে আল্লাহকে দেখছে। তা সম্ভব না হলে মনে করে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। এইভাবে ফরয বা ওয়াজেব ছাড়াও নফল ও মুস্তাহাব পালন করে এবং হারাম ও নাজায়েয ছাড়াও মকরূহ ও সন্দিহান ত্যাগ করে যারা আল্লাহর তুষ্টি বিধান করতে চায় তারাই মুত্তাকীন ও মুহসেনীন।

ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। *(কুঃ ৩/ ১৯, ৯/৩৩)* মুসলিম অন্য কোন ধর্মকে ইসলামের সমতুল মনে করে না। অপর ধর্মের উপাস্যদের গালি-মন্দও করে না। *(কুঃ ৬/ ১০৮)* সে পৃথিবীতে শান্তি চায়। সে জানে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামী সংবিধান ব্যতীত অন্য কোন সংবিধান অচল-অপারগ। ইসলামী বিচার তার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ। তাই সে দুনিয়াতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চায়। বিচার ও মীমাংসা করে তো সৃষ্টিকর্তা প্রণীত আইন ও কানুন দ্বারা

করে। কোন সৃষ্টির গড়া কানুন দ্বারা নয়। *(কুঃ ৪/৬০, ৫/৪৪-৪৫, ৪৭)* আর স্বীকার করে যে, ইসলামী জীবনাদর্শ সারা পৃথিবী ও সর্বকালের জন্য উপযোগী। সমগ্র মানবজাতি ও জিন সম্প্রদায়ের জন্য মান্য। অতএব মুসলিম ইসলামী বিচার ও ফায়সালাকে নির্দ্বিধায় ও নিঃসন্দেহে নতশিরে মেনে নেয়।

পক্ষান্তরে যে বিশ্বাস রাখে যে, মনুষ্য-রচিত সংবিধান ইসলামী সংবিধান অপেক্ষা উত্তম। অথবা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দি বা তার পরে অচল, অথবা ইসলামী জীবনাদর্শই মুসলমানদেরকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছে, অথবা ইসলামী সংবিধান শুধু ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার, পার্শন্যাল ল' এবং বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্কীয় মাত্র, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি বা অন্যান্য নীতিতে তার কোন প্রসঙ্গতা নেই। অথবা মনে করে যে, ইসলামী আইনানুযায়ী চোরের হাত কাটা, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে শতবার বেত্রাঘাত করা আর বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করা এ যুগে মুনাসেব হয় না। অথবা ইসলামী আদালত ছাড়া অন্য আদালতে বিচার ন্যায্য ও উত্তম মনে করে। তাহলে সে মুমিন নয় মুসলিম নয়, কাফের।

অবশ্য যারা ইসলামী কানুন ও সংবিধানকে শ্রেষ্ঠ জানা সত্ত্বেও কোন চাপে পড়ে মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার-মীমাংসা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদেরকে কাফের বলা যায় না, ফাসেক বলা যায়।

মুসলিম বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাকে যে অধিকার দিয়েছেন তা সবই তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত। পুরুষকে নারীর উপর মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। নারীকে পুরুষের অর্ধেক অংশ দিয়ে উত্তরাধিকারিণী করেছেন। পুরুষকে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণে অনুমতি দিয়েছেন। খুব কঠিনতম প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রীর চির বন্ধন টুটে দেবার অনুমতি দিয়েছেন- এসব কিছু তাঁর যুক্তিযুক্ত ইনসাফ। এসব গুলিকে যে অন্যায় ও যুলুম ভাবে সে কাফের।

যে ইসলাম থেকে বৈমুখ হয়, না দ্বীন শিক্ষা করে আর না শিক্ষাকে প্রয়োজন মনে করে, না দ্বীনের উপর আমল করে, আর না-ই তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে -সেও কাফের। *(কুঃ৩২/২২)*

যে আল্লাহর রসূলের চরিত্রে সন্দেহ করে। তাঁর আনীত কোনও আইন পদ্ধতি রীতি-নিতি, চাল-চলন, আদর্শ বা মতামতকে অশ্রদ্ধা ও অপছন্দ করে, ঘৃণা করে বা নিন্দা করে- সেও মুমিন হতে পারে না।

যে দ্বীনে-ইসলামের কোন অংশ নিয়ে -আল্লাহ, রসূল, সাহাবা বা কোন আমল ও আদর্শ (যেমন দাড়ি, পর্দা ইত্যাদি) নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ, মজাক-ঠাট্টা বা উপহাস করে -সেও কাফের। *(কুঃ ৯/৬৫-৬৬)* তদনুরূপ ইল্‌ম ও উলামা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ঠাট্টাকারী -যদিও মজাকছলে সে কথা বলে, তার যথার্থতা ও সত্যতা তার উদ্দেশ্য না হয়, তবুও -সে কাফের হবে। ([26])

যে মুশরিক বা গায়রুল্লাহর ইবাদতকারীকে কাফের মনে করে না কিংবা তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে এতটুকুও সন্দেহ করে -সেও কাফের।

([26]) *কাফের হওয়ার মোটামুটি পাঁচটি কারণ ঃ সত্যের অপলাপ করা বা অবিশ্বাস করা, সত্য প্রত্যাখ্যান করা বা সত্য জানা সত্ত্বেও স্বীকার না করা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা, সন্দেহ করা, সত্য বিমুখ হওয়া এবং সত্যের সাথে কপটতা করা।*

পারলৌকিক শান্তি এবং আল্লাহর তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ ইসলাম। যে ধারণা করে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবীরূপে সমগ্র মানব জাতির জন্য আসার পরও অন্য কোন মত ও পথে আল্লাহর তুষ্টি বা পারলৌকিক শান্তি পাওয়া যায়- সেও কাফের।

'বিভিন্ন নদ-নদীর উৎসমুখ ও প্রবাহ পথ ভিন্ন হলেও সব একই সমুদ্রে গিয়ে মিশে। সকলের মত ও পথ বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য সেই একই বিধাতার সন্তুষ্টিবিধান।' কিন্তু সকল নদী একই মিলনক্ষেত্রে পৌঁছে না। বিভিন্ন সমুদ্রে গিয়ে মিশে, কারো পানি মিঠা, কারো, লবণাক্ত, কারো বা অন্যকিছু। যে নদী মিঠা-সাগরে বা শান্তি-সিন্ধুতে গিয়ে মিলেছে তা একমাত্র ইসলাম নদীই।

'একটি অঙ্ককে বিভিন্ন নিয়মে কষা যায়, উত্তরও একই বা সঠিক হয়।' কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে অঙ্ক কষতে দিয়েছেন তার পদ্ধতি মাত্র একটাই, ইসলাম পদ্ধতি। অন্য কোন মনগড়া 'প্রসেস'-এ উত্তর সঠিক হবে না। *(কুঃ ৩/৮৫)*

'পথ বিভিন্ন হলেও গন্তব্যস্থল একটাই।' এ অন্য কোন সাধারণ গন্তব্যস্থলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যে গন্তব্যস্থলে আল্লাহকে পাওয়া যায় তার জন্য পথ একটাই। এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা টানলে মাত্র একটি রেখাই টানা সম্ভব। দুই বা তার অধিক রেখা টানতে গেলে- হয় তা অপর বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছবে না, নতুবা রেখা সরল হবে না। সেই একটি সরল রেখাই আল্লাহর পথ, ইসলাম। *(কুঃ ৬/১৫৩)*

সকল ঐশী ধর্ম সত্য, তবে তার নিজস্ব সময়ে যদি তা তাওহীদের প্রচারক হয়। যেহেতু সকল ধর্মের মূল এক, সেই হেতু সর্বশেষে সকল মানুষকে একটি ধর্মেরই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। *(কুঃ ৭/১৫৭, ৬১/৬)* সকল ধর্মের নবী ও মহাপুরুষগণ এই ইসলাম ধর্মের নবী ও মহাপুরুষের অনুসরণ করার নির্দেশ তাঁদের অনুগামীদের উপর জারী করে গেছেন। যে মহাপুরুষের কথা তারা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ পায়। *(কুঃ ৭/১৫৭, ৬১/৬)*

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম। এ ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তাঁর নিকট গৃহীত ও স্বীকৃত নয়। যার জন্য মুসলিম অমুসলিমদের সাথে আত্মীয়তা বা বিবাহ-শাদী করতে পারে না। *(কুঃ ২/২২১)* আর তারই জন্য (বিশেষ করে ক্ষতি সাধনের আশঙ্কায়) মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে হত্যা করা হয়। কোন অমুসলিম নারী বা পুরুষ যদি কোন মুসলিম পুরুষ বা নারীকে বিবাহ করতে চায়, তবে তাকে প্রথমে মুসলিম হতেই হবে। তবে আহলে কিতাব (ইয়াহুদ ও নাসারা)দের কোন সাধ্বী নারী যদি কোন মুসলিমকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়, তাহলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও করতে পারে। *(কুঃ ৫/৫)* কিন্তু কোন মুসলিম নারী কোন আহলে কিতাব পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না। কারণ মুসলিম ইয়াহুদী ও নাসারা (আহলে কিতাব)দের নবী হযরত মূসা ﷷ ও হযরত ঈসা ﷷ-এর উপর ঈমান রাখে। কিন্তু তারা মুসলমানদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺএর উপর ঈমান রাখে না।আর ইসলাম চির উন্নত,সে কোথাও নত হয় না।

ইসলাম পূর্ণ মানবতা ও সভ্যতার ধর্ম। যে মানবতা ও সভ্যতা স্বয়ং সৃজনকর্তা মুসলিমকে শিক্ষা দিয়েছেন। যার ছবি কেবল পূর্ণ ইসলামী পরিবেশেই পরিস্ফুটিত হয়। তার অনুমান কোন অসম্পুর্ণ ও ফাসেক মুসলিমের আমলে, কাজে ও ব্যবহারে এবং বিকৃত ঘোলাটে ইসলামী পরিবেশে হয় না। তাই কেবলমাত্র নামধারী মুসলমানদের অবস্থা দর্শন করে ইসলামের রূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা মহাভুল।

প্রাচ্যের মানুষ প্রগতির পথে, মুসলিম অধঃপতনের অতল তলে। কিন্তু তার

পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ তার নিজস্ব অবহেলা, দ্বীনের অনুসরণ নয়। ধর্ম তাকে বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের পথে বাধা দেয় না; বরং উৎসাহিত করে। যদিও দ্বীন বা পরকাল তার আসল লক্ষ্য এবং দুনিয়া তার উপলক্ষ্য মাত্র, তবুও যেহেতু সে সবার সর্বোপরি। সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আবিষ্কার, কারিগরী প্রভৃতির হকদার মুসলিমই বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মুসলিম তার নিজ অবজ্ঞায় দ্বীনও হারিয়েছে এবং দুনিয়াও।

তাছাড়া ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে কুফরী, নগ্নতা, যৌন স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নেমে এলেই কেউ বৈজ্ঞানিক হয়ে যায় না। দেশ থেকে ধর্মের আলো তুলে দিলেই বিজ্ঞানের আলো এসে যায় না। বিজ্ঞান তো সাধনা ও গবেষণার ফল, যা পূর্ণ ধার্মিক হয়েও করা যায়।

মুসলিম পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছৃঙ্খল গতিকে প্রগতি নয়, বরং দুর্গতি ও অধঃগতি মনে করে। যাদেরকে তাদের বিলাস সামগ্রী দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়েছে। মুসলিমের জন্য তো আখেরাত। *(কুঃ ৪৬/২০, বুঃ ৫১৯১)*

ইসলাম এক শাশ্বত ও চিরন্তন ধর্ম। তার প্রতি অনুশাসনই চিরায়ত ও কালজয়ী। মানুষের জাহেলিয়াতির অন্ধত্ব সংস্কার করার উদ্দেশ্যেই তার আবির্ভাব। তার কোন রীতি-নীতিই কুসংস্কার নয়। তার অনুশাসনকে প্রাচীন বা সেকেলে এবং অনুসারীকে প্রাচীনপন্থী বলে নাক সিটকাবার অধিকার কারো নেই। যেহেতু মানুষের রোগ পুরাতন তাই তার প্রতিষেধক ঔষধও পুরাতন। যা চিরকালীন অব্যর্থ।

ইসলামকে শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মা'রেফাত -এ ভাগ করা গোমরাহী। মা'রেফাতে পৌঁছে মানুষের কাছে হালাল-হারাম একাকার হয় অথবা সমস্ত হারাম তার জন্য হালাল হয়ে যায়, শরীয়তের কোন আমল তার উপর ওয়াজেব থাকে না- এই ধারণা রাখা কুফরী। ([27])

আল্লাহর নবী ﷺ-এর মত কামেল আল্লাহর মা'রেফাত কারো হতে পারে না। তবুও তিনি ফরয নামায ছাড়া রাত্রি জেগে নফল ইবাদত করতেন, নফল রোযা রাখতেন, হারাম থেকে কঠিনভাবে পরহেয করতেন। তাঁর এতবড় মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, "তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" *(কুঃ ৩৯/৬৫)*

তারপর তাঁর সাহাবাগণও কামালিয়াত সত্ত্বেও কোন আমল ত্যাগ করেননি। তাহলে যে তাঁদের একটি চুলের বরাবরও নয় তার উপর থেকে শরীয়তের অনুশাসন কি করে উঠে যেতে পারে? তাই শরীয়ত ছাড়া সবকিছু মিথ্যা। শরীয়তের নিয়মপদ্ধতি ছাড়া আর অন্য কিছু গোমরাহী ও বিদআত। শরীয়ত ছেড়ে কামেলের দাবী 'মারফতি' নয় 'মারফুর্তি'। যা ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

ইলমে যাহেরী শরীয়ত ও ইবাদতের ইল্‌ম এবং ইল্‌মে বাতেনী শরীয়ত ও ইবাদতের হিকমত বা যুক্তি জানাকে বলা যায়। এ ছাড়া মুসলিমের জন্য এমন কোন বাতেনী (গুপ্ত) ইল্‌ম নেই, যাতে তার মঙ্গল থাকতে পারে। (বরং অধিকাংশ বাতেনী ইল্‌ম গোমরাহীর কারণ।) যারা শরীয়তের অনুসারীদেরকে ভাসমান পানাড়ি পাতার সহিত তুলনা করে, তারাই আসলে পানিতে ডুবে সর্বনাশগ্রস্ত। সলফে সালেহীনের কলবে কলবে কোন গুপ্ত ইল্‌ম ছিল না, যা ছিল তা প্রচার করে গেছেন। যেহেতু ইল্‌ম বাতেন

---

(২৭) *যেহেতু শিশু, পাগল অথবা ঋতুমতী না হলে মৃত্যু পর্যন্ত আমল ও ইবাদত তার উপর যথা নিয়মে ওয়াজেব থাকে।*

বা গুপ্ত করা অবৈধ ও হারাম। *(কুঃ ৩/১৮৭, ২/১৫৯, সঃ জাঃ ৬৫১৭)*

'ইল্‌মে তাসাওউফ' বলতে যদি আ'মালে কুলুব বা আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসমূহের বিভিন্ন জ্ঞান (যা শরীয়ত সম্মত হয় তা) কে বুঝায় তবে তা গ্রহণীয়। কিন্তু সুফীবাদীদের অবতারবাদ, বৈরাগ্য, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, একাত্মবাদ (স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একাকার ভাবা), 'ফানাফিল্লাহ' (আল্লাহতে বিলীন হওয়া), শরীয়তের আমল পরিত্যাগ, নির্দিষ্ট মনগড়া পদ্ধতিতে আল্লাহর যিক্‌র করা ইত্যাদিতে ইসলামের কোন সমর্থন নেই। বরং এগুলির কোনটি বিদআত, কোনটি শির্ক, কোনটি কুফ্‌র।

ইসলাম রাজনীতি থেকে ভিন্ন নয়। মানুষের জন্য যাবতীয় কল্যাণ-নীতি ইসলামে বর্তমান, যা মানুষের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে ইসলামে আছে ইসলামী রাজনীতি; প্রাচ্যের রাজনীতি ইসলামে নেই।

ইসলাম কোন মতবাদের নাম নয়। ইসলাম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তরফ থেকে মানব-দানবের জন্য অবশ্য মান্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যা অন্যান্য ধর্মসমূহের মত কোন সাধারণ ধর্ম নয়।

ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রচার হয়নি। ইসলামের শত্রুদের এরূপ অপবাদে এবং অপপ্রচারে কোন জ্ঞানী কর্ণপাত করে না। ইসলামে জোর-জবরদস্তি বা বলপ্রয়াগের কোন স্থান নেই। *(কুঃ ২/২৫৬)* বলপ্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসলাম জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির ধর্ম। মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ, শান্তি ও স্বস্তি, সংস্কার, আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের ধর্ম। ইসলামী শরীয়ত আদর্শ ও সচ্চরিত্রতার পরশমণি। ইসলাম সত্য, সুপথ ও সুনীতিযুক্ত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। যার দলীল ও নিদর্শন সূর্যবৎ স্পষ্ট। জ্ঞান ও বিবেকের চক্ষু উন্মীলন করলেই তা যে কেহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

তাছাড়া মন যে বস্তুকে ঘৃণাবোধ করে, যার উপর বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মে, যার সহিত বাস্তব ও সত্যের বিরোধ ঘটে সেই বস্তুর আনুগত্যের উপর বাধ্য করাতে জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইসলাম তো তা নয়।

এ ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা ও জানার পর একমাত্র স্বার্থান্ধ, আত্মগর্বোদ্ধত, পরমতবিদ্বেষী বা স্বৈরাচারী মানুষ ছাড়া কেউ তা বরণ ও গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না।

কিন্তু সত্যের শত্রু সর্বত্র বিদ্যমান। ধর্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মরক্ষা ও শত্রুতার মূলচ্ছেদন করতে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধের আবশ্যকতা ছিল এবং আজও আছে।

স্বেচ্ছায় যে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমরা তাকে সাদরে গ্রহণ করে। তাকে অপাঙ্‌ক্তেয় বা অস্পৃশ্য ভাবে না। অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে- কারো নিকট নিজস্ব কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়; বরং তাতে একজন পথভ্রষ্ট মানুষকে সুপথের দিশা দিয়ে আল্লাহর কাছে মহাপ্রতিদান লাভের আশা করে।

অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য কোন অন্যায় ও যুলুম নয়। মুসলিমদের নিকট থেকে তা আদায় করা হয় না বলে তা বে-ইনসাফী নয় অমুসলিমদের নিকট হতে মাথা পিছু কিছু কর আদায় করা হয় তাদের প্রতিরক্ষার খরচ বাবদ, হিফাযতের উদ্দেশ্যে। এটা তো রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রবাসীর উপর এক অধিকার। আর তা তো অতি সামান্য। কিন্তু মুসলিমদের নিকট থেকে প্রতিবছর তাদের টাকা-পয়সা বা সোনা-চাঁদির আড়াই শতাংশ, ফসলের এক দশমাংস অথবা এক বিংশাংশ (প্রথমে একবার) উটের পঁচিশটির একটি, গরুর ত্রিশটির একটি, ছাগ বা মেষাদির চল্লিশটির একটি প্রতি বছর যাকাত আদায় করা হয়, (এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ কোন আহকামের

কিতাবে দ্রষ্টব্য) যা অমুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশী। এ যাকাত যারা আদায় করতে অস্বীকার করে রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অতএব ইসলাম কোন নির্দিষ্ট জাতির জন্য নয়। বরং সকলের জন্য ন্যায্য অধিকার আদায় করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলাম তো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ধর্ম। আর আল্লাহ কোন দিন কারো প্রতি যুলুম করে না।

কলেমা তাওহীদ ও পাপ

মুসলিম ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমা তওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' -অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ বা উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল বা প্রেরিত দূত। (28)

এর অর্থ জানে, বিশ্বাস করে, স্বীকার করে মুখে পাঠ করে, তার উপর আমল করে এবং তা প্রচার করে। ইখলাস, ভক্তি ও আনুগত্যের সাথে তা সত্যজ্ঞান করে এবং প্রত্যেক গায়রুল্লাহ উপাস্যকে অস্বীকার ও মিথ্যাজ্ঞান করে।

তাওহীদ (একত্ববাদ) মুসলিমের আসল ধর্ম, ধর্মের মূল ভিত্তি। যা না থাকলে কোন আমলের ঘর নির্মাণ হতে পারে না। *(কুঃ ২৫/২৩, ৩৯/৬৫)*

মানুষের প্রকৃতি এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মূলে রয়েছে এই তাওহীদ, আল্লাহকে এক জানা, একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আরাধনা করা, তাঁরই আনুগত্য করা ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁরই নির্দেশমত জীবন পরিচালনা করা। *(কুঃ ৫১/৫৬)*

এই তাওহীদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ যুগে যুগে আম্বিয়া ও রসূলগণকে পৃথিবীর মানব-দানবের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা বহুশ্বরবাদ ও গায়রুল্লাহবাদকে অপনোদন করে একেশ্বরবাদের পতাকা উত্তোলন করে গেছেন। প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষই শুধু এক আল্লাহরই উপাসনার নির্দেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন। *(কুঃ ২১/২৫)*

তাওহীদ তার বিশ্বাসী ও অনুগামীকে বহু পাপের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয়।
আর পাপ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে ঃ-

১- অতি মহাপাপ (আকবারুল কাবায়ের), যেমন শির্ক, তাওহীদবাদী না হওয়া, কুফরী, যেমন মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী বলে অস্বীকার করা, কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার না করা। ফিরিশ্তাকে অবিশ্বাস করা, ভাগ্য অস্বীকার করা ইত্যাদি।

২- মহাপাপ (কাবীরা গোনাহ) যেমন, ব্যভিচার করা, হত্যা করা, চুরি করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি -যার উপর শরয়ী দন্ড নির্ধারণ বা পরকালে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন বা আল্লাহর ক্রোধ বা অভিশাপ প্রকাশ বা ঈমান নাশ হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩- উপপাপ বা লঘুপাপ (সাগীরা গোনাহ) যেমন, যে স্ত্রীলোকের সহিত চিরতরে বিবাহ হারাম নয় তার প্রতি (কামনজরে) তাকানো বা মুসাফাহ ও স্পর্শ করা ইত্যাদি।

অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যদি অতিমহাপাপ, শির্ক বা কুফরী করে থাকে, তবে

---

(২৮) *উল্লেখ্য যে, এই কলেমার অর্থ "আল্লাহ ব্যতীত কোন শাসক বা হুকুমকর্তা নেই" করা নিঃসন্দেহে ভুল, যা নিছক রাজনীতি দৃষ্টিভঙ্গিতেই করা হয়ে থাকে। অবশ্য 'উপাস্য' ইলাহ বা মাবুদের যে ব্যাপক অর্থ তার মধ্যে শাসকও পড়ে কিন্তু ইলাহ-এর অর্থে কেবল শাসক বা হুকুমকর্তা নির্দিষ্ট করে ঐ ব্যাপকতা নষ্ট অথবা গুপ্ত করা বৈধ নয়।*

মুসলিম হওয়ার পরে তওহীদের গুণে অন্যান্য পাপসহ সে পাপও মোচন হয়ে যায়। কারণ, ইসলাম মানুষকে নতুন জীবন দান করে। *(কুঃ ৮/৩৮)* কিন্তু মুসলিম হওয়ার পর যদি তওহীদী মনে শির্ক করে বসে তবে সে পাপ বিনা তওবায় মাফ হবার নয়। আজীবন তওবা না করে যদি শির্কের উপরেই তার মৃত্যু হয় তবে সে চিরস্থায়ী দোযখবাসী হবে। *(কুঃ ৫/৭২)* কারণ, অংশীবাদীদের এ অতি মহাপাপ কোন দিনের জন্য ক্ষমার্হ নয়। *(কুঃ ৪/৪৮)*

যে মুসলিম শির্ক করে না, কিন্তু মহাপাপ করে বসে তবে তওবা করলে মাফ হয়ে যায়। আবার তওবা না করে মৃত্যু হলে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতেও পারেন, আবার ক্ষমা না করে দোযখে শাস্তি ভোগাতেও পারেন।

পক্ষান্তরে যারা পাপ করে প্রচার বা গর্ব করে কিংবা প্রকাশ্যভাবে পাপে লিপ্ত হয়, তাদের মহাপাপ অধিক গুরুতর। তাদেরকে সহজে ক্ষমা করা হবে না।

ছোট শির্ক; যেমন, রিয়া (লোক প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করা) ইত্যাদি যদি অল্প হয়ে থাকে এবং নেকীর ভাগ অধিক থাকে তবে জান্নাতবাসী হবে। রিয়া অধিক করে থাকলে জাহান্নামবাসী হতে হবে।

ছোট পাপ বা লঘুপাপ আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাওহীদের ফযীলতে -মহাপাপ ও অতি মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকলে- ইস্তেগফার ও অন্যান্য ইবাদতের কারণে ক্ষমা করে দেন।

কিন্তু পাঁচটি সময়ে লঘুপাপও মহাপাপে পরিণত হয়;

(১) যদি কেউ তা বারংবার বা অবারিতভাবে করে।

(২) তার প্রতি অবজ্ঞা ও ঐ পাপ কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করে কোন পরোয়া না করে।

(৩) সে পাপ করে মনে মনে আনন্দিত ও তৃপ্ত হয়।

(৪) জনসমক্ষে তা করে গর্বপ্রকাশ করে এবং বন্ধুমহলে ঐ পাপের উপর আত্মপ্রশংসা করে।

(৫) ঐ পাপ কোন আলেম বা অনুসৃত মানুষের দ্বারা ঘটে।

মোট কথা, অতি মহাপাপী চিরকাল দোযখে শাস্তি ভোগ করবে। মহাপাপী, যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং সে জান্নাতবাসী হবে। নতুবা তার পাপ অনুপাতে দোযখের শাস্তি ভুগিয়ে অনন্তর জান্নাতের শান্তি দান করবেন। আর তা হবে তার তাওহীদের গুণে।

মহাপাপী, যে কাবীরা গোনাহ করে অথবা কোন ফরয বা ওয়াজেব আমল ত্যাগ করে তাকে ফাসেক বলা হয়; কাফের বলা যায় না। তবে যদি সে সর্ববাদিসম্মত মহাপাপ (চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান, ঘুস বা সূদ খাওয়া ইত্যাদি) কে হারাম বা মহাপাপ জেনেও হালাল ও বৈধ মনে করে, অথবা কোন সর্ববাদিসম্মত ফরয বা ওয়াজেব আমলকে জানা সত্ত্বেও ইনকার বা অস্বীকার করে, তবে সে কাফের। *(শঃ তাঃ ৩৫৫)*

অবশ্য নামায ত্যাগকারী সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বহু উলামার মতে যে নামায ফরয জেনেও ত্যাগ করে, ইনকার না করলেও সে কাফের। *(আঃদাঃ ৪৬৭৮, তিঃ২৫২৯, ইঃমাঃ ১০৭৮)*

ঈমানের কোন রুক্ন আল্লাহর (সঠিকরূপে প্রমাণিত) কোন নাম বা গুণ ইত্যাদিকে সে অস্বীকার করে সে কাফের। যারা কাফের বলে প্রমাণিত ও পরিচিত তাদেরকে যে কাফের মনে না করে অথবা সন্দেহ করে সেও কাফের। *(মুঃ ৬০)*

ফাসেক গোনাহের শাস্তি ভোগার পর তাওহীদের ফযীলতে জান্নাতবাসী হবে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে তার শাস্তি মকুবও করতে পারেন। কিন্তু কাফের ও মুশরিক চিরস্থায়ী দোযখবাসী হবে।

ফাসেক ইমামের পিছনে মুসলিম নামায পড়ে (নামায হয়ে যায়, কিন্তু ফাসেককে ইমাম নির্বাচন করা ঠিক নয়) এবং তার মৃত্যুর পর তার গোসল কাফনও করে, তার জন্য জানাযা পড়ে ও দুআ করে এবং মুসলমানদের করস্থানে তাকে দাফন করে।

কিন্তু শির্কে আকবারের মুশরিক এবং কাফের, যারা দ্বীনে ইসলাম থেকে খারিজ ও মুরতাদ্ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় তার জন্য (এবং সঠিক মতে বেনামাযীর জন্যও মুসলিম জানাযা পড়তে বা দুআ করতে পারে না। *(কুঃ ৯/১১৩)* মুসলমানদের গোরস্থানে তাদের দাফন করাও যায় না। তার মুসলিম (তাওহীদবাদী) সন্তান তার উত্তরাধিকারীও হয় না। যেমন, সে তার তাওহীদবাদী পিতার উত্তরাধিকারী হয় না। *(বুঃ ১৫৮৮, মুঃ ১৬১৪)*

তার জীবনে মুসলিম তার যবেহকৃত পশুর মাংসও খায় না। কোন তাওহীবাদী নারীর সাথে তার বিবাহও হয় না। বিবাহ হয়ে থাকলে তালাক হয়ে যায়। *(কুঃ ৬০/১০, ২/২২১)*

ইসলামী সংবিধানে তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। অবশ্য যদি সে তওবা করে তবে তা মঞ্জুর হয়।

জ্ঞাতব্যের বিষয় যে, ইসলামী কোন বড় শাস্তি অপরাধীকে কেবলমাত্র শাসক গোষ্ঠীই দিতে পারে (যাতে উল্টা ফিতনার সৃষ্টি না হয় তাই)। তাছাড়া ছোটখাটো শাস্তি তো অবশ্যই দিতে পারে।

যে ছোট শির্ক, কোন স্বার্থের খাতিরে বাহ্যিকভাবে ইসলামী আমল করে, মুখে যা বলে অন্তরে তার বিপরীত থাকে, উপরে উপরে ইসলামের জয়গান গায় কিন্তু ভিতরে তার পরাজয়ের আশা রাখে- সে মুনাফিক। মুনাফিকের প্রত্যয়গত গুণ হল ঃ রসূল ও তাঁর আনীত শরীয়তকে মিথ্যা জানা অথবা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, শরীয়তের পরাজয়ে মনে মনে আনন্দ ও বিজয়ে মনঃকষ্ট বোধ করা।

এর কর্মগত গুণ হল ঃ কথায় কথায় মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, আমানত নষ্ট করা, বিবাদে অশ্লীল বকা ইত্যাদি। *(বুঃ ৩৩, মুঃ ৫৯)*

মুসলিম যেহেতু তার অন্তরের খবর সঠিক নির্ণয় করতে পারে না, তাই তার বাহ্যিক রূপ দেখেই তার সহিত মুসলিমের মত ব্যবহার করে, যেমন ফাসেকের সাথে করে। *(ফঃউঃ ১/৫১৮)* আবার যারা বাহ্যতঃ মুসলিম যাদের অন্তরে কলেমা স্থান পায়নি, অথচ মুখে কলেমা পড়ে কিন্তু তার অর্থে বিশ্বাস নেই। আবার কোন কুট উদ্দেশ্যে ইসলামী আমল বাহ্যিকভাবে করে থাকে, তবে সে কাফের। মুসলিম তার জন্যও দুআ ও ইস্তেগফার করে না এবং জানাযা পড়ে না। *(কুঃ ৯/৮৪)*

যদি কাউকে জোরপূর্বক কুফরী অথবা শির্কের উপর মজবুর করা হয়, তাহলে যদি তাতে সে মুখে ও অন্তরে সম্মত ও রাজী হয়ে যায় তবে সে মুরতাদ্ ও কাফের। কিন্তু হত্যা বা কষ্ট ও নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য যদি সে শুধুমাত্র মুখে বাহ্যিকভাবে সম্মত হয় এবং অন্তর আল্লাহর ঈমান ও ভক্তিকে পরিপূর্ণ ও অবিচলিত থাকে, তাহলে সে কাফের হবে না। *(কুঃ ১৬/১০৬)*

যদি বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবেও সম্মত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং কুফরীর কাছে নতি স্বীকার না করে তবে তাও বৈধ। তবে যদি তার বাহ্যতঃ মজবুরীর কুফরীতে দ্বীনের কোন ক্ষতি না হয়, বরং জীবিত থাকা কোনও মঙ্গলদায়ক হয়, তবে অন্তরে ঈমান গুপ্ত রেখে বাহ্যিকভাবে সম্মত হওয়া ভালো। কিন্তু যদি তার এই সম্মতি এবং অধৈর্যে ইসলামের ক্ষতি হয়, তাহলে খুন হয়ে গেলেও সবর করা এবং কুফরীর কাছে নতি স্বীকার না করা ওয়াজেব। *(ফঃ উঃ ২/৩৫)*

নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য মুক্তির দাবী

মুসলিম কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে, সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী, কিংবা শহীদ, অথবা মরহুম, অথবা মাগফুর।

বলতে পারে, 'যে আল্লাহকে এক মা'বুদ জেনে (শির্ক না করে) ইবাদত করবে সে জান্নাতী।' কিন্তু 'অমুক ইবাদত করে অতএব সে জান্নাতী' -তা বলতে পারে না। কারণ, হতে পারে সে ইবাদতের মাঝে এমন কোন কাজ (যেমন রিয়া) করে বসেছে, যাতে সে জান্নাত যেতে পারবে না।

তেমনি বলতে পারে, 'যে আল্লাহর না-ফরমানী করবে সে জাহান্নামী।' কিন্তু 'অমুক আল্লাহর নাফরমানী করে তাই সে জাহান্নামী'-তা বলতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তাঁর নিজ দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অথবা সে তওবা করতে পারে। *(আঃদাঃ ৪৯০১)*

তেমনি বলা যায়, 'যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে প্রাণ হারায় সে শহীদ।' ([29]) কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি যে জিহাদে প্রাণ দেয়, তাকে শহীদ বলা যায় না। কারণ, তার ঐ জিহাদে নিয়ত কি ছিল সে তো আল্লাহই জানেন। *(মুঃ আঃ বুঃ ২৮৯৮, মুঃ ১১৪)*

তদনুরূপ মরহুম ও মাগফুর কে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে অনেকের মতে শহীদ, মরহুম বা মগফুর কোন নির্দিষ্ট মৃত ব্যক্তির জন্য বাহ্যিকভাবে আশা, কামনা অথবা দুআর অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। *(ফঃ উঃ ৩/১৩৫)*

কিন্তু এর জন্য সালাফী দুআ যেমন, 'রাহিমাহুল্লাহ, রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, গাফারাল্লাহু লাহু' ইত্যাদি ব্যবহার করাই ঠিক। ([30])

পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ যাকে জাহান্নামী অথবা জান্নাতী (যেমন, আশারাহ মুবাশশারাহ) বা শহীদ বলে নির্দিষ্ট করেছেন, মুসলিম তাদেরকে সুনিশ্চিতভাবে তাই মনে করে। *(মুঃ আঃ ২/৪৯)* কারণ তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে অহী মারফতই এ খবর দিয়েছেন।

আল্লাহর প্রেরিত আম্বিয়া কেরামগণের জন্যও মুসলিম জান্নাতী বলে সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

তেমনি মুমিনগণের কোন মুমিনের নেক কাজের উল্লেখ করে প্রশংসা অথবা কাফেরের মন্দ কাজের উল্লেখ করে দুর্নাম করে (এবং তা জান্নাত ও জাহান্নামের সাক্ষীস্বরূপ হয়) তবে সে মুমিনকে জান্নাতী এবং সে কাফেরকে জাহান্নামী বলে মানা যেতে পারে। *(বুঃ ১৩৬৭, মুঃ ৯৪৯, মুঃ আঃ ৩/৪১৬, ইঃ মাঃ ৪২২১, শঃ তাঃ ৪২৬)*

([29]) *জ্ঞাতব্য যে, যারা আত্মীয় সম্পদের প্রতিরক্ষায়, কিংবা পেটের রোগে, পানিতে ডুবে অথবা আগুনে পুড়ে, মাটি চাপা পড়ে, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে, টি-বি, প্লেগ ও প্লুরিসী রোগে মৃত্যুবরণ করে তাদেরকেও শহীদ বলা হয়েছে। তবে নির্দিষ্টভাবে নয়।*

([30]) *প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম' (ﷺ), অধিকাংশ উলামা শেষ নবীর জন্য ব্যবহার করেন। কিন্তু অন্যান্য আম্বিয়াগণের উপর দরূদ ও সালাম পড়ার সময়ও তা ব্যবহার করা যায়। তেমনি 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' (রাঃ) সাহাবীগণের ক্ষেত্রে আর 'রাহিমাহুল্লাহ' তাবেয়ী বা পরবর্তী কোন সলফের জন্য ব্যবহৃত। পরন্তু 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কোন তাবেয়ী বা পরবর্তী কোন সলফের জন্য ব্যবহার কোন ক্ষতির নয়। তবে প্রয়োগ ভিন্ন রকম হলে অসাহাবীকে সাহাবী বলে ভ্রম হয় না।*

তদনুরূপ কেবলমাত্র সন্দেহ ও ধারণা করে মুসলিম কাউকে কাফের, মুশরিক, বা মুনাফিক বলতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কুফ্‌র, শির্ক বা নিফাক স্পষ্টরূপে প্রকাশিত ও সঠিকরূপে প্রমাণিত হয়েছে। *(কুঃ ১৭/১১-১২)*

মানুষকে এমন প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ হওয়া স্বাভাবিক। যেহেতু এই পাপে তার নিজস্ব এখতিয়ার থাকে, তাই তার প্রতিফল ও সাজা তাকে ভুগতে হয়। তবে আল্লাহ বড় দয়াবান ক্ষমাশীল। বান্দা তার পাপের ক্ষমা তাঁর কাছে চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। *(কুঃ ৪/১১০)* বরং বান্দার ক্ষমা প্রার্থনায় তিনি খুশী হন। *(মুঃ ২৭৪৪)*

কিন্তু তাঁর ক্ষমা পাওয়া বা তওবা কবুল হওয়ার কয়েকটি পূর্বশর্ত রয়েছে ঃ-

১। পাপ বা অপরাধ স্বীকার করা।
২। বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে তাঁরই উদ্দেশ্যে তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। *(কুঃ ৩/১৩৫)*
৩। কৃত পাপের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।
৪। সে পাপকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা।
৫। পুনর্বার সে পাপ না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা। *(কুঃ ৩/১৩৫)*
৬। তওবার নির্ধারিত সময়ে তওবা করা। অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এবং পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে তওবা করা। *(কুঃ ৬/১৫৮)*

আবার পাপ যদি বান্দার হক্কে (কোন মানুষের অধিকারে) হয়ে থাকে যেমন, চুরি, হত্যা, বলাৎকার, পরচর্চা বা গালি ইত্যাদি, তাহলে উপর্যুক্ত শর্তাবলী ছাড়াও আরো একটি শর্ত পূরণ হতে হবে। আর তা এই যে, চুরির জিনিস তার মালিককে যে কোন প্রকারে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কারো জমি না হক লিখিয়ে নিলে অথবা জবর-দখল করে থাকলে তা মালিককে ফেরৎ দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যার অধিকারে অপরাধ করেছে তার নিকট আগে ক্ষমা চাইতে হবে।

নিম্নোক্ত বিভিন্ন হেতুতে বিভিন্ন পাপ ক্ষয় হয়ে থাকে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়ঃ

১। পাপ থেকে তওবা করলে। *(কুঃ ২/১৬০, ১৯/৬০, ২৫/৭০)*
২। ইস্তেগফার করলে। (তওবার প্রায় সমার্থবোধক শব্দ)
৩। নেকী, পুণ্য বা ভালো কাজ করলে। *(কুঃ ১১/১১৫)*
৪। অসুখ, মসীবত বা কোন বিপদে পড়লে। *(বুঃ ৫৬৪৮, মুঃ ২৫৭২)*
৫। মরণের পর, আত্মীয়-স্বজন বা কোন মুসলিমের দুআ ও ইস্তেগফারে।
৬। কবরের আযাবে।
৭। তার নামে কেউ সদ্‌কা বা হজ্জ করলে।
৮। কিয়ামতের কঠিন সংকটের বিভিন্ন কষ্ট ভোগে।
৯। পুলসিরাত পার হলে। *(বুঃ ২৪৪০। মুঃ আঃ ৩/১৩)*
১০। কারো সুপারিশ বা শাফায়াতে।
১১। করুণাময় আল্লাহর রহমতে। *(কুঃ ৪/৪৮, শঃ তাঃ ৩৬৭)*

ইবাদত বা আমল

বান্দার প্রত্যেক গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন তা করা এবং যা অপছন্দ করেন ও যাতে অসন্তুষ্ট হন তা না করার নাম ইবাদত।

আল্লাহ তাআলা জিন ও ইনসানকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ৫১/৫৬)* এই ইবাদত অন্তরে, রসনায় এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারায় পাঁচটি বিধিনিয়মে সম্পন্ন হয়ে থাকে ঃ

১। ফরয বা ওয়াজিব ঃ যা অবশ্য করণীয় ও অপরিহার্য; যা ত্যাগ করলে শাস্তি হয়।

২। সুন্নত ([31]) ও মুস্তাহাব ঃ যা করলে পুণ্য হয়, না করলে পাপ বা শাস্তি হয় না।

৩। মুবাহ ঃ যা করা , না করা উভয়ই সমান। যাতে পাপ-পুণ্য নেই।

৪। মকরুহ ঃ যা না করলে পুণ্য হয় এবং করলে পাপ ও শাস্তি হয় না।

৫। হারাম ঃ যা অবশ্য অকরণীয় ও পরিহার্য। করলে পাপ ও শাস্তি হয়।

এই ইবাদত মঞ্জুর ও মকবুল হবার দুটি শর্ত রয়েছে ঃ ([32])

১। আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান ও ইখলাস। অর্থাৎ তাঁকে তাঁর সৃষ্টি ও প্রতিপালনে তাঁর নাম ও গুণাবলীতে এবং ইবাদত ও উপাসনায় এক বলে মানা এবং ঐ বিষয়ে তাঁর কোন অংশী না করা। শুধুমাত্র তাঁরই তুষ্টি বিধানের জন্য ইবাদত করা। অতএব যদি কেউ লক্ষ টাকা দান করে, কিন্তু আল্লাহ্ আছে বলে বিশ্বাস না করে অথবা কাউকে তাঁর শরীক মানে অথবা মানুষের কাছে সুনাম ও প্রশংসা নেবার উদ্দেশ্যে দান করে, তাহলে সে ইবাদত (দান) মকবুল বা গ্রহণীয় নয়। *(কুঃ ১৮/১১০)*

২। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অনুকরণ ও অনুসরণ। অর্থাৎ তিনি যে নিয়মে ও সময়ে যে ইবাদত করে গেছেন বা শিখিয়ে গেছেন ঠিক সেই নিয়মানুযায়ীই হতে হবে। অতএব কেউ যদি ভিন্ন পদ্ধতিতে (অথবা দিলকাবায়) নামায পড়ে, অথবা দুই সিজদার স্থানে এক বা তিন সিজদা করে, অথবা এক নামাযের সময় অন্য নামায কিংবা অসময়ে পড়ে, তবে সে ইবাদতও (নামায) মকবুল নয়; এবং তদনুরূপ সকল ইবাদত।

মূলতঃ ইবাদত নিষিদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীয়তের কোন নির্দেশ বা সম্মতি পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ইবাদত করা যায় না। করলে তা বিদআত বলে গণ্য হয়।

কিন্তু খাদ্যে ও লেবাসে মূলতঃ সবই বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অবৈধতা বা হারাম হওয়ার প্রসঙ্গে কোন বিধিনিষেধ পাওয়া যায়। তাই ইবাদত করার জন্য প্রথমে তার নির্ভরযোগ্য দলীল চাই। দলীল না থাকলে যে কোনও ইবাদত নিষিদ্ধ। কিন্তু খাওয়া ও পরা ইত্যাদিতে কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। অবশ্য তা অবৈধ বা হারাম মানার সময় দলীল একান্ত জরুরী।

মুসলিম আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর প্রতি প্রেম, ভক্তি, ভয় ও আশা রেখে। কেবলমাত্র (তাঁকে) ভালোবেসে ও ভক্তি করে বা কেবলমাত্র (তাঁকে বা জাহান্নামকে) ভয় করে

---

(৩১) *এই পরিভাষাটি ফকীহগণের নিকট, মুহাদ্দেসীনদের নিকটে সুন্নাত বা সুন্নাহ, রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রত্যেক কর্ম, বাণী, অনুমতি ও আদর্শকে বলে। যা ফরযও হতে পারে এবং মুস্তাহাবও।*

(৩২) *ইবাদতের জন্য পবিত্রাদির শর্ত আহকামের কিতাবে দ্রষ্টব্য।*

অথবা শুধুমাত্র (তাঁর রহমত, ক্ষমা বা জান্নাতের) আশা রেখে তাঁর ইবাদত করে না। বরং এই সমস্ত গুণকেই অন্তরে রেখে তাঁর ইবাদত করে। *(কুঃ ৭/৫৬, ৩২/১৬)* সুতরাং ইবাদতের রুক্ন চারটি ঃ প্রেম বা ভক্তি, বিনতি ও মিনতি, ভয় ও ভীরুতা এবং আশা ও আকাঙ্খা। এই চারটি রুক্নকে অন্তরে স্থান না দিয়ে কোন ইবাদত করলে তা শুদ্ধ হয় না।

মুসলিমের আমলে সালেহ, নেককাম বা ভালো কাজকে তখনই সালেহ, নেক, সৎ বা ভালো বলা হবে যখন তাতে উপর্যুক্ত ইবাদতের দুটি শর্ত পূরণ হবে। প্রথমতঃ ইখলাস, বিশুদ্ধ অন্তর বা নিয়ত ঠিক রাখা। এবং দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত (মুহাম্মাদী তরীকা) অনুযায়ী হওয়া। অতএব যদি কোন কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়, সুনাম সুখ্যাতি, যশ, স্বার্থ, লোকপ্রদর্শন, চিত্তবিনোদন, (পর্বাদিতে) আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে হয়, অথবা সে কাজ যদি শরীয়তী নিয়ম মাফিক না হয়, তাহলে তাকে নেক আমল বা ভালো কাজ বলা হবে না। মানুষের দৃষ্টিতে ভালো হলেও আল্লাহর নিকট তা ভালো নয়। যেমন, নামায পড়া সবার দৃষ্টিতে খুব ভালো কাজ। কিন্তু নামায যদি সুনাম নেবার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে (যেমন, নামায ধরে বিবাহের উদ্দেশ্যে কিংবা নামাযী মনিবের সুদৃষ্টি বা অনুগ্রহ পাবার আশায়, কিংবা কোন নেতৃত্ব লাভের আশায় প্রভৃতি) অথবা নামায যদি চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে (কেবল ঈদের দিনে) হয়, অথবা অপবিত্র স্থানে অথবা গোরস্থানে পড়া হয়, অথবা দুয়ের স্থানে তিন অথবা বিপরীত অথবা রুকু সিজদা কম করে অথবা বেশী করে অথবা একেবারেই (শক্তি থাকা সত্ত্বেও) না করে 'দিল-কাবা'য় নামায পড়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে নামাযকে ভালো কাজ বা নেক আমল বলা যাবে না। এ ধরনের আমলের বদলা আল্লাহ দুনিয়াতেই প্রদান করে থাকেন। *(কুঃ ১১/১৫)*

তদনুরূপ সালেহ, নেক, সৎ বা ভালো লোক সেই, যে উল্লেখিত দুই শর্ত ভিত্তিক আমল বা কর্ম করে থাকে।

মুমিন আল্লাহর তুষ্টি বিধান ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করে না। কারণ, সে ইবাদত শির্কে আসগর (ছোট শির্কে) পরিণত হয়। *(কুঃ ৯৮/৫, মুঃ ২৯৮৫)*

দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করে আল্লাহর যথার্থ ইবাদত করার লক্ষ্যে। পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য, দ্বীন প্রচারের জন্য। নিজস্ব কোন স্বার্থ, পার্থিব সম্পদ, খ্যাতি বা যশ অর্জনের জন্য নয়। *(আঃ দাঃ ৩৬৬৪, ইঃ মাঃ ২৫২, মুঃ আঃ ২/৩৩৮)*

মুসলিমের আসল লক্ষ্য পরলোকে শান্তি ও সুখ উপভোগ করা। ইহলোকে সে হারল কিংবা জিতল; কিন্তু পরলোক তাকে জিততেই হবে। ইহলোক কেবল তার উপলক্ষ্য মাত্র। *(কুঃ ৪/৪৭)* পরলোকের সুখ ফল উৎপাদনের ক্ষেত্র মাত্র। *(তিঃ ২১৯১)*

তাই মুসলিম ক'দিনের পার্থিব জীবন ও তার সাজ-সরঞ্জামে বেশী মাথা ঘামায় না। ভাবে শুধু চিরস্থায়ী আখেরাতের কথা। তবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে অবশ্যই শিখে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে দুনিয়া ব্যবহার করে। আবার পার্থিব সুখ সম্ভোগ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করে না। *(কুঃ ২৮/৭৭)*

তবে দ্বীন ভুলে বিলাসে মত্ত হয় না। দুনিয়াকে আখেরাতের জন্য ব্যবহার করে কিন্তু আখেরাতকে (দ্বীনকে) দুনিয়ার জন্য কোনক্রমেই ব্যবহার করে না। যে পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য চায় তাকে তাই প্রদান করা হয়; কিন্তু তার জন্য পরকালের কোন অংশ থাকে না। *(কুঃ ১১/১৫-১৬)*

২য় অধ্যায়

শির্ক অর্থাৎ অংশ করা বা শরীক করা। ইসলামে শির্ক বলা হয় ঃ আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণাবলী (যে অর্থে কেবল তার জন্যই ব্যবহৃত) অথবা তাঁর অধিকার ও ইবাদতে কাউকে শরীক করা।

১। সত্তায় কাউকে শির্ক করার অর্থ ঃ আল্লাহকে কারো থেকে অথবা কাউকে আল্লাহ থেকে উৎপত্তি মানা। কাউকে আল্লাহর পিতা, পুত্র, কন্য বা জ্ঞাতি মানা।

অথবা তাঁর জগৎ সৃষ্টিতে, তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায়, রুজিদান, মুক্তিদান ও অন্যান্য দানে কাউকে শরীক, সহায়ক বা সাহায্যকারী, সমকক্ষ বা সমতুল মানা। যেমন খৃষ্টানদের শির্ক ঃ হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র, শরীক ও আল্লাহ্ মানা। মজূসীদের শির্ক ঃ জ্যোতিকে ইষ্টের এবং তমসকে অনিষ্টের মালিক মানা। মুসলিমদের (?) শির্ক ঃ কিছু ফিরিশ্তা, জিন বা আওলিয়াকে বিপত্তারণ ও দাতা মানা। অন্যান্যদের ঃ এক এক বিষয়ের এক এক প্রভু বা মালিক কোন সৃষ্টিকে নির্বাচিত করা।

অথবা তাঁর কর্মকে অস্বীকার করা, তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, নাস্তিক্য, প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, একাত্মবাদ ইত্যাদি।

অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করা- সত্তায় শির্ক। আর এই সত্তায় শির্ক সবার চেয়ে মারাত্মক।

২। তাঁর নাম ও গুণাবলীতে শির্ক ঃ অর্থাৎ, যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট যেমন, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, অন্তর্যামী, পরম দয়ালু, মহাদাতা, প্রবল পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ প্রভৃতি, যে অর্থে তাঁর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তাতে অন্য কাউকে শরীক করা। তাঁর কোন গুণকে সৃষ্টির গুণের সাথে তুলনা করা। যেমন, কাউকে অন্তর্যামী বা গায়বের খবর জানে বলে বিশ্বাস করা অথবা কাউকে সন্তান দিতে পারে, বিপদ দূর করতে পারে বলে মনে করা।

অথবা তাঁর হাত পা চক্ষু ইত্যাদি আমাদের মত বা কারো মত মনে করা। অথবা তাঁর নামাবলীকে ধাতু বানিয়ে তা থেকে বাতিল উপাস্যের নাম উৎপত্তি করা। যেমন, আযীয থেকে উয্যা, মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি। যে গুণ আল্লাহর জন্য যে অর্থে ব্যবহৃত সেই গুণ যখন কোন সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন সেই অর্থ আর থাকে না। অতএব আল্লাহর দেখা আর মানুষের দেখা, আল্লাহর শোনা, বলা, জানা, হাত-পা, চক্ষু এবং মানুষের শোনা, বলা, জানা, হাত-পা চক্ষুর মধ্যে কোন তুলনাই নেই, কোন মিল নেই। সাদৃশ্যই নেই। আল্লাহর ঐগুলি গুণ। কিন্তু মানুষের ঐগুলি গুণ হলেও তা আল্লাহর সৃষ্ট।

আল্লাহর নাম 'আল-আযীয, আল-রাউফ, আল-রাহীম' ইত্যাদি। কোন মানুষও আযীয, রাউফ বা রাহীম ইত্যাদি হতে পারে। কিন্তু দুই আযীযের অর্থ আপাতদৃষ্টিতে এক হলেও উভয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য। সে আযীয এ আযীয নয়, যদি কেউ এক মনে করে তবে সে মুশরিক। এ বিষয়ে আরো কিছু কথা যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর অধিকার ও ইবাদতে শির্ক করার অর্থ ঃ আল্লাহর যাবতীয় গুণের যে দাবী এবং সেই অনুযায়ী তাঁর যে অধিকার তাতে কাউকে শরীক বা অংশী স্থাপন করা।

আল্লাহ সব কিছুরই সৃজনকর্তা। যিনি সব কিছু সৃজন করেছেন তাঁকেই এ জগতের নিয়ন্তা, পরিচালক। নিয়ামক, বিধানকর্তা এবং শাসক হওয়া উচিত। আর যিনি এত কিছু গুণের অধিকারী, তিনিই হবেন সর্বপ্রকার আরাধনা, উপাসনা, ইবাদত বা বন্দেগীর অধিকারী। এই সার্বভৌম অধিকারে কাউকে শরীক করলে ইবাদতে শির্ক হয়।

অতএব কারো জন্য নামায, সিজদা, কুরবানী করা, কারো নামে নযর মানা, কারো কাছে দুআ বা প্রার্থনা করা, সুপারিশ চাওয়া, কাউকে ভয় করা -যেমন আল্লাহকে করা হয়, ভালোবাসা -যেমন আল্লাহকে বাসা হয়, কারো কাছে আশা রাখা -যেমন তাঁর কাছে রাখা হয়, ইত্যাদি ইবাদতে শির্ক।

এই শির্ক জাহেলিয়াতের শির্ক। ইসলাম-প্রাক্কালে মক্কাবাসীরা এই শির্ক করত। যাকে শির্কে আকবার বা বড় শির্ক বলা হয়েছে। এ কালের কবুরীদের শির্ক এই শির্ক। যার কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত কিছু ছোট শির্কও রয়েছে, যা নেককার পরেহেযগার বা সৎলোকদের দ্বারায় হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ইবাদতকারী যদি ইবাদতের প্রথম শর্ত অর্থাৎ ইখলাস হারিয়ে ফেলে, তাহলে এই শির্ক হয়। অতএব লোক প্রদর্শন (রিয়া), কারো মন রক্ষা, মনোরঞ্জন, মনস্তুষ্টি বা চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা কোন স্বার্থোদ্ধার, সম্পদ, সম্মান, প্রশংসা বা পদলাভের জন্য আল্লাহর ইবাদত করা, তদনুরূপ উল্লেখিত কোন কারণে ইবাদত ত্যাগ করা, যেমন ঠাট্টার ভয়ে দাড়ী না রাখা, নারীদেরকে পর্দানশীন বা বোরকাবৃত না করা ইত্যাদি ছোট শির্ক। ([33])

কথায় শির্ক ছোট শির্ক। যেমন, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম খাওয়া। 'আল্লাহ আর তোমার ভরসা' অথবা এইরূপ কোন কথা বলা ছোট শির্ক। আবার প্রত্যেক ছোট শির্কই অন্তরের বিশ্বাসের গাঢ়তা অনুযায়ী বড় শির্কও হতে পারে। একথাও যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

প্রবৃত্তিপূজা বা মনের ইবাদত ঃ আল্লাহ জীবন দান করেছেন, প্রবৃত্তি এবং মনও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই প্রবৃত্তি ও মন যদি তার খালিক ও মালিকের অনুগত না হয়, অন্য কথায় মানুষ যদি তার প্রবৃত্তি ও মনের বশবর্তী হয়, আল্লাহর অনুশাসনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যদি সে মন ও প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেয় এবং মন যেমন বলে তেমনি চলে, অথচ চলা উচিত ছিল, যেমন তার সৃষ্টিকর্তা বলেন। মন যা হালাল ও বৈধ ভাবে, তাই খায় ও করে এবং যা হারাম ও অবৈধ (অরুচিকর) ভাবে, তা খায় না বা করে না। তাহলে ঐ মন ও প্রবৃত্তিকে আল্লাহর আসনে বসানো হয় এবং নিজ কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। *(কুঃ ২৫/৪৩, ৪৫/২৩)*

অনুরূপভাবে নিজের সুখ-শান্তি এবং সম্পদলাভের কারণ নিজেকেই মনে করা ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তিকে নিজস্ব চেষ্টা, পরিশ্রম, প্রয়াস ও সাধনারই ফল মনে করা নিজের পূজা বা আত্মপূজা হয়। কারণ, এ সবের দাতা একমাত্র আল্লাহই। কিন্তু তাকে তা না মেনে নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমকে দাতা মনে করলে তা শির্কের অন্তর্ভুক্ত হয়। তদনুরূপ ধন-সম্পত্তি ও টাকা-পয়সাকে অতিরিক্ত ভালোবাসা, তাকেই সর্বশক্তিমান ও সর্বসুখের মূল

---

(৩৩) *অনুরূপভাবে কোন স্বার্থে লোক (বা কেবল স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোককে) দেখাবার উদ্দেশ্যে, কারো ভয়ে বা প্রতিশোধমূলক (যেমন যায়েদ তার স্ত্রীকে শরয়ী পর্দা করে। খালেদ যায়েদের স্ত্রীকে দেখতে পায়না বলে সেও তার স্ত্রীকে শুধুমাত্র যায়েদ থেকে পর্দা করে, এরূপ) উদ্দেশ্যে পর্দা করা রিয়াও ছোট শির্কের পর্যায়ভুক্ত। এই ধরনের শির্ককে নিয়তের শির্ক বলা হয়।*

ভাবা, 'অর্থেই সার্থকতা নইলে পরে ব্যর্থতা' মনে করা বা অর্থকেই সবকিছু ভাবা অর্থ লোভীদের শির্ক। কারণ সর্বশক্তিমান তো আল্লাহ। *(বুঃ ২৮৮৬)*

এমনিভাবে শয়তান, যাদুকর, গণক, নির্মিত প্রতিমা, চিত্রিত মূর্তি, কবর, ফিরাউনী বা নমরূদী শাসক, আল্লাহর পথে বাধা দানকারী নেতা, খোদাদ্রোহী শক্তি বা প্রতিষ্ঠান, মানুষের মনগড়া কানুন, গায়ের ইলাহী আদালত, এক কথায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত কোনও সৃষ্টির আনুগত্য ও পূজা তাগূতের পূজা। অনুরূপভাবে গায়বী বা ভবিষ্যৎ খবরের দাবীদার ব্যক্তি, শরীয়ত বিরোধী আলেম, পীর বা বুযুর্গ এবং সেই সকল পূজ্যমান ব্যক্তি যারা ঐ পূজায় তুষ্ট হয়, তারাও তাগূতের মধ্যে গণ্য।

এই তাগূতকে অস্বীকার ও পরিহার করতে মুমিন আদিষ্ট হয়েছে এবং শক্ত হাতল; একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার এবং তাঁরই উপাসনা করার উপকরণ ধারণ করতে এবং তাঁর কোন অধিকার নষ্ট না করতে উপদিষ্ট হয়েছে। *(কুঃ ২/২৫৬, ৪/৬০, ১৬/৩৬)*

সেই মানুষ বড় আদর্শ ও চরিত্রবান যে অপরের হক বা অধিকারের পূর্ণ খেয়াল রাখে। ঘর-পর ছোট-বড় সকলের হক যথাযথভাবে আদায় কর। কিন্তু যে অপরের অধিকার আদায় করে না বা হককে না হক করে, তাকে সমাজ যালেম বা অত্যাচারী বলে। আর এই হক মারাকে যুলুম বলে।

যত রকমের অধিকার মানুষের জানা তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় অধিকার তাঁর যিনি মানুষকে জীবন দান করে জীবন ধারণের উপকরণ প্রদান করেছেন। তাই তাঁর অধিকার যে বিনষ্ট করে সে সৃষ্টির সবচেয়ে বড় যালেম। তাঁর হক তাঁকেই একমাত্র উপাস্য মানা। *(বুঃ ৭৩৭৩, মুঃ ৩০)* কিন্তু তাঁর উপাসনায় বা ইবাদতে অন্য কোন নবী, অলী, ফিরিশ্তা, জিন, কবর, মাটি বা পাথরকে শরীক বানিয়ে মানুষ যে অন্যায় ও যুলুম করে তার চেয়ে বড় যুলুম আর কিছু নেই। আল্লাহ পাক লোকমান হাকীমের উক্তি তাঁর কালামে বলেন, "নিশ্চয় শির্ক বড় যুলুম।"(চরম অন্যায় ও সীমালংঘন।) *(কুঃ ৩১/১৩)*

শির্ক জঘন্যতম অপরাধ। এ জন্যই তাকে 'আকবারুল কাবায়ের' বা বৃহত্তম পাপ বলা হয়েছে। *(কুঃ ৪/৪৮, বুঃ ৫৯৭৬)* কারণ, তা আল্লাহর অধিকারে অনুচিত অপকর্ম করা। যাতে এই পাপীর প্রবৃত্তিগত কোন লাভও হয় না।

এ পাপ এত নিকৃষ্ট মহাপাপ যে, আল্লাহ পাক তা কোন দিনই (বিনা তওবায়) ক্ষমা করবেন না। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য পাপে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ এই পাপে লিপ্ত হয় সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। *(কুঃ ৪/১১৬)*

একজন সুরুচিশীল পুরুষ যেমন তার পত্নীর বিভিন্ন অপরাধ (যেমন তার বিনা অনুমতিতে বাইরে যাওয়া বা কাউকে কিছু দেওয়া, তার খিদমতে অবহেলা করা, সংসারে চোখ-কান না করা ইত্যাদি ত্রুটি ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু তার পবিত্র বিবাহ বন্ধনে থেকে তার পবিত্র প্রেমে কোন পরপুরুষকে অংশী করলে তা কোন দিন সহ্য ও ক্ষমা করতে পারে না। তদনুরূপ পবিত্র আল্লাহ বান্দার অন্যান্য পাপ ক্ষমা করলেও তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা ইবাদতে কাউকে শরীক করার মত পাপ ক্ষমা করেন না।

ব্যভিচার শির্কের মত তত বড় পাপ না হলেও চরিত্রগত এক মহাপাপ বটে। সেই জন্য কোন (চরিত্রবান) মুমিন (যে শির্ক করে না সে) কোন ব্যভিচারিণী নারীকে চাইলেও বিবাহ করতে পারে না। কারণ, মুমিন চারিত্রিক পবিত্র, কিন্তু ব্যভিচারিণী অপবিত্রা। এ রকম ব্যভিচারিণীকে কোন ব্যভিচারী অথবা মুশরিকই বিবাহ করতে পারে। *(কুঃ ২৪/৩)* কারণ, মুশরিকও অপবিত্র। *(কুঃ ৯/২৮)* তাই ভ্রষ্টা ব্যভিচারিণী

অন্যাসক্তা স্ত্রীর জন্য পথভ্রষ্ট ও অপবিত্র মুশরিকই উপযুক্ত। উভয়ের মধ্যে নেহাতই চারিত্রিক সামঞ্জস্যের জন্য দুজনের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করতে বলা হয়েছে। ব্যভিচারিণী নারী পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মাঝে নিজেকে একজন পুরুষের হাতে সমর্পিত করে। তাকে নিজের যৌবন ও ইজ্জতের মালিক বানায়। তার নিকট হতে খোরপোশ এবং অন্যান্য অধিকার অর্জন করে। তা সত্ত্বেও তার সতীত্বে ও পবিত্র প্রেমে অপর কোন পুরুষকে অংশী করে। পতির খেয়ে উপপতির গুণ গায়। কুলবধূর বেশে কুলটার ন্যায় একাধিক পুরুষকে নিজের যৌবন ও প্রেমের মালিক বানায়।

ঠিক তদ্রূপই একটি মুশরিকের অবস্থা। সে আল্লাহকে রব বা প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা বলে স্বীকার করে। 'বালা' বলে তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের উপর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তাঁর দেওয়া বাসস্থানে থাকে, খায় তাঁরই দান করা রুজী থেকে, তাঁর দেওয়া পানি পান করে। তাঁর দেওয়া কাপড় পরিধান করে, এক কথায় সবকিছু সে তাঁরই অনুগ্রহে লাভ করে থাকে। এতদসত্ত্বেও ইবাদত, উপাসনা, স্মরণ সে অন্য কারো করে, গুণগান আর কারো গায়, অপরের প্রেমে অন্তর ভরে। একাধিক মা'বুদকে তাঁর ইবাদতের মালিক বানায়। পৃথিবীতে এই দুই বিশ্বাসঘাতকতা বড় নযীর বিহীন।

বিশ্বাসঘাতিনী বা কুলটা যেমন সমাজে ঘৃণাস্পদ হয় এবং তার কোন সদ্‌গুণ থাকলেও তা ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং সে গুণের প্রতি কেউ দৃকপাত করে না। তেমনি মুশরিকের অন্যান্য সৎকার্য থাকলেও তা নিষ্ফল ও বাতিল বলে বিবেচিত হয়। *(কুঃ ৬/৮৮, ৩৯/৬৫)* দুগ্ধে গোমূত্র পড়ার মত শির্ক তার সমস্ত নেক আমলকে নষ্ট করে ফেলে।

এতবড় মহা অপরাধীর জন্য সমাজেও শাস্তি আছে। আল্লাহ পাকের নিকটে এ অমার্জনীয় অপরাধের বদলা আগুনের বাসস্থান এবং তার জন্য চির দিনের মত জান্নাত হারাম। *(কুঃ ৫/৭২)* এমন মহাপাপী থেকে আল্লাহ তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। *(কুঃ ৯/৩)* এবং তার আমল সহ তাকে বর্জন করেন। *(মুঃ ২৯৮৫)*

মুশরিক শির্কের ফলে শয়তানকে নিজের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং তার উপর শয়তানের সম্পূর্ণ আধিপত্য হয়। *(কুঃ ১৬/১০০)* শয়তান মুমিনের চির দুশমন। সে আপন অনুসারী মুশরিকদের নিয়ে মুমিনদের সহিত সংঘর্ষ বাধায়। তখন আল্লাহর তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই লড়তে মুমিনরা আদিষ্ট হয়। *(কুঃ ৯/৫,৩৬)* হক ও বাতিলের চির সংঘর্ষ চলে। কিন্তু যারা এতবড় অপরাধী, আপন সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের যারা বিশ্বাস ঘাতক তাদের মন হীনতাগ্রস্ত হয়, প্রাণ দুর্বল হয়, হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। *(কুঃ ৩/১৫১)* তাদের অবস্থা এমন হয় যেন আকাশ হতে পড়ে, অতঃপর পাখী তাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। *(কুঃ ২২/৩১)* তাদের কোন স্থিরতা থাকে না। শয়তান তাদেরকে বিভিন্ন কলা-কৌশলে মুমিনদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে যুদ্ধ বাধায়। কিন্তু শয়তানের কৌশল বড় দুর্বল। *(কুঃ ৪/৭৬)* ফলে সে সংঘর্ষে মুমিনগণ সংখ্যায় কম থাকলেও বিজয়ী হয়। তাদের হৃদয়ে মুমিনদের প্রতি চির ঈর্ষা জন্মে। তারা মুমিনদের জন্য সদা অমঙ্গল, বিপদ এবং অনিষ্ট কামনা করে। *(কুঃ ২/১০৫)* তারা কোন মুমিনের সাথে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। *(কুঃ ৯/১০)* যার জন্য মুমিনদেরকে নিষিদ্ধ করা হল, যেন তাদেরকে অন্তরঙ্গ না করে এবং তাদের পাকে পড়ে বিপদে না পড়ে। *(কুঃ ৩/২৮, ১১৮/১২০, ৪/১৪৪)* এবং আরো নিষিদ্ধ করা হল যে তারা মারা গেলেও যেন তাদের জন্য আল্লাহর (যাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও হক নষ্ট করেছে তাঁর) দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা না করে; যদিও বা তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হয়। *(কুঃ ৯/১১৩)*

এইভাবে মুশরিক বা অংশীবাদীদের জন্য রয়েছে চির দুর্ভোগ ও মহাসর্বনাশ। *(কুঃ ৪১/৬)*

মুসলিম ইসলামের যাবতীয় রীতি-নীতিকে সত্য ও অভ্রান্ত বলে জানে ও তার উপর আমল করে। তার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করে না। তার প্রতি কোন অবজ্ঞা বা অবহেলা করে না। ইসলামী আইন ও নির্দেশাবলীর যথার্থ মর্যাদা সে দেয়। তার অনুশাসনকে আদৌ অমান্য করে না। শাস্ত্রগ্রন্থের কোন প্রকারের হেরফের করে না। কদর্থ বা ভুল ব্যাখ্যা করে না। মুসলিম জানে যে, ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। তাতে বিন্দুমাত্র বাড়তি করার ঠাঁই নেই। তাতে কিছু অতিরিক্ত করার অধিকারও কারো নেই। *(কুঃ ৫/৩)*

অতএব কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি কোনও আমল নিজের তরফ থেকে বাড়িয়ে করতে চায়, তবে সে ইসলামকে অপূর্ণ ধর্ম বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম।" *(কুঃ ৫/৩)*

তাই ধর্মে নেই এমন কোন আমল নতুনভাবে আবিষ্কার করে তাতে সংযোজন করে ধর্মের নাম দেওয়ার দুঃসাহসিকতা কোন মুসলিমের হতে পারে না। এই ধরনের আবিষ্কারকে বিদআত ও আবিষ্কারককে বিদআতী বলে। এই বিদআত বাড়তে থাকলে সুন্নাহর স্থলে বিদআত দখল করবে এবং সুন্নাহ হ্রাস পেতে থাকবে। যার ফলে ধর্মের আসলরূপ পরিবর্তিত হয়ে নকলের উপর আমল করে মুসলিম পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

অতএব যদি প্রত্যেকটি সেই কাজ যা ধর্মীয় বা ইসলামী অথবা 'করতে হয়' -এমন মনে করে করা হয় অথচ সে প্রসঙ্গে শরীয়তের (কিতাব ও সুন্নাহর) কোন নির্দেশ না থাকে, তাহলে তা বিদআত এবং খন্ডনীয় ও পরিত্যাজ্য। *(বুঃ ২৬৯৭, মুঃ ১৭১৮)*

পক্ষান্তরে যা ধর্মীয় বিষয় বা কর্ম নয়, বরং ধর্ম করার অসীলা বা মাধ্যম মাত্র অথবা পার্থিব বা সাংসারিক কর্মাদির নতুন আবিষ্কারকে (যেমন মাইক, মোটর গাড়ী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে) বিদআত বলা হয় না।

নিম্নোক্ত সূত্রাবলী দ্বারা বিদআত চিহ্নিত হয়ে থাকেঃ-

১। প্রত্যেক কথা কাজ আকীদা (বা বিশ্বাস যদিও তা ইজতেহাদী হয়) যদি তা সুন্নাহর বিপরীত হয়। যেমন সেহরী বা তাহাজ্জুদের আযানের পরিবর্তে কুরআন তেলাঅত ও জাগরণী ডাক। জুমআর সময় আযানের পরিবর্তে কুরআন পাঠ ও প্রস্তুতির আহবান। আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এই ধারণা, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ গায়েব জানতেন, তিনি মানুষ ছিলেন না ইত্যাদি বিশ্বাস রাখা।

২। প্রত্যেক সেই আমল যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয় অথচ তাঁর রসূল ﷺ তা নিষেধ করেছেন। যেমন কোন অলীর কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা, কবরের উপর ঘর বা মসজিদ নির্মাণ, কবরে বাতি জ্বালানো, মসজিদ সৌন্দর্য-খচিত করা, মেয়েদের কবর যিয়ারত ইত্যাদি।

৩। প্রত্যেক সেই আমল যার উপর শরীয়তের (কুরআন-সুন্নাহর) কোন নির্দেশ নেই। যেমন নবী দিবস, মুহার্রম (মহরম), চালশে, জামায়াতী নামাযের পর হাত তুলে ইমামের দুআ ও মুক্তাদিদের 'আমীন আমীন' বলা।

৪। কাফেরদের প্রত্যেক সেই প্রথা বা আচার যা ইসলামে ইবাদত মনে করা হয়।

যেমন, গুরুজন বা পিতামাতার চরণ স্পর্শ করে সালাম (প্রণাম) করা ইত্যাদি।

৫। পরবর্তীকালের উলামাগণ যা মুস্তাহাব মনে করেছেন, অথচ তার কোন দলীল বা ভিত্তি নেই। যেমন কোন ইবাদতের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা ইত্যাদি।

৬। প্রত্যেক সেই ইবাদত যার পদ্ধতি যয়ীফ বা জাল হাদীস ছাড়া অন্য কোন (সহীহ) হাদীসে বর্ণিত হয়নি। যেমন, শবেবরাতের রোযা ও নামায, সালাতুত তাহফীয, মুর্দার জন্য কুরআন পাঠ, হাত তুলে দুআর শেষে মুখে হাত বুলানো ইত্যাদি।

৭। ইবাদতে প্রতিটি অতিরঞ্জিত ও অতিরিক্ত কাজ। যেমন দরূদে কিয়াম, চুম্বন, সালামে মাথা ঝুকানো, কুরআন পাঠের শেষে মুসহাফে চুম্বন ও কপাল ঠেকানো ইত্যাদি।

৮। প্রত্যেক আমল যা শরীয়তে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। কিন্তু লোকে তা কোন দিন, সময়, স্থান, নিয়ম বা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। যেমন তাওয়াফের প্রতি চক্করে নির্দিষ্ট দুআ পাঠ, জুমআর পূর্বে নির্দিষ্ট নফল, শবেকদরে নির্দিষ্ট নামায ইত্যাদি।

যেহেতু যয়ীফ হাদীস রসূল ﷺ-এর সঠিক উক্তি নাও হতে পারে, তাই যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে কোন আমল সিদ্ধ নয়। অবশ্য অনেকে 'ফাযায়েলে আ'মালে' যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ এমন আমলের ফযীলত বর্ণনায়, যে আমল সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আ'মালুল ফাযায়েলে (অর্থাৎ এমন আমল যার ফযীলত আছে সেই আমল করতে) নয়।

উদাহরণস্বরূপ, চাশ্তের নামায সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। *(মুঃ ৭১৯)* তার ফযীলত প্রসঙ্গে এক হাদীসে বলা হয়, "যে ব্যক্তি ঐ নামায পড়বে, তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও মাফ করা হবে।" *(আঃদাঃ ১২৮৭, তিঃ ৪৭৬, ইঃমাঃ ১৩৮২)* অন্য হাদীসে বলা হয়, "যে নিয়মিত ১২ রাকআত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতে এক সোনার মহল তৈরী করে দেবেন। *(তিঃ ৪৭৩, ইঃমাঃ ১৩৮০)* কিন্তু এই দুটি হাদীসই যয়ীফ। ওঁদের মতে চাশ্তের নামাযের ফযীলতে এই হাদীস দুটিকে বর্ণনা করা যাবে।

উপরন্তু এর উপরেও ওঁদের নিকট তিনটি শর্ত রয়েছেঃ-

প্রথমতঃ হাদীসটি যেন গড়া বা জাল না হয়।

দ্বিতীয়তঃ আমলকারীর যেন জানা থাকে যে, যে হাদীসের ভিত্তিতে সে আমল (ফযীলত বর্ণনা ও বিশ্বাস) করছে তা যয়ীফ বা দুর্বল।

তৃতীয়তঃ তা যেন (ব্যাপকভাবে) প্রচার না করা হয়।

পরন্তু হাদীস ব্যবহারের ব্যাপারে আহকাম ও ফাযায়েলের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। কারণ, উভয়ই শরীয়ত। তাই সঠিক এই যে, যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে কোন প্রকারের আমল সিদ্ধ নয়। *(তাঃমিঃ ৩৪)* সহীহ (ও হাসান) হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাই আমলের জন্য যথেষ্ট।

কোন কোন বিদআত কুফরী ও শির্ক। যেমন কবর পূজা, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না তা গায়রুল্লাহর কাছে চাওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের বিদআতী থেকে মুসলিম সম্পর্ক ছিন্ন করে।

তবে বিদআতীকে কাফের তখনই বলা যাবে, যখন তার কাছে ঐ আমলের কোন অজুহাত বা সন্দেহ থাকবে না এবং তা কুফরী হওয়ার দলীল ও যুক্তি তার কাছে পেশকৃত হবে।

'বিদআতে হাসানাহ' বলে কোন বিদআত নেই; যা করলে লাভ হয় ক্ষতি কিছু হয়

না। বরং প্রত্যেক বিদআতই গুমরাহী বা ভ্রষ্টতা।

ধর্মীয় কোন বিষয়ে কারো জ্ঞান, মত বা রায় ইত্যাদি অচল। *(কুঃ ২৮/৫০,৫৩/২৩)* এ ধর্ম আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে নাযেলকৃত। এতে কোন কথা, কোন তথ্য সঠিক ও সুস্থজ্ঞান ও অভিমতের বহির্ভূত হতে পারে না। শরীয়ত এমন কিছু বলে না, যা অসম্ভব বা অবাস্তব হতে পারে। তবে এমন হতে পারে যে, মানুষ তার সীমিত জ্ঞানে শরীঅতের কিছু খবরে অবাক-হতবাক হয়ে পড়ে।

শরীঅতের উপর মানুষের জ্ঞানের চাকা অচল বলেই আয়েম্মায়ে ইসলাম আহলে কালাম, মানতেক ও ফালাসাফার কঠোর সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করেছেন। বরং অনেকেই ঐ সব ইলমে নাস্তিক হবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং ঐ শিক্ষাকে অবৈধ বলেছেন। *(শঃ তাঃ ৭২)*

এক যুগ ছিল যখন মানতেকী ও ফালসাফীদেরকে দস্তুর মত জবাব দেবার জন্য মানতেক ও ফালসাফা শিখা ভালো বলা হত। কিন্তু ইদানীং সে প্রয়োজন আর নেই। তাই তা পরিহার করাই উত্তম।

তুরতুশী বলেন, 'যে ব্যক্তি ফালসাফা ও মানতেক দ্বারা ইসলামের সাহায্য করতে চায় সেই ব্যক্তির উপমা তার মতই , যে প্রস্রাব দ্বারা পানি ধৌত করে। *(সিয়ার আ'লামিন নুবালা ১৯/৩৩৪)*

সর্বযুগের জন্য দ্বীনী বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান ও আলোকই যথেষ্ট। যদ্যপি শরীয়তী কোন বিষয়কে জ্ঞান ও আকেলের বিপরীত বলে মনে করা হয়, তথাপি সে ক্ষেত্রে শরীয়তের বক্তব্যই বিশ্বাস্য ও গ্রহণীয় হবে। কারণ, শরীয়ত নির্ভুল সুনিশ্চিত সত্য, কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও বিবেক সত্য হলেও অনিশ্চিত। ইসলামের প্রতি কাজে, আদেশ ও নিষেধে হিকমত বা যুক্তি আছে। (কারণ, তা সৃষ্টিকর্তার বিধান।) কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে যুক্তি মানুষের নিকট প্রকাশিত হয় না। সে ক্ষেত্রে মুসলিম যুক্তি না বুঝেই তার উপর আমল করে। কারণ, মানুষ খুবই সামান্য জ্ঞানের। *(কুঃ ১৭/৮৫)*

অসহায়ের সহায়, দুঃখে-শোকে, বিপদে আপদে সহায়ক আল্লাহ। বান্দার বিপদে আকুল আবেদন, কাকুতি-মিনতি, মনের বেদনা শ্রবণ করেন ও জানেন একমাত্র তিনিই।

তিনিই দুঃখীর দুঃখ, শোকার্তের শোক, বিপন্নের বিপদ, বেদনার্তের বেদনা দূর করে থাকেন। যেমন তিনিই সুখীর সুখ, সম্পদশালীকে সম্পদ প্রদান করেন। তাঁর এ কাজে কেউ শরীক, সহায়ক বা সুপারিশকারী নেই। বান্দার আহবানে সাড়া দেন, তার আবেদন মঞ্জুর করেন। তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী। *(কুঃ ২/১৮৬)* তাঁকে ডাকার জন্য, পাবার জন্য, তাঁর সাহায্য, দয়া বা অনুগ্রহ লাভের জন্য কোন উকিল, অসীলা বা সুপারিশকারীর প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় শুধু তাঁর ইচ্ছার। তিনি ছাড়া কোন ফিরিশ্তা, নবী, অলী, জিন কেউই দুআ মঞ্জুর করতে পারেন না, আর না পারেন কারো মনের আকাঙ্খা মিটাতে। তাই বিপদে তাঁকে ছেড়ে কোন গায়রুল্লাহকে ডাকা, তার কাছে বিপদের কথা জানিয়ে সাহায্য চাওয়া শির্কে আকবর। *(কুঃ ৩৯/৩৮, ৭/১৯৭)*

অবশ্য এমন কোন বিপদে পড়া, যা থেকে উদ্ধার করা জীবিত কোন মানুষের সাধ্যে

আছে, তবে তাকে আহবান করা কোন শির্ক নয়। যেমন, পানিতে ডুবা থেকে হাত ধরে তোলার জন্য, কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য, কোন জীবন্ত সক্ষম উপস্থিত ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া এবং তাকে 'বাঁচাও' বা 'রক্ষা কর' বলে ডাকা শির্ক নয়। যদি তাকে বাঁচার অসীলা মনে না করে, কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা যায়।

মুমিনের মনে স্মরণীয় শুধু আল্লাহ। মুমিন শুধু তাঁরই যিক্র করে। তাঁরই শাস্তিকে ভয় করে। তাঁরই নিকট সাহায্য চায়। অন্য কোন নবী, অলী (পীর-ফকীর) তার স্মরণীয় নয়। তাদের যিক্রও করে না সে। তাদের স্মরণে কোন লাভ হয় বলে মনেও করে না। তাদের কোন গযবকে (গযব হয়ও না) ভয়ও করে না। তাঁদের নিকট কোন সাহায্যও চায় না।

মুসলিম কোন কবরবাসীর নিকট কিংবা কোন বুযুর্গের নিকট কিংবা কোন ফিরিশ্তা বা জিনের নিকট সাহায্য চায় না। বিপদ হতে উদ্ধার বা সন্তান প্রার্থনা করে না। চায় তো শুধু তাঁরই কাছে, যিনি দান করে থাকেন।

সুতরাং যদি কোন মুসলিম নামায-রোযা করা সত্ত্বেও মসীবতে মৃতকে ডাকে, অথবা জীবন্ত কোন বুযুর্গের বা কোন জিন, ফিরিশ্তা, আলী, ফাতেমা বা হাসান-হুসাইনের এমন কাজে সাহায্য চায়, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউই উদ্ধার করতে সক্ষম নয়, এবং তাকে নসীহত করা সত্ত্বেও সে অবজ্ঞা করে অদম্য-মনে সেই কাজে লিপ্ত থাকে এবং সেই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে সে মুশরিক হয়ে ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মারা যায়।

জ্ঞানী মুসলিম জানে, দুআ বা প্রার্থনা করা হয় তাঁর কাছেঃ

❖ যিনি সদা বর্তমান ও বিদ্যমান। তাই যার অস্তিত্ব নেই বা যে সদা বর্তমান নয় তার কাছে প্রার্থনা বৃথা।

❖ যিনি সবকিছুর (অথবা অন্ততঃ পক্ষে সেই বস্তু যা তাঁর নিকট চাওয়া হবে তার) মালিক। যে সবকিছুর অথবা যাচিত জিনিসের মালিক নয় তার নিকট যাচা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা।

❖ যিনি মালিকের শরীক। তাই যে মালিকের কোন কিছুতে শরীক বা অংশী নয়। তার কাছে চাওয়াও অযথার্থ।

❖ যিনি মালিকের সহায়ক। অতএব যে তাঁর সহায়ক নয়, তার কাছে যাচ্ঞা করা নিষ্ফল।

❖ যিনি মালিকের নিকট সুপারিশকারী। তাই যে স্বেচ্ছায় সুপারিশকারী নয় অথবা যার সুপারিশ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতাই নেই তাঁর নিকট প্রার্থনা করাও নিরর্থক।

❖ যিনি সম্পদশালী। তাই নিঃস্বের কাছে কিছু চাওয়া মূর্খামি।

❖ যিনি সর্বশ্রোতা। তাই বধীর বা নির্জীবের নিকট দুআও নিছক ভ্রান্তি।

❖ যিনি দানশীল। তাই কৃপণ বা ব্যয়কুণ্ঠের কাছে কিছু ভিক্ষা চাওয়াও খাঁটি ভুল।

❖ যিনি দয়াবান। তাই দয়াহীন ও পাষাণ হৃদয়ের কাছেও কিছু প্রার্থনা করা বোকামী।

❖ যিনি দান করার নিজস্ব শক্তি ও এখতিয়ারের অধিকারী। তাই যার নিজস্ব কোন অধিকার বা এখতিয়ার নেই, তার কাছে হাত পাতাও আহাম্মকি।

❖ যিনি পরের ডাক শুনতে পান। তাই যে পরের ডাক শুনতে পায় না অথবা যে শুধু নিজেকেই নিয়েই ব্যস্ত-সমস্ত তার নিকট আঁচল পাতাও বিফল।

❖ যিনি দূর-বহুদূরের এবং বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে সকল প্রকার শব্দ

শুনতে পান। বিধায় যে এ রকম নয়, তার কাছে কিছু চাওয়া বড় ভ্রান্তি।

❖ যিনি পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও মনের কথা বোঝেন। সুতরাং যে সমস্ত রকমের ভাষা ও মনের কথা বুঝে না, তার কাছে কিছু যাচনা করা ভুল।

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা যাবে না। তাই তো তাঁর কাছে কিছু না চাইলে তিনি রাগান্বিত হন। *(মিঃ ২২৩৮)* কিন্তু মানুষের কাছে চাইলে সে রাগান্বিত হয়।

তাই তো জ্ঞানী তাঁরই কাছে চায়, যিনি এ বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক। তাঁর কেউ শরীক বা অংশী নেই। আর জানে যে, আল্লাহর নিকটে নবী-ওলীর মর্যাদা থাকলেও তাঁরা তাঁর কোন কাজে সহায়ক নন এবং কারো জন্যে নিজের ইচ্ছায় সুপারিশকারীও নন। *(কুঃ ১৭/৫৬, ৩৪/২২-২৩)*

সিজদাহ

মুসলিম নামায পড়ে আল্লাহরই জন্য। সাজদা বা সিজদা ও রুকু করে তাঁরই জন্য। মাথা নত করে, ঝুঁকে, প্রণিপাত করে শুধু তাঁরই জন্য। কোন নবী, ওলী, জিন, ফিরিশ্তা, পিতা-মাতা, বুযুর্গ, কবর, মাটি, পাথর, চাঁদ, সূর্যের সম্মুখে বা উদ্দেশ্যে তার মাথা নত হয় না। *(কুঃ ৪১/৩৭)* ([34])

তা'যীমী সিজদাও আল্লারই জন্য। কারো পা ছুঁয়ে বা ঝুঁকে কাউকে সালাম করারও অনুমতি ইসলামে নেই।

হযরত আদম ﷺ-কে সিজদা করার জন্য আল্লাহপাক ফিরিশ্তাগণকে আদেশ করেছিলেন। আবার তিনিই মানুষকে তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকে সেজদা করতে নিষেধ করেছেন। *(কুঃ ৪১/৩৭, ৫৩/৬২)* তাই আল্লাহ ছাড়া সিজদা হারাম। বরং তা শির্কে আকবার।

আল্লাহপাক মানুষের পিতা আদম ﷺ-কে সিজদা করার জন্য ইবলীসকেও আদেশ করেছিলেন। আদেশ অমান্য করার ফলে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তান হল। ভিন্নরূপে আল্লাহ মানুষকে শুধু তাঁকে সিজদা করার আদেশ দিলেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করতে নিষেধ করলেন। এই আদেশ ও নিষেধ অমান্যকারী অবশ্যই কাফের হবে। ([35])

হযরত ইউসুফ ﷺ তাঁর পিতাকে সিজদা করেছিলেন। তা'যীমী সিজদা তাঁদের শরীয়তে বৈধ ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াতে হারাম। পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়ত বা কোন আমল আমাদের জন্য তখনই মান্য হবে, যখন আমাদের শরীয়ত সেই আমলে বাধা না দেবে। কারণ, মুহাম্মাদী শরীয়ত পূর্বেকার সমস্ত শরীয়তকে মনসূখ ও বাতিল করে দিয়েছে। অতএব পূর্ববর্তী কোন শরীয়তের অনুকরণ করতে যদি মুহাম্মাদী শরীয়ত অনুমতি দেয় বা কোন বাধা না দেয় তবেই অনুকরণীয় হবে, নচেৎ না। যেমন,

---

(৩৪) *কোন জিনিস কুড়াতে বা তুলতে ঝুঁকাকে সেজদা বলা হয় না। সেজদা তথা সমস্ত ইবাদতের জন্য উদ্দেশ্য ও সংকল্প প্রধান বিচার্য।*

(৩৫) *অনেক আউলিয়াদের মতে আল্লাহ জাল্লাহ শানুহ আদমে মিলিত হয়ে (নাউযু বিল্লাহে মিন যালিক) ফিরিশ্তাবর্গ ও শয়তানকে সিজদা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। -এই ধারণা কুফর। ওরা সারা সিন্ধুবারিকে ছোট্ট কলসীতে ভরতে চায়! হাদাহুমুল্লাহ।*

হযরত আদম ﷺ-এর শরীয়তে ভাই-বোনের আপোসে বিবাহ জায়েয ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াতে তা চির দিনের জন্য হারাম। হযরত ঈসা ﷺ-এর শরীয়তে মদ্য হালাল ছিল, কিন্তু মুহাম্মাদি শরীয়তে তা হারাম।

অনুরূপভাবে কোন মানুষ বা সৃষ্টিকে সেজদা করা কোন কালে কোন শরীয়তে বৈধ থাকলেও শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াতে তা হারাম ও শির্ক।

নামায আল্লাহর জন্য। তার সিজদা, রুকু ও কিয়াম (একনিষ্ঠ হয়ে দন্ডায়মান) জলুস (একাগ্রচিত্তে উপবেশন) ইত্যাদি আল্লাহরই জন্য। অতএব কারো আত্মার তা'যীম বা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের উদ্দেশ্য অথবা কোন মৃত কিংবা জীবিত বুযুর্গ বা মান্যবর মানুষের সামনে অথবা কোন জিনের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করে একাগ্রচিত্তে দন্ডায়মান হওয়া অথবা কারো সন্তুষ্টি সাধনে একাগ্রচিত্তে উপবেশন (যোগাসন) করা বা ধ্যান করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। *(তিঃ ২৭৫৫)*

মুসলিম পছন্দ করেনা যে, তার তা'যীমের জন্য কেউ তার সামনে দন্ডায়মান হোক; যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ তা অপছন্দ করতেন। *(তিঃ ২৭৫৮)* শায়খ বা মুদার্রিস হয়ে ছাত্রের নিকট 'কিয়াম' আশা করে না। যেমন সে নিজে কোন শ্রদ্ধাভাজনকে দেখলে তাঁর তা'যীমের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ায় না। যেমন সাহাবাগণ প্রিয় নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেন না।

অবশ্য আগন্তুক কোন মেহমানের সহায়তা ও অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে প্রত্যুত্থান করে উপবেশন করা দূষণীয় নয়। *(বুঃ ৬২৬২)*

তদনুরূপ মুসাফাহা ও মুআনাকা করার উদ্দেশ্যে এবং বৈঠকে স্থান প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে উঠে বসাও নিষিদ্ধ নয়।

আল্লাহ জাল্লা শানুহ বান্দাকে তাঁর জন্য রুকু ও সিজদা করতে আদেশ করেছেন। *(কুঃ ৪১/৩৭, ২২/৭৭, ৫৩/৬২)* কিন্তু এ কথা বলেননি যে, শয়তান যেখানে সিজদা করেছে সেখানে করো না। আল্লাহর রসূল ﷺ এবং তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়াগণ (আঃ) এই মাটিতেই সিজদা করেছেন এবং সকলেই নিজ নিজ উম্মতকে ঐভাবেই সিজদা করতে শিক্ষা ও নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত জিব্রাঈল ﷺ নিজে এই মাটিতেই সিজদা করে নবী করীম ﷺ-কে নামায শিখিয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই এই মাটির উপরেই সিজদা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যলাভ করে গেছেন। কই তাঁরা কেউই বলেননি যে,'শয়তানের সিজদার স্থানে সিজদা করো না।' আমাদের আদর্শ তাঁরা, তাঁরা করেছেন তবে আমাদের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়?

তাছাড়া শয়তান যখন সারা পৃথিবীতে সিজদা করেছিল (কথাটি প্রমাণ সাপেক্ষ) তখন সে শয়তান ছিল না। সিজদার সময় ছিল আল্লাহর নিকটতম ফিরিশ্তাদের সমাজভুক্ত। বস্তুতঃ চিরদিন আল্লাহর নেক বান্দারাই তাঁকে সিজদা করে থাকে। পক্ষান্তরে শয়তানের বাধ্য বান্দারাই শয়তানের মতই আল্লাহর আদেশ সত্ত্বেও সিজদা করতে অস্বীকার করে। তাই 'শয়তানের সিজদার জায়গার সিজদা করব না' বলে শয়তানের সাথে বক্তার বৈরিতা বা বিরাগ প্রকাশ নয়, মিত্রতা বা অনুরাগ প্রকাশ। আর এরই দোহাই দিয়ে মহান আল্লাহর আদেশকে অমান্য করা এবং সমস্ত আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের আদর্শকে পরিহার করা ধ্বংসের কারণ ছাড়া কিছু নয়। কারণ, আল্লাহর নির্দেশ ও রসূল ﷺ-এর আদেশ ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত ও মা'রেফত তো পাওয়াই যায় না। বরং হাসরত, নাদামত ও হালাকত হাসিল হয়।

কথায় শির্ক

মুসলিম জানে যে, আল্লাহর গুণের কাছে সৃষ্টির গুণ কিছুই নয়। তাঁর ইচ্ছা ও কোন সৃষ্টির ইচ্ছা সমান নয়। সৃষ্টির ঘটনাঘটনে কেবল মাত্র তাঁরই ইরাদা-ইশারা চলে; আর কারো নয়। তাই মুমিন কোন মান্য মানুষকে বলে না যে, 'আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে' কিংবা 'আল্লাহ ও আপনি যা ইচ্ছা করবেন তাই হবে।' কারণ, মানুষের হাতে তদবীর আছে আর তকদীর আছে আল্লাহর হাতে। অতএব দু'টিকে সমান করলে শির্ক হয়ে যাবে। *(মিঃ ৪৭৭৮)*

অনুরূপভাবে 'আল্লাহ ও আপনার ফযলে আমার কাজটা উদ্ধার হল। আল্লাহ ও আপনার অনুগ্রহে চাকরী পেয়েছি। আমার যা হয় আল্লাহ জানেন আর আমি জানি। আমার উপরে আল্লাহ আর নিচে দশ ছাড়া কেউ নেই। অমুকের হুকুম খোদার হুকুমের সমান।' ইত্যাদি বলা কথায় শির্ক। যেহেতু আল্লাহ একাই যা চান, তাই হয়। শুধু তাঁরই ফযল ও অনুগ্রহে সব কিছু হয়। আল্লাহর জানা ও মানুষের জানা সমান নয়। আর আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট।

তবুও যদি তাঁর শুক্র আদায়ের সাথে মানুষেরও শুক্র আদায় করতে হয় (যেহেতু তার হাতে তদবীর থাকে), তাহলে এরূপ বললে শির্কের ভয় থাকে না, 'আল্লাহ তারপর আপনি যা ইচ্ছা করবেন তাই হবে। আল্লাহ তারপর আপনার ফযলে আমার কাজটা উদ্ধার হল। আল্লাহ তারপর আপনার অনুগ্রহে আমি চাকুরী পেয়েছি। আমার যা হয় আল্লাহ জানেন, তারপর আমি জানি। আমার উপরে আল্লাহ তারপর নিচে দশ ছাড়া আর কেউ নেই।'

বলা বাহুল্য, মুমিন আল্‌গা জিভে কথা বলে না, বরং শরীয়ত কর্তৃক আঁটা জিভে কথা বলে। নচেৎ কথায় কথায় কখন সে শির্ক করে বসবে তা সে নিজেই টের পাবে না। কারণ, শির্ক (বিশেষতঃ ছোট শির্ক ও কথায় শির্ক) কালো অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপরে চলমান কালো পিপীলিকার চেয়েও সূক্ষ্ম। যা চলতে থাকে অথচ বুঝতে পারা যায় না। *(সঃ জাঃ ৩৭৩০)* তাই মুসলিমের উচিত, এ ধরনের শির্ক থেকে সাবধান থাকা এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। *(সঃজাঃ ৩৭৩১)*

আল্লাহর উপর সালাম

মুসলিম আল্লাহর নামে সালাম পাঠায় না। কারণ, সালাম (নিরাপত্তা বা শান্তি) তো তার দরকার, যে বিপদগ্রস্ত হয় বা নিরাপত্তাহীন ও পরমুখাপেক্ষী থাকে। আল্লাহ তো এসব থেকে অনেক উর্ধ্বে। তাই ফিরিশ্তা, জিন ও মানুষের জন্য 'আসসালামু আলাইকুম' বা 'আলাইহিমুস সালাম' ইত্যাদি বলা যায়' কিন্তু 'আসসালামু আলাল্লাহ' বলতে পারা যায় না। যেহেতু আল্লাহই 'আসসালাম' (শান্তি ও নিরঞ্জন)। তাঁর তরফ হতেই শান্তি আসে। *(মিঃ ৯০৯)*

তদনুরূপ মুসলিম বলে না যে, 'আল্লাহর দুআয় ভালো আছি।' কারণ, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর কাছেই দুআ করে, আল্লাহর দুআ কার কাছে হবে? তাই সে বলে 'আল্লাহর দয়ায় ভালো আছি। আপনাদের দুআয় ভালো আছি' ইত্যাদি।

আবার 'নবী-রসূলের (বর্তমান) দুআয় ভালো আছি' বা 'হযরত আলীর দুআ লাগুক' বা 'মা ফাতেমার দুআ হোক' ইত্যাদিও বলা যায় না। কারণ, তাঁরা ইহলোকে জীবিত নেই। মধ্যলোক থেকে কেউ কারো জন্য দুআ করতে পারে না।

মুসলিম আল্লাহর সমতুল্য কাউকে মনে করে না। কারো এমন নামও রাখে না যাতে আল্লাহর সমকক্ষতা বুঝায় বা শির্কের গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন, আব্দুন নবী, আব্দুর রসূল, (অর্থাৎ নবী বা রসূলের বান্দা বা দাস) শাহানশাহ (রাজাধিরাজ)। কারণ, মানুষ আল্লাহরই বান্দা বা দাস, রাজাধিরাজ তো একমাত্র তিনিই।

অনুরূপভাবে নবী-বখ্শ, রসূল-বখ্শ, আলী-বখ্শ, হোসেন-বখ্শ, পীর-বখ্শ, মাদার-বখ্শ (অর্থাৎ, নবী, রসূল, আলী, হোসেন, পীর বা মাদারের দান) ইত্যাদি নাম রাখাও শির্ক। কারণ, সন্তান দান তো আল্লাহই করে থাকেন।

তেমনি গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম মোস্তফা, গোলাম মর্তুজা (মুর্তাযা) গোলাম পীর ইত্যাদির অর্থ যদি ('সিফাত-মওসূফ' বা গুণবাচক না হয়ে 'মুযাফ-মুযাফ ইলাইহে' বা সম্বন্ধপদ হয় এবং তার মানে) নবী বা পীরের গোলাম বা বান্দা হয়, তাহলে তাও শির্কের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, মানুষ আল্লাহরই বান্দা, সমস্ত বন্দেগী তাঁরই।

তদনুরূপ যে নাম আল্লাহর নয় তার পূর্বে আব্দ (আব্দুল) যোগ করে নাম রাখাও ঐ পর্যায়ে পড়ে যেমন, আব্দুল মা'বুদ, আব্দুল গওস ইত্যাদি।

তেমনি এমন নামও রাখা যায় না, যার অর্থ মন্দ। যেমন, হাযান (দুশ্চিন্তাকারী) আ'সিয়া বা আচিয়া (অবাধ্য) ইত্যাদি। কারণ, নামের সাথে ব্যক্তিত্বের কিছু সম্পর্ক, তাসীর বা প্রভাবের কথা ইসলামে স্বীকৃত। *(বুঃ ৬১৯০)*

আবার যে নামে তাযকিয়াতুন নাফস (অহঙ্কার বা আত্মশ্লাঘা) হয় সে নাম মকরূহ। যেমন, বার্রাহ, তাক্বী, মুত্তাক্বী, মুতী (মতী), মুহসিন, মুখলেস ইত্যাদি। *(মুঃ ২১৪১, মুঃ মাঃ ১২৩)*

মুসলিম আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদ পাওয়ার পর তা অস্বীকার করে তাঁর কৃতঘ্নতা করে না। বরং তার যাবতীয় সুখ-সম্পদকে তাঁরই দেওয়া বলে মানে। ফলে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, শুক্র আদায় করে এবং এতে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। *(কুঃ ১৪/৭, ২/১৫২)* (36)

তাই মুমিন কোন দিন বলে না যে, 'আমার মাল, আমি বাপ-দাদার মীরাসসূত্রে পেয়েছি। কিংবা মনে করে না যে, আমি নিজ তদবীর ও মেহনত বলে জমা করেছি। ডাক্তারই আমার ছেলেকে বাঁচালো। যদি ডাক্তার না থাকত, তাহলে ছেলেটি মারা যেত। কুকুরটি না থাকলে বাড়ি চুড়ি হয়ে যেত।' ইত্যাদি। বরং এ রকম কোন কথা যখন সে বলে থাকে, তখন আল্লাহকে প্রকৃত কর্তা বলে বিশ্বাসে রাখে এবং তাঁর নাম আগে নেয় ও বলে,'আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর, তাঁর যা ইচ্ছা তাই করেছেন।' (37)

কারণ, প্রকৃত সম্পদ দাতা, জীবন-মরণ দাতা, রক্ষাকর্তা শুধু তিনিই। তাই তো পিতার অগাধ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও পুত্র দরিদ্র হয়। হাজার তদবীর ও মেহনত করার ফলেও অনেকের দু বেলার রুটীর যোগাড় হয় না। শত ডাক্তার থাকতেও কারো জান বাঁচে না। কত তদবীর সত্ত্বেও চুরি হয়, আরো কত বিপদ আসে।

অতএব এসব বাহ্যিক কারণ মাত্র। (38) তা অস্বীকার্য না হলেও প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই তাঁরই ইশারা ও ইচ্ছায় হয়ে থাকে। অতএব তাঁর এই সর্বব্যাপী চরম শক্তিতে কাউকেও শরীক করা যাবে না।

'যদি' বা 'যদি না' বলায় শয়তানের দরজা খোলা যায়। বিশেষ করে কোন বিপদ বা দুঃখের পর 'যদি ওখানে না যেতাম, তাহলে আমার এ বিপদ হত না' যদি ওই করতাম তাহলে এই হত না' ইত্যাদি বলা দোষাবহ।

যেহেতু আফসোস ও আক্ষেপে 'যদি-যদি' বলা বা করায় মানুষের মনে শোক ও সন্তাপ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। আর শয়তান এই সুযোগে মুসলিমকে আরো বিমর্ষ করতে অথবা মূল কারণের কথা ভুলিয়ে অমূলক কারণের প্রতি তার মন ফিরিয়ে তাকে শির্কে নিপতিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

অবশ্য 'কারণ' বা 'হেতু' বাস্তব ও সঠিক হলে বলা যায়। যেমন, যদি ওমুক না থাকত তাহলে আমি ডুবে যেতাম। যেমন নবী ﷺ তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের জন্য বলেছিলেন, 'যদি আমি না হতাম, তাহলে সে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে হত।'

অনুরূপভাবে অবধারণার্থে 'যদি থাক তবে খুশী হই', আশা বা কামনা প্রকাশার্থে 'যদি আমার ধন থাকত, তাহলে গরীবদের সেবা করতাম' (এইরূপ কামনা মানুষ

---

(36) *শুক্র প্রকাশে দুটি জিনিস জরুরী ঃ প্রথমতঃ অন্তরে এই জানা যে, সে যা পেয়েছে তা নেয়ামত এবং তা আল্লাহরই দান। আর দ্বিতীয়তঃ ঐ জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম করা; অর্থাৎ, দাতার প্রতি প্রেম, ভক্তি, বিনয় ও প্রশংসা কথা ও কাজে প্রকাশ করা। তাঁর পথে সে নেয়ামত ব্যয় করা।*

(37) *কিন্তু কোন পাপ কাজে এরূপ বলা চলে না। যেমন, ৭৯পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।*

(38) *চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ডাক্তার বাড়ি যাওয়া শির্ক নয়। কারণ, বান্দা জানে রোগ দূরকর্তা আল্লাহই। ঔষধ ব্যবহার একটা কারণ, বা হেতু মাত্র। যা ইসলামে স্বীকৃত ও অনুমোদিত। কিন্তু দর্গায় যাওয়া শির্ক। কারণ, বান্দা সেখানে কবরবাসীকেই সবকিছু মনে করে। আবার তাকে হেতু মানলেও সে হেতু ইসলামে স্বীকৃত নয়।*

নেকীর অধিকারী হয়।) অথবা 'যদি আমার ধন থাকত তাহলে গান-বাজনা ইত্যাদিতে স্ফূর্তি করতাম' (এইরূপ কামনায় পাপের ভাগী হয়।) সম্ভাবনা প্রকাশার্থে, 'রোগী যদি জাগে, তাহলে এই ঔষধ দিও', সংশয় বা আশঙ্কা প্রকাশার্থে 'যদি বৃষ্টি নামে, তাই ছাতা নিলাম' 'যখন এর অর্থ প্রকাশার্থে 'উপকার যদি করবে তো ভালোরূপে কর' ইত্যাদিতে 'যদি' ব্যবহার করায় কোন আকীদাগত ক্ষতি নেই। *(ফঃউঃ)*

প্রথমার্থে 'যদি' ব্যবহার করা ভাগ্যের উপর ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক।

উত্তম ধারণা

মুমিন আল্লাহ প্রসঙ্গে উত্তম ধারণা পোষণ করে। *(মুঃ ২৮৭৭)* আল্লাহর নিকট কিছু চাইলে সম্পূর্ণ মুক্ষাপেক্ষী ও বিনত হয়ে চায়। অতএব সে প্রার্থনায় বলে না যে, 'আল্লাহ! যদি তুমি চাও তো আমাকে ক্ষমা করে দাও, যদি চাও তো আমাকে শান্তি দাও।' বরং তাঁর কাছে একান্ত আগ্রহের সহিত চায়। বলে, 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে শান্তি দাও' ইত্যাদি। *(বুঃ ৬৩৩৯, মুঃ ২৬৭৮)*

পক্ষান্তরে যদি সে কোন বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার না করতে পারে বা তার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে, তবে সে এইরূপ দুআ করতে পারে। যেমন, যদি কোন কাজ তার সামনে এসেছে যা করা ভালো কিনা সে বুঝতে পারছে না, তখন বলে, 'আল্লাহ যদি এই কাজ আমার জন্য মঙ্গলদায়ক হয়, তাহলে তা হাসিল করে দাও। ক্ষতিকর হলে সে কাজ থেকে আমাকে দূরে রাখ। *(বুঃ ১১৬২)* আল্লাহ! যদি আমার জীবন বা বেঁচে থাকা আমার জন্য হিতকর হয়, তবে আমকে জীবিত রাখ। আর যদি আমার মরণ কল্যাণকর হয়, তবে আমার মরণ দাও' ইত্যাদি। *(বুঃ ৫৬৭১, মুঃ ২৬৮০)*

কারণ, মরণ সে চাইতে পারে না। মরলেই যে পরিত্রাণ পাবে, তাও নয়, তাই আল্লাহর উপর এর ভালো-মন্দ ন্যস্ত করে। পক্ষান্তরে মৃত্যুর কামনা করলে শুধু শহীদী মৃত্যু কামনা করে। *(বুঃ ২৭৯৭)* অথবা (খাঁটি) মুসলিম হয়ে মরার কামনা করে। *(কুঃ ৭/১২৫, ১২/১০১)* যেমন পরকালের শাস্তির চেয়ে পার্থিব শাস্তি সহজ হলেও তা আল্লাহর কাছে চায় না বরং উভয়কালের শাস্তি থেকে মুক্তি চায়। *(মুঃ ২৬৮৮)*

মুসলিম আল্লাহর কাছে মসীবতের জন্য (আসার পর) ধৈর্য চায়। কিন্তু মসীবত আসার পূর্বে তার জন্য ধৈর্য চায় না। তাই বলে না যে, 'দুঃখ যদি দিও প্রভু শক্তি দিও সহিবারে', 'আল্লাহ যদি আমাকে রোগ দাও, তবে সহ্য করার ক্ষমতা দিও।' বরং বলে 'প্রভু আমাকে দুঃখ দিও না, রোগ দিও না' ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যে ধৈর্য ধারণ করে না অথবা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয় অথবা ধারণা রাখে যে, তাকে আল্লাহ অকারণে শাস্তি দেবেন অথবা মনে করে যে, আল্লাহ মুমিনদের সাহায্য করেন না, তাহলে সে আল্লাহর প্রতি উত্তম নয় বরং মন্দ ধারণা রাখে; যা তাওহীদের প্রতিকূল, মহাপাপ ও মহাসর্বনাশ। *(কুঃ ৪৮/৬)*

বর্কত ও তাবার্রুক

তাবার্রুক কোন বস্তুর মাঝে মঙ্গল ও কল্যাণের আশা রাখা, শুভ ধারণা ও কামনা করা, প্রাচুর্য ও পবিত্রতার বিশ্বাস রাখাকে বুঝায়।

যাবতীয় বর্কত আল্লাহর তরফ থেকে আসে। যেমন, রুজী, রহমত তাঁরই তরফ থেকে। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নিকট বর্কত অনুসন্ধান করা শির্ক। যেমন, তিনি ছাড়া কারো নিকট রুজী বা রহমত চাওয়া শির্ক।

যে সমস্ত স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির তাবার্রুক গ্রহণ করা হয় তা শুধুমাত্র ইসলামের স্বীকৃতি ও অনুমতিতে হবে এবং জানতে হবে যে, ঐগুলি বর্কতের কারণ বা হেতু মাত্র; যার মাঝে বা দ্বারায় বর্কত হাসিল হয়ে থাকে। তা বর্কতদাতা নয়, বর্কতদাতা শুধু আল্লাহই। যেমন ঔষধ রোগমুক্তির হেতু বা কারণ; রোগমুক্তিদাতা নয়।

কি শরীফ, কি মুবারক, কিসে বর্কত আছে কি দ্বারা তাবার্রুক হবে, কোথায় কোন সময় কিভাবে বর্কতলাভ হবে তা শুধু শরীয়তই বলতে পারে। কারো ধারণা, ভক্তি বা তা'যীমের অতিরঞ্জন তা নির্ণয় করতে পারে না।

শরীয়ত কর্তৃক নির্ণীত মুবারক ব্যক্তিত্ব ছিল আল্লাহর খলীল, প্রিয় নবী ﷺ-এর। তাঁর মাঝে আল্লাহ্ বহু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক খায়র ও বর্কত পুঞ্জীভূত করেছিলেন। যে তাঁর নিকট তাবার্রুকের আশায় যেত, আল্লাহ তাকেও বর্কতপূর্ণ করতেন। সেই বর্কতের কথা সাহাবীগণও জানতেন এবং সৃষ্টির সেরা মানুষের নিকট সেই বর্কত লাভও করতেন। তার পবিত্র হাতের বর্কত নেবার জন্য পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর হাত ডুবার অপেক্ষা করতেন। *(মুঃ ২৩২৪)*

মাথার কেশ মুন্ডন করার সময় সাহাবীগণ তাঁর চার পাশে ঘিরে দাঁড়াতেন। তাঁর একটি চুলও মাটিতে পড়তে না দিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে সকলকে বন্টন করতেন এবং তার দ্বারায় তাবার্রুক হাসেল করতেন। *(মুঃ ২৩২৫)* যেমন ইসলামের মহান যোদ্ধা ও সেনাপতি খালেদ বিন অলীদ ﷺ যুদ্ধের সময় তাঁর পাগড়ীতে সেই চুল তাবার্রুক স্বরূপ বেঁধে রাখতেন। উম্মে সুলাইম (রাঃ) তাঁর দেহের ঘাম শিশিতে ভরে রাখতেন এবং তা খোশবুর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতেন বর্কত লাভের জন্য। *(মুঃ ১৮৭, মুঃ ২৩৪৫)*

সাহাবাগণ তাঁর ওযুর পানি বর্কতের আশায় পান করতেন। *(বুঃ ১৮৭, মুঃ ২৩৪৫)* তাঁর থুথু গায়ে মাখতেন। *(বুঃ ২৭৩২)* তাঁর উচ্ছিষ্ট পানি বর্কতের আশায় পান করতেন। *(বুঃ ৪৩২৮)* তাঁর পরিহিত লেবাস বর্কত লাভের জন্য পরিধান করতেন। কাফনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রেখে নিতেন। *(বুঃ ৬০৩৬)*

মোট কথা, তাঁর দেহ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, ঘাম, লেবাস এবং তাঁর ব্যবহৃত পাত্র ও অন্যান্য বস্তু সবই ছিল বর্কতপূর্ণ। তাঁরা তাতে বর্কতের আশা করতেন এবং ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করতেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের বর্কত ও কল্যাণ দান করেছেন।

এ তো আল্লাহর হাবীবের কথা। তিনি আর মানুষের মাঝে নেই। তাঁর ব্যবহৃত কোন জিনিস বা তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল বা অন্য কিছু সুনিশ্চিতভাবে তাঁরই বলে কোথাও সংরক্ষিত নেই। তাই সেই ধরনের তাবার্রুক গ্রহণ এখন আর সম্ভব নয়। আর তাঁর

মত কোন হাবীব নেই, যাঁর দেহ বা দেহাংশ নিয়ে মানুষ তাবার্রুক নিতে পারে বা বর্কতের আশা করতে পারে।

শরীয়ত কিছু কথা ও কাজকে বর্কতপূর্ণ বলে নির্ণীত করেছে। যেমন আল্লাহর যিক্র ও তাঁর কিতাবের তেলাঅত। যার দ্বারায় মুসলিম আল্লাহর নিকট বহু বর্কত লাভ করতে পারে। কুরআন পাঠের মাধ্যমে রোগমুক্ত হতে পারে। *(কুঃ ১৭/৮২, বুঃ ২৬৩৭, মুঃ ৮০৪, ২২০১)*

দ্বীনী ও ইলমী মহফিল (জলসা) করা। *(মুঃ ২৬৯৯)* জিহাদ করা ও শহীদ হওয়া। *(তিঃ ১৭২৮)* এ ছাড়া একত্রে খাওয়া, খাবার শেষে আঙ্গুল চাটা ইত্যাদি বর্কত হওয়ার কারণ। *(মুঃ আঃ২০৩৪১,৩/৫০১)*

মোট কথা, প্রতি কথা ও কাজ যা আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ বলতে বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, মানুষ তা যদি ঈমান রেখে সত্য জেনে মহানবী ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ করে পালন করে থাকে, তাহলে তাতে অবশ্যই বর্কত ও সার্বিক কল্যাণ লাভ হবে।

অনুরূপভাবে শরীয়ত কিছু স্থানকে মুবারক বলে চিহ্নিত করেছে। যেমন, মসজিদ। *(মুঃ ৬৭১)* তবে মসজিদের বর্কত তার দেওয়াল, মিম্বর বা ধুলো ছুঁয়ে বা ব্যবহার করে নয়। তার বর্কত সেখানে এ'তেকাফ করলে, নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করলে, জামাআতে নামায পড়লে, ইল্মী মজলিসে অংশ গ্রহণ করলে লাভ হয়। তাছাড়া অন্য কিছু বর্কত নয়, বিদআত।

মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বর্কত রয়েছে কা'বার মসজিদে; এখানকার ১টি নামায ১ লাখ নামায অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর মসজিদে নববীতে; এখানকার ১টি নামায এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর মসজিদুল আক্সায়; এখানে নামায পড়লে নামাযী নিষ্পাপ হয়ে যায়। অতঃপর কুবার মসজিদে; এখানে ১টি নামায একটি উমরার সমান। *(মুঃ ১৩৯৪,মুঃ আঃ ৩/৪৮৭,নাঃ ৬৯০, ইঃমাঃ ১৪১২)*

মক্কা মুকার্রামা, মদীনা নববীয়া এবং শাম (সিরিয়া) পবিত্র এবং মুবারক স্থান। *(মুঃ ১৩৬০, মুঃ আঃ ৫/ ১৮৫)* অতএব যে ব্যক্তি মক্কা, মদীনা এবং শামে বর্কতের আশায় বাস করবে তার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে বর্কত ও কল্যাণ লাভ হবে। কিন্তু যে শরীয়তী সীমা অতিক্রম করে তার মাটি ছুঁয়ে বা গায়ে মেখে, পাথর বা গাছপালা স্পর্শ করে বর্কতের আশা করে, মাটি দ্বারা আরোগ্যলাভের আশা করে সে ক্ষতিগ্রস্ত। তদনুরূপ আরাফাত, মুযদালিফা, মিনাও পবিত্র স্থান। তবে তা নির্দিষ্ট দিনের জন্য।

শরীয়ত নির্ণীত পবিত্র ও মুবারক কাল বা সময় যেমন, রমযান মাস, শবেকদর, জুমআহর দিন, সোমবার, বৃহস্পতিবার, হারামের চার মাস (রজব, যুলকাদা, যুলহাজ্জাহ ও মুহার্রাম; যার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি হারাম)। যুলহাজ্জার প্রথম দশদিন, ১০ই মুহার্রাম বা আশূরার দিন, প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ ইত্যাদি।

এই সকল সময়ে মুসলিম শরীয়তের নির্দেশিত পথে বর্কত অর্জন করে। অন্য পথে কোন কাজ করলে বর্কত না হয়ে বে-বর্কতের বিদআত হবে। যেমন, রমযান মাসে রোযা করে, শবেকদরে নফল ইবাদত করে, জুমআর আগে নফল পড়ে, অধিক দরূদ পাঠ করে এবং দুআ কবুল হওয়ার মুহূর্ত অন্বেষণ করে, সোম ও বৃহস্পতিবার সুন্নত রোযা রেখে, আশূরা ও তার আগে কিংবা পরের দিন রোযা করে। যুলহজ্জের ১০ দিন নফল ইবাদত এবং বিশেষতঃ ৯ তারিখে (আরাফাতে না হলে) রোযা করে, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে মুসলিম প্রভৃত বর্কতের আশা করে।

শরীয়ত নিরূপিত বর্কতপূর্ণ খাদ্যসামগ্রী যেমন, যয়তুন তেল, দুধ, কালো জিরে, আজওয়া নামক খেজুর, ছত্রাক, মধু, বৃষ্টি ও যমযমের পানি ইত্যাদি। প্রাণীর মধ্যে ঘোড়া, ছাগল এবং বৃক্ষাদির মধ্যে খেজুর ও যয়তুন বৃক্ষ বর্কতময় বলে চিহ্নিত হয়েছে। মুসলিম ব্যবহার-পদ্ধতি জেনে ব্যবহার করলে বহু বর্কতলাভ করতে পারে।

কিন্তু যে স্থান, কাল ও পাত্রকে শরীয়ত মুবারক বা শরীফ বলে চিহ্নিত করেনি, অথবা তাবার্রুকের যে পদ্ধতি শরীয়ত বর্ণনা করেনি, সে স্থান-কালকে মুবারক বা শরীফ মনে করা ও সেই পদ্ধতিতে তাবার্রুক গ্রহণ করা বিদআত হবে। আবার শির্কও হতে পারে। কারণ, তাবার্রুক এক ইবাদত। অতএব তা শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া একান্ত জরুরী।

তাই বিপদ বা রোগ দূরীকরণার্থে মসজিদের ধুলা ব্যবহার। আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য দিনে সেখানে উপস্থিত হয়ে বর্কতের আশা করা। বুযুর্গদের গা-পা ছুঁয়ে আম্বিয়া ও আওলিয়াদের কবর ছুঁয়ে বা যিয়ারত করতে গিয়ে তাবার্রুক মনে করা, (পারমার্থিক অথবা প্রাতিভাষিক) আওলিয়া অথবা বাউলিয়াদের জন্ম বা মৃত্যুস্থানকে মুবারক বা শরীফ ভাবা, মহানবী ﷺ-এর জন্মস্থান (নির্দিষ্টভাবে যে স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন), জাবালে রহমত (?) (আরাফাতের এক পাহাড়), উহুদ পর্বত, সাইয়েদুশ শুহাদা', মাসজিদে খামসাহ, বাকী' (মদীনা শরীফের), বদর, খায়বর, হিরা' ও সওর গিরিগুহায় (মক্কায় শরীফে) উপস্থিত হয়ে তাবার্রুকের আশা করা, তিনি যে সমস্ত জায়গায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নামায পড়েছেন সে স্থানে তাবার্রুকের ইচ্ছায় নামায পড়া, মাকামে ইব্রাহীম (পাথরের উপর হযরত ইব্রাহীম ﷺ-এর পদচিহ্ন) কা'বা শরীফের গিলাফ, কব্রে নববীর রেলিং, মসজিদে নববীর মিম্বর ও মেহরাব স্পর্শ করে হাত গায়ে বুলিয়ে তাবার্রুকের অনুমতি শরীয়তে নেই। এমনকি হাজরে আসওয়াদ (কা'বা শরীফের পূর্ব কোণে স্থাপিত কালো পাথর) ([39]) যা হজ্জ ও উমরার তওয়াফকালে চুম্বন করা হয় অথবা স্পর্শ বা ইশারা করা হয় এবং রুক্নে য়্যামানী (শুধু) স্পর্শ করা হয় তা কোন তাবার্রুকের জন্য নয়। বরং তা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে -যা তিনি হজ্জ ও উমরায় সুন্নত করেছেন- এবং সেই অনুসরণের ফলে নেকী লাভের আশায়।

হাজরে আসওয়াদ কারো কিছু ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। *(মুঃ ১২৭০,আঃদাঃ ১৮৭৩, তিঃ ৮৬০, নাঃ ২৯৪০)* চুম্বনকালে হাজীর পাপও চুষে নেয় না।

পাথরে হযরত আদম ﷺ-এর পদচিহ্ন ছিল (কথাটি ভিত্তিহীন) বলে চুম্বন করা হয় না। পাথরটিকে চুম্বন করা হয় জান্নাতের একটি স্মৃতি বলে। জান্নাতকে কে না ভালোবাসে, কে না চায়? প্রীত বস্তুর সম্পৃক্ত প্রতি জিনিসকেও সবাই ভালোবাসে। হাজরে আসওয়াদ বেহেশ্ত থেকে মর্তে উপস্থাপিত হয়েছে। *(তিঃ ৮৭৭, সঃ জাঃ ৩১৭৪)* তাই সেই প্রীত-বস্তুর প্রেমে আল্লাহর নবী ﷺ-এর অনুকরণে হাজীগণ তা চুম্বন করে থাকেন এবং এই ইত্তেবা বা অনুকরণের বর্কতে (পাথরের বর্কতে নয়) এবং সমস্ত হজ্জ কার্য সমাপ্ত করলে (এবং তা কবুল হলে) হাজীর পাপ ক্ষয় হয়। আল্লাহর রসূলের মহব্বতে তা চুম্বন করলে পাথরটি কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে তা চুম্বনের উপর চুম্বনকারীর জন্য সাক্ষ্যদান করবে। *(সঃ জাঃ ৫২২২, ইঃ মাঃ২৯৪৪, মিঃ ২৫৭৮)* পক্ষান্তরে তা

---

(৩৯) এটি আসলে বেহেশ্তের পাথর। এটি এক কালে জ্যোতির্ময় শুভ্র ছিল। আদম সন্তানের শির্ক ও পাপ ঐ পাথরটিকে কৃষ্ণ করে ফেলেছে। (তিঃ ৮৭৭,মুঃআঃ ১/৩০৭,সঃজাঃ ৬৬৩২) অনুরূপ রুক্নে য়্যামানীও একটি জান্নাতের পাথর।

চুম্বন বা স্পর্শ না করলেও হজ্জের কোনই ক্ষতি হয় না। অতএব এটাকে পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করা একেবারে গা-জোরামি ব্যতীত কিছু নয়।

তেমনি কা'বা শরীফ কোন মাযার নয়। কারো কবর আছে বলে যিয়ারত বা তওয়াফ করা অথবা তাকে কেবলা বানিয়ে নামায পড়া হয় না। তা একমাত্র আল্লাহর ঘর, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যাবতীয় ইবাদত ওখানে করতে হয়। সমগ্র মুসলিম জাহানকে একসূত্রে গাঁথার জন্য, তাদের মন-প্রাণ এক করে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য এই গৃহাভিমুখে নামায পড়া হয় এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে সকলকে এখানেই আসতে হয়। উদ্দেশ্য কা'বা নয়, উদ্দেশ্য যাঁর কা'বা তিনিই। তাঁরই আদেশ ও নির্দেশ মতে তাঁরই উপাসনা করা হয়।

"মানুষের জন্য কা'বাগৃহ পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ; যা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। যাতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে -মাকামে ইব্রাহীম- এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ। *(কুঃ ৩/৯৬)*

অতএব পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর -যা ফিরিশ্তাগণ বা হযরত আদম ﷺ (মতান্তরে) হযরত ইব্রাহীম ﷺ কর্তৃক নির্মিত হয়। তবে তাঁরা কার কবরের উপর মাযার তৈরী করলেন? এ কথা মাযারীদের মাযার-পূজার বৈধ করার মানসে অলীক অনুমান ছাড়া কিছু নয়।

সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর পবিত্র মক্কাভূমির বায়তুল্লাহর হজ্জ জীবনে একবার ফরয। *(কুঃ ৩/৯৭)* ফরয আদায়ের জন্য মুসলিম বহু অর্থব্যয় করে মক্কা শরীফ আসে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর, আল্লাহর মুবারক ঘরকে কেন্দ্র করে তওয়াফ করে আল্লাহ সন্তুষ্টির আশায়। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে, রুক্নে য়্যামানী স্পর্শ করে। হাজরে আসওয়াদ ও কা'বাদ্বারের মধ্যবর্তী দেওয়ালে বক্ষ লাগিয়ে আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জানায়। বর্কতের কুঁয়া যমযমের পানি পান করে, আল্লাহর ধ্যানে তন্ময় হয়ে আলুথালু বেশে মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান করে। জামরাতে পাথর মারে, কুরবানী করে, মস্তক মুন্ডন করে। মক্কা ও মদীনার হারামের মর্যাদা রক্ষা করে; সেখানে কোন প্রকারের ঝগড়া বিবাদ করে না, হারামের কোন গাছ, কাঁটা বা ঘাস নষ্ট করে না, পশু-পাখী শিকার করে না ইত্যাদি। এসব কিছু একমাত্র আল্লাহর তা'যীম, তুষ্টি বিধান ও তাঁর আদেশ পালন এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর অনুকরণার্থে মুসলিম করে থাকে।

অতএব কোনও বুযুর্গ বা ওলীর কবর যিয়ারতে হজ্জ বা হজ্জের সওয়াবের আশা রাখা, কোনও কবরকে বিকল্প কা'বা বানিয়ে তার তওয়াফ করা, ওলীর সন্তুষ্টির আশা করা কোনও পাথর, কবর কিংবা মাযার চৌকাঠে হাজরে আসওয়াদের মত চুমু দেওয়া, সেখানকার ধুলোমাটি স্পর্শ করে গায়ে মাখা বা খাওয়া, মাযারের স্তম্ভ বা দেওয়াল বুকে লাগিয়ে ওলীর কাছে প্রার্থনা করা, কোন ঝরনাকে বিকল্প যমযম বানিয়ে তার পানি বর্কতস্বরূপ পান করা, ওলীর ধ্যানে বসা, মাযার সংলগ্নে বাস করা ও তার খিদমত করা, কোন বিকল্প জামরায় পাথর ছুঁড়া, সেখানে খাসি-মুরগী ইত্যাদি যবেহ (কুরবানী) করা, মাথা নেড়া করা, সে স্থানের মর্যাদা রক্ষা করা, সেখানকার গাছ-পালার সম্মান করা, পশু-পাখী শিকার না করা ইত্যাদি যা কিছু ওলীর তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করে তাঁর কাছে কিছু পাবার আশা করা হয় তা নিশ্চয় হারাম, বিদআত ও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে কোন নদী বা পুকুরের পানিকে পবিত্র মনে করে গোসল করা, কোন মাযারের সিন্নি বা 'ধুলফুল' বা অন্য কিছু (যেমন, কবরের চাদর, গাঁজার ছাই ইত্যাদির

প্রসাদ) কে তাবার্রুক বলে ব্যবহার করার অনুমতি ইসলামে নেই।

অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট দিনকে (শরীয়ত নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত) পবিত্র বা পালনীয় মনে করা এবং বর্কতের মনে করাকে শরীয়ত অনুমতি দেয় না। যেমন, নবী দিবস, শবেমি'রাজ, শবেবরাত বা অন্য কারো জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস ইত্যাদি।

তাবার্রুক বা অভীষ্ট লাভের আশায় 'আল্লাহ' বা কোন কুরআনী আয়াত লকেটে লিখে গলায় লটকানো, কিংবা কাঁচে বাঁধিয়ে দেওয়ালে বা গাড়িতে ঝুলানোর নির্দেশ ইসলামে নেই। আবার পাশাপাশি 'আল্লাহ-মুহাম্মাদ' সমভাবে লিখে, 'ইয়া মুহাম্মাদ' 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' 'ইয়া আলী' 'ইয়া হুসাইন' 'ইয়া গরীব নেওয়ায' লিখে, কা'বা, মসজিদে নববী বা অন্য কোন মসজিদ বা মাযারের ছবিতে তাবার্রুক গ্রহণ কিংবা বালা মসীবত দূর করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন অভীষ্ট লাভের আশায় গলায়, বাড়ির দেওয়ালে অথবা গাড়ি ইত্যাদিতে ঝুলানো শির্কের পর্যায়ে পড়ে।

আল্লাহ অতি দয়াশীল। বান্দাকে ইচ্ছা করলে এমনিই বহু কিছু দান করতে পারেন। তবুও তিনি বান্দার কাছ থেকে কিছু বিনিময় আনুগত্যরূপে পেতে চান। বান্দা যদি আল্লাহকে খুশী ও রাজি করতে পারে তবে নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার আশা পূর্ণ করেন। কিন্তু আল্লাহকে তুষ্ট করার জন্য মিসকিন বান্দার আছেই বা কি? একমাত্র তাঁর ইবাদত, আনুগত্য ও গুণগান ছাড়া আর কি দিয়েই বা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে? তাই বান্দা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাঁর রহমত ও জান্নাত পাবার জন্য এবং তাঁর অসন্তুষ্টি, গযব ও দোযখের আযাব থেকে বাঁচার জন্য এই অসীলা বা মাধ্যম ব্যবহার করে। আল্লাহও বান্দাকে সেই অসীলাই অনুসন্ধান করতে বলেছেন। *(কুঃ ৫/৩৫)* যে অসীলায় তিনি রাজী হন; সমস্ত মুফাসসেরীনদের মতে সেই অসীলার অর্থ আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য, নেক আমল ও মহব্বত। *(তঃ ইঃ কাঃ ২/৫২, যাঃ মাসঃ ২/৩৪৮, তাঃ কাঃ রাঃ ২/২৮৫, দুঃ মঃ ৩/৭১, সঃ তাঃ ১/৩৪০, তঃ মাঃ ৬/৩৬৯)*

কোন্ অসীলার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়া যায়, বান্দার আবেদন মঞ্জুর হয় তা বান্দা জানে না। তাই তা জানতে বা অসীলা চিনতে শরীয়তের নির্দেশ নিতে হয়। নচেৎ সমুদ্রের জাহাজ-ডুবিতে রাতের অন্ধকারে কুমীরকে কাষ্ঠফলক মনে করে তাঁর উপর চড়ে বসে তাকে নাজাতের অসীলা ভাবলেও আসলে তা হালাকের অসীলা। অচিরে তাতে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

শরীয়তে মাত্র তিন প্রকার অসীলা ব্যবহারের অনুমতি বা নির্দেশ রয়েছেঃ

১। আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনা ও সিফাতে উলা (তাঁর সুন্দরতম নাম এবং মহত্তম গুণাবলীর) অসীলা। যেমন বান্দা বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি রহীম ও রহমান, কাদের ও গাফ্ফার, তুমি আমার উপর রহম কর, আমাকে ক্ষমা করে দাও।' অথবা 'হে আল্লাহ.তোমার রহমতের অসীলায় বা ইয্যত ও কুদরতের অসীলায় বা তোমার নামের অসীলায় আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল প্রার্থনা করছি তুমি আমাকে তা দান কর।' ইত্যাদি। *(কুঃ ৭/১৮০, সিঃ সঃ ১৯৯, মুঃ আঃ ১/৩৯১, ৪৫২)*

২। নেক আমল বা ভালো কাজের অসীলা। যেমন বান্দা দুআ করে 'আল্লাহ! আমি

ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' *(কুঃ ৩/১৬,৫৩,১৯৩)* অথবা 'হে আল্লাহ! তোমার উপর আমার ঈমান ও মহব্বত এবং রসূলের ইত্তেবার অসীলায় আমার মসীবত দূর করে দাও।' অথবা 'আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমার পিতা-মাতাকে খুশীতে রেখেছি এবং তাদের বাধ্য হয়ে চলি, অথবা তোমারই তুষ্টি বিধানের আশায় আমি সকলের আমানত রক্ষা করি, খেয়ানত করি না, দান করি, অথবা তোমারই সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে আমি যৌবনে ধৈর্য ধরেছি, সুযোগ সত্ত্বেও ব্যভিচার করিনি- অতএব তুমি আমার বালা মসীবত দূর করে দাও।' *(বুঃ ২২৭২)*

৩। জীবিত কোন নেক সালেহ ও মুত্তাকী (কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল করেন এমন) ব্যক্তির দুআ। যেমন কোন ব্যক্তি বড় মসীবতে পড়েছে। সে তার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করে এবং এ সরাসরি দুআয় সে রক্ষা পেতেও পারে। কিন্তু সে জানে যে, সে বড় গোনাহগার, হয়তো বা তার দুআ কবুল নাও হতে পারে। (কারণ, দুআ কবুল হবার শর্ত আছে, যেমন হালাল খাওয়া-পরা ইত্যাদি) অতএব সে কোন মুত্তাকী লোকের কাছে এসে আল্লাহর নিকটে দুআর আবেদন করে। যাতে তার বিপদ দূর হয়ে যায়। অথবা অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির সময় কোন পরহেযগার আলেমের দুআর অসীলায় বৃষ্টি চায়। *(বুঃ ১০১০)*

এই তিন প্রকার অসীলা ছাড়া আর কোন অসীলায় আল্লাহর নিকট নাজাত অথবা অন্য কোন অভীষ্ট লাভের আশায় প্রার্থনা করা যায় না। অন্য কথায় এ তিন অসীলা ছাড়া কোন অসীলাই নয়। তাই নবী-রসূল, আলী-ফাতেমা, হাসান-হুসাইন, ওলী বা কোন বুযুর্গের ব্যক্তিত্ব, মান বা মর্যাদার অসীলায়, অথবা আরশ-কুরসী বা অন্য কোন মখলুক বা সৃষ্টির অসীলায় মুসলিম প্রার্থনা করতে পারে না, নাজাতও পেতে পারে না। নাজাতের অসীলা কেবল ঈমান ও আমল।

কোন বাদশার কাছে কোন আবেদন পেশ করতে হলে সরাসরি তাঁর নিকট পৌঁছান যায় না। বরং তাঁর দারোয়ান, সিপাই কিংবা কোন মন্ত্রীর অসীলা বা সাহায্য নিতে হয়। অনুরূপভাবে কোন আদালতে মুকাদ্দামা পেশ হলে সরাসরি হাকীমের সাথে কোন যোগাযোগ সম্ভব হয় না। বরং নিরপরাধ প্রমাণ করতে উকীল ধরার প্রয়োজন হয়। কারণ, রাজা বা হাকীমের স্থান এত উচ্চে যে তাদের সাথে সাধারণ লোকের সরাসরি সাক্ষাৎ করা, কোন আবেদন পেশ করা বা কোন কথা বলা মুশকিল ও অসম্ভব। অতএব আল্লাহ যিনি সকল রাজাদের রাজা, সকল হাকীমদের হাকীম তাঁর নিকট কোন প্রিয় নবী বা ওলীর অসীলা ছাড়া সাধারণ মানুষের কোন আবেদন পৌঁছানো কি করে সম্ভব? কোন অমাত্যের সহায়তা বিনা যেমন রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, উকীল না ধরে যেমন, মুকাদ্দামায় হেরে যেতে হয়, তেমনি বিনা কোন নবী-ওলীর অসীলায় আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিন্তু মানুষের মন এত নিচ যে, সে সেই বিশাল ন্যায়পরায়ণ সুবিচারক দয়ালু বাদশার শানে এ ধরনের ধারণা রাখে এবং তাঁকে দুনিয়ার কোন জালেম, স্বৈরাচারী ও অহঙ্কারী রাজার সঙ্গে তুলনা করে, যে প্রজাদের অবস্থা বুঝে না। তার ও প্রজাদের মাঝে কত অন্তরাল, দুয়ার ও দারোয়ান, কত দেহরক্ষী ও অন্তরায় নির্ধারিত করে। প্রজাদের সহিত কোন মাধ্যম বিনা কথা বলা তার নিয়ম নয়। কখনো বা রাজাকে কখনো বা মাধ্যমকে (অসীলাকে) উপঢৌকন কা ঘুষ ইত্যাদি দিয়ে কোন বিষয়ে রাজি করাতে হয়।

দুনিয়ার হাকীম অপরাধীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে বুঝতে পারে না। সে ঠিক

সেই মত বিচার করে, যে মত উকীল তাকে শুনায়। কখনো বা ঘুষ দ্বারা মিথ্যা মামলা সাজানো হয়। অপরাধী নিরপরাধ এবং নিরপরাধ অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

অতএব এই রাজা ও হাকীমের সাথে সেই মহান বাদশার তুলনা! যিনি বিনা কোন মাধ্যমে সকলের অবস্থা জানতে পারেন। যাঁর দরবারে ঘুষ-তোষণের বালাই নেই! যাঁর আদালতে বিন্দু পরিমাণ যুলুম নেই!

এ নীচমনা মানুষ কাকে কার সাথে তুলনা করে! আল্লাহর তা'যীম, ভয়, ভক্তি প্রেম সব যে ধূলিসাৎ হয় এই ধারণাতে!

একজন বাদশাহ নিজ প্রজাদের সাথে সরাসরিভাবে কথা বলেন। প্রজারা তাদের আবেদন বিনা কারো বাধায় সরাসরি বাদশাহর দরবারে পেশ করতে পারে। বাদশাহ তাদের নিবেদন সরাসরিই মঞ্জুর করেন। আর অপর একজন বাদশাহ যিনি প্রজা থেকে দূরে থাকেন। কোন মাধ্যম, পেশকার বা একান্ত সচীব ছাড়া তাঁর কাছে কোন আবেদন পেশ করা বা প্রজাদের নিজের কোন অবস্থা জানানো সম্ভব নয়। এই ছোট মনের মানুষের কাছে কে বেশী উত্তম?

এই মানুষই আবার হযরত উমার ﷺ-এর বাদশার শতমুখে তা'রীফ করে, তাঁকে নিয়ে গর্ব করে। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী বাদশাহ। মুসলিমদের খ্যাতনামা খলীফা। তাঁর মাঝে অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা ছিল না। তাঁর দেহরক্ষী বা অন্যান্য আরক্ষী-প্রহরীও ছিল না। তিনি সকল মানুষের নিকটে থাকতেন। সবচেয়ে দুর্বল শ্রেণীর সাধারণ মানুষও তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে কথা বলতে পারত। নিজের বেদনা-ব্যথা জানাতে পারত। গ্রাম্য পরিবেশের অমার্জিত মূর্খ কটুভাষী মানুষও বিনা কোন মাধ্যম ও পেশকার ছাড়াই তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আবেদন পেশ করতে পারত। খলীফা সরাসরি তার ফরিয়াদ শুনে প্রয়োজন মিটাতেন।

অতএব তাঁর কাছে এই ধরনের বাদশাহ ভালো, নাকি সেই ধরনের বাদশাহ, যার সাথে আল্লাহকে তুলনা করে এবং তাঁর উপমা দেয়? ন্যায়পরায়ণ সর্বজনপ্রিয় বাদশার প্রশংসা করে জালেম ও দাম্ভিক বাদশার সহিত মহামহিমান্বিত আল্লাহর তুলনা! জ্ঞান-বিবেকের আলো কোথায় এ শ্রেণীর মানুষের?

পক্ষান্তরে আল্লাহর কোন উপমাই নেই। *(কুঃ ১৬/৭৪)* তাঁর জন্য সর্বপ্রকার উন্নত গুণ শোভনীয় এবং সম্যক্ কামাল বা পূর্ণতা কেবল তাঁরই জন্য। *(কুঃ ১৬/৬০)*

তাঁকে যদি হযরত উমারের সাথেও তুলনা করা হয় এবং তাঁর উপমা দেওয়া হয় তবে কাফের হতে হয়। সুতরাং কোন জালেম, দাম্ভিক ও গর্বোদ্ধত বাদশার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করলে কোন্ পর্যায়ের কাফের হতে হয় তা সহজেই অনুমেয়।

মোট কথা, মুসলিম কোন নবী, ওলী বা বুযুর্গকে তার নাজাতের অসীলা বলে মনে করে না। বাদশার বাদশা তিনি সবার নিকটে, সবার সাথে। তিনি সরাসরি সবার আবেদন শুনে থাকেন। তাই তাঁকেই সরাসরি নিজের আবেদন, দুঃখ-জ্বালা, বেদনা-ব্যথা ও প্রয়োজন জানায়। তিনি সরাসরি তা মঞ্জুর করেন। *(কুঃ ২/১৮৬)* তিনি ইচ্ছা করলে বান্দাকে নাজাত দিবেন, নচেৎ কারো মর্যাদা বা যশের খাতিরে কাউকে নাজাত ও নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হবেন না। এর বিপরীত রকম বিশ্বাস রাখাই মহাপাপ।

আবার যদি কেউ মনে করে যে, আমরা পীর-পয়গম্বর বা দেবতাকে খোদা বলে মানি না, শুধুমাত্র তাঁর আযাব থেকে নাজাতের বা বেড়া পার হবার অসীলা এবং সুপারিশকারী বলে মানি। খোদার কাছে তাঁদের মর্যাদা আছে, খোদা তাদের কথা সদা শুনে থাকেন।

আমরা বাঁচার পথ চিনি না। তারা তাঁর সমীপে আমাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা বা সুপারিশ করবেন। তিনি তা অগ্রাহ্য করবেন না। ফলে আমরা পার পেয়ে যাব। (বিনা কষ্টে কেষ্ট লাভ হবে)। তাই তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের উপাসনা, তাঁদের নামে নযর-নিয়ায নিবেদন করা।

কি ধোকাব্যঞ্জক ধারণাই না বটে! এরূপ মানা যদি কোন দোষের না হয় তবে মক্কার মূর্তিপূজক মুশরিকদের কি দোষ ছিল? তারাও তো কোন মূর্তিকে আল্লাহ বলে মানত না, বরং তাদের কাছে শুধু আল্লাহর দরবারে সুপারিশের আশা করে তাদের পূজা করত। তবে তাদের সহিত ইসলামের দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিসের ছিল? হতভাগ্য মানুষ যিনি নিকটে তাঁকে দূর ভেবে পুনরায় তাঁর নৈকট্য চায় অপরের সাহায্যে; যাদের কোন প্রকার ক্ষমতা নেই- না তাদেরকে মুক্তি দেবার, আর না-ই তাদের জন্য সুপারিশ করার। *(কুঃ ২৪/৩, ১০/১৮)*

সুতরাং মুসলিম তাঁর নৈকট্যের জন্য অপর কোন সৃষ্টির সাহায্য নেয় না। তাঁর কল্পনা করে তাঁর খেয়ালি প্রতিমা গড়ে পূজা তো দূরের কথা তাঁর কোনরূপ আকৃতির কল্পনাও মনে আনে না। কারণ, কোন কল্পনাই তার ধারে-কাছে পৌঁছাতে পারে না। কোন কল্পিতরূপ তাঁর নেই। তাঁর মত কিছুই নেই। *(কুঃ ১৬/৭৪)* মানুষের কল্পনা-ধারণা তাঁকে ধরতেই পারে না। চায়ের পিয়ালায় একবিন্দু পানি দেখে সেই বিশাল সিন্ধুর কল্পনাই হয় না। শুধু শুধু তাঁর পূজা হয়, অথচ যে আশায় পূজা হয় তার কিছুই পূরণ হয় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর আসনে তাদেরকে সমাসীন করে অথবা অংশী স্থাপন করে তাঁর গযব ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাই সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) ও মহাপুরুষদের আন্দোলন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ছিল এবং তাই ইসলামে মূর্তি বা ছবি তৈরী হারাম। আর তার জন্য মুসলিম আপন পিতা-মাতা বা কোন বুযুর্গের ছবি দেওয়ালে গেঁথে তাতে ফুল চড়ায় না, ধূপ-বাতি জ্বালায় না। তার সামনে ঝুঁকে মাথা নত করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে না, আশির্বাদ চায় না। কারণ, এসব শির্ক এবং পৌত্তলিকতারই শামিল।

আল্লাহ প্রেম

মুমিনের নিকট সবচেয়ে অধিক প্রিয়মত তার প্রতিপালক আল্লাহ। সে তার জীবন, তার পিতা, পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, সম্পদ, ব্যবসায়, আবাসভূমি- এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগতের চেয়ে আল্লাহকে এবং তাঁর জন্য তাঁর রসূলকে অধিক ভালোবাসে। এছাড়া সে মুমিনই হতে পারে না। *(কুঃ ৯/২৪, বুঃ ১৬)*

তাই তো আল্লাহ ও রসূল ﷺ-কে ভালোবাসতে কারো অসন্তোষ, ক্রোধ, ঘৃণা, শত্রুতা ও বিরোধিতাকে পরোয়াই করে না। দ্যুলোকে-ভূলোকে সকলকে পরিহার করে শুধু আল্লাহ ও রসূলের প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ হয়। আল্লাহ ও রসূলের ([40]) বাণী ও নির্দেশাবলীকেই তার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান বা জীবন-সংবিধান বলে মানে। আল্লাহ ও রসূলের ফায়সালার উপর তার কোন ইচ্ছা বা এখতিয়ার থাকে না। *(কুঃ৩৩/৩৬)*

মুমিন যাকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্যই বাসে এবং মন্দবাসে তো তাঁরই জন্যই। তাই

([40]) *'আল্লাহ ও রসূল' দুই বিশেষ্যের পরিবর্তে 'তাঁদের' সর্বনাম ব্যবহার করা যায় না। কারণ, তাতেও শির্কের গন্ধ থাকে। (মুঃ ৮৭০)*

কাউকে ভালোবাসার পূর্বে সে তার প্রেমিককে আল্লাহ প্রেমের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়। যদি সে আল্লাহর প্রেমাস্পদ হবার যোগ্য হয় অথবা সে যদি আল্লাহকে প্রেমাস্পদ বানিয়ে থাকে, তবেই তাকে নিজের প্রেমাস্পদ বানায়; নচেৎ না। বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা করে তাঁরই খাতিরে। বৈরিতা করে ও লড়াই লড়ে তো তাঁরই কারণে। তাঁরই জন্য খোদাদ্রোহী ও মুশরিক, নাস্তিক ও কাফেরদের সাথে তার কোন আপোষ নেই, অন্তরঙ্গতা নেই। *(কুঃ ৩/২৮, ৫/৫৭)* কারণ, সে ভালোবাসে তাকে, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে এবং মন্দবাসে তাকে, যে আল্লাহ ও তাঁর নবীকে মন্দবাসে।

মুসলিম আল্লাহর ভালোবাসায় কাউকে শরীক করে না। সে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে এমন ভালোবাসা বাসে না, যেমন সে আল্লাহকে বাসে। অথবা এমন ভালোবাসে না যেমন, আল্লাহকে বাসা উচিত ছিল। কারণ, তাতে মুশরিক হতে হয়। *(কুঃ ২/১৬৫)*

মুসলিম আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন ও চিহ্ন কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ ও উপদেশাবলীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। *(কুঃ ৩/৩১)* বিনা আমলে ভক্তি মিথ্যা। কারণ, প্রেমিক তার প্রিয়তমের কোনদিন অবাধ্যতা করতে পারে না। তার মন প্রিয়তমের মনমত চলে -তবেই ভালোবাসা সত্য হয়, প্রেম খাঁটি হয়।

মুসলিম যা নিজের জন্য পছন্দ করে তা অপরের জন্যও করে। আর যা তার নিকট অপছন্দনীয় তা অপরের জন্যও অপছন্দনীয় মনে করে। *(বুঃ ১৩)* আপোষে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন রাখে। *(কুঃ ৩৯/১০)* ভালো কাজের আদেশ দেয় ও তাতে পরস্পরকে সাহায্য করে এবং মন্দকাজে বাধা দেয় ও তাতে পরস্পরকে কোন প্রকারের সাহায্য করে না। আর নিজেও তাতে অংশ গ্রহণ করে না। *(কুঃ ৫/২,৯/৭১)* হাত বা মুখ দ্বারা বাধা দিতে না পারলে তার অন্তর তাতে ঘৃণাবোধ করে। নচেৎ সে মুমিন থাকে না। *(মুঃ ৪৯)*

মুমিন যেমন আল্লাহকে ভালোবাসে তেমনি ভয়ও করে সর্বাধিক। তাঁর আযাব, গযব, হিসাব জাহান্নাম ও তার ভয়ানক অগ্নিকে ভয় করে। তাই কোন পাপ অসৎ কর্মে নামতেই ভয় করে।

মুসলিম শুধু তাঁকেই ভয় করে। তাঁকে যেমন ভয় করে তেমন আর কাউকে করে না। কোন শক্তি ও প্রতাপকেও নয়। *(কুঃ ৩৩/৩৯)* তার উন্নত শির তিনি ছাড়া আর কারো সম্মুখে অবনত হয় না। আল্লাহর শাস্তির সামনে সৃষ্টির কোন শাস্তিকে সে কিছুই মনে করে না। আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে কারো তুষ্টি সে চায় না। *(কুঃ ২/১৫০)*

মুমিন আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকে নিরাশ হয় না। *(কুঃ ১২/৮৭, ৩৯/৫৩)* পাপ করে ফেললে তাঁর দয়া ও ক্ষমার আশা রাখে ও তওবা করে। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যায় না। তাঁর মকর ও চক্রান্ত থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। *(কুঃ ৭/৯৯)*

তাঁর জান্নাতের লোভ রাখে, দর্শনের আশা রাখে। তবে তাঁর দয়া ও রহমতের ভরসা রেখে আমল ত্যাগ করে না। আমল করার সাথে সাথে তাঁর করুণার আশা রাখে। আবার শুধু নিজ আমলের উপরই মুক্তির বা জান্নাতের ভরসা রাখে না। কারণ, বান্দা যা আমল করে তা জান্নাতের সামান্য কোন অংশেরও মূল্য নয়। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। *(মুঃ ২৮১৬)*

আমল জান্নাতের দাম বা বদলা নয়। বরং জান্নাত লাভের একটা হেতু মাত্র। কেননা, আল্লাহ যতটা ইবাদতের অধিকারী তা কোন বান্দাই করতে সক্ষম নয়। সাধ্যমত তাঁর ইবাদত করলে তিনি তাঁর দয়াগুণে বান্দাকে শান্তি দান করবেন।

আবার মুসলিম আমল করে কিন্তু আশঙ্কা করে -তা কবুল হবে কি না? *(কুঃ ২৩/৬০,*

সিঃসঃ ১৬২) আমলের উপরেই তার নিশ্চিত ভরসা থাকে না, বরং আশা থাকে। কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করে দয়ার সাগরের কাছে দয়ার আশা রাখে। *(কুঃ ২/২১৮)* তবে এই আশার উপর কয়েকটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য রয়েছে ঃ- প্রথমতঃ যা আশা করে তার প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা রাখা। দ্বিতীয়তঃ আকাঙ্খিত বস্তু না পাওয়া বা আশা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কা রাখা। (অন্তরে এমন ভয় রাখা যে, তাঁর সে আশা হয়তো পূর্ণ হবে না।) তৃতীয়তঃ সে আশা লাভের পিছনে সাধ্যমত চেষ্টা রাখা। এ ছাড়া প্রতি আশা দুরাশা ও সাধ হবে যা কোন দিন পূরণ হবার নয়। *(শঃ তাঃ ৩৬৬)*

যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে তার জন্য তিনি যথেষ্ট। *(কুঃ ৬৫/৩)* এমন অনেক কাজ আছে যেখানে মানুষের তদবীর অচল। যে কাজের উদ্ধার আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নেই তেমন কোন কাজের ভরসা কোন নবী, ওলী বা কোন সৃষ্টির উপর যদি রাখা যায়, তবে তা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, আল্লাহই একমাত্র ভরসাস্থল। *(কুঃ ৫/২৩)* তবে তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তদবীরের প্রয়োজন আছে। (অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে বিনা তদবীরেও বান্দাকে বহু কিছু দান করতে পারেন।) যদি কেউ আল্লাহর উপর সত্য ভরসা রেখে সন্তান চায়, সন্তান পাবে। কিন্তু তার আগে তদবীর অর্থাৎ বিবাহ ও তারপর মিলন অবশ্যই করতে হবে। যেমন পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবার সময় আল্লাহর কাছে জীবনের ভরসা রেখে শুধু 'আল্লাহ তরাও' বলে হাত-পা অবসন্ন রেখে গা এলিয়ে দিলেই হয় না। বরং তার তাওয়াক্কুল তাকে বলবে 'হাত-পা তো নড়াও।' অর্থাৎ সাঁতার তো কাটার চেষ্টা কর। মোট কথা, তাওয়াক্কুলের সাথে তদবীরও প্রয়োজন। পরন্তু যে শুধু তদবীর বা ব্যবস্থাবলম্বনের উপর ভরসা রাখে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখেনা, সে মুমিন হতে পারে না। *(কুঃ ১০/৮৪)* ([41])

কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর রুজী-রুটীর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা, চাকুরী ও কামাই-এর উপর সংসার চলার ভরসা রাখা, ডাক্তারের উপর রোগীর আরোগ্যের ভরসা রাখা ছোট শির্ক। অবশ্য কোন ব্যক্তির উপর কোন কার্যভার সমপর্ণ করে তার উপর আস্থা রাখা ঈমানের খেলাফ নয়। যেমন, কাউকে ব্যবসার ভার দেওয়া, মামলা-মকদ্দমায় উকিলের উপর আস্থা রাখা ইত্যাদি। কারণ, মুমিনের আসল ভরসা আল্লাহর উপর থাকে এবং ব্যবস্থাবলম্বন একটা হেতুমাত্র, যা পরিহার্য নয়। আল্লাহর নবী ﷺ- এর মত আল্লাহর উপর কে যথাযথ ভরসা ও তাওয়াক্কুল রাখতে পারে? অথচ তিনি সফরে সম্বল সাথে নিতেন। যুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন। তাওয়াক্কুলের সাথে তদবীরও করতেন।

([41]) অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যে এবং অনভিপ্রেত হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে তদবীর (বা ব্যবস্থাবলম্বন) করে আল্লাহরই উপর ভরসা রাখাকে 'তাওয়াক্কুল' বলে। অতএব যদি কেউ কেবলমাত্র তদবীরের উপর ভরসা করে, তবে সে শির্কে পড়ে। অন্যথা যদি কেউ তদবীর না করে কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তবে সে আল্লাহর হিকমতে আঘাত করে। অথচ মহান আল্লাহ তদবীর, কারণ বা হেতুর মাধ্যমে কর্ম করে থাকেন। (কুঃ ২/২৬, ৩৫/৯) আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে কিছু না কিছু কারণ বা হেতু নির্ধারণ করেছেন।

অতির কিছুই ভালো নয়। অতিরঞ্জনে জিনিসের আসলত্ব চাপা পড়ে এবং সেই অতিরঞ্জনে ক্ষতিও হয় বড়। অন্ধ ভক্তরা ভক্তিস্পদের ভক্তিতে অতিরঞ্জরন ও বাড়াবাড়ি করে তাকে আব্দ্ থেকে মা'বুদের আসনে পৌঁছে দেয়। যেমন, হয়েছে হযরত ঈসা ﷺ এর ক্ষেত্রে। খ্রীষ্টানরা তাঁর প্রতি বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহর পুত্র ও আল্লাহ মেনে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ ছেড়ে নবীর ইবাদত ও পূজা করে তারা।

হযরত নূহ ﷺ-এর কওমে আদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নস্র নামক পাঁচজন নেক ও সালেহ লোক ছিলেন। *(কুঃ ৭১/২৩)* তাঁদের ইবাদত ও নেক আমলের কথা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধও ছিল। তাঁদের গত হওয়ার পরও সেই প্রসিদ্ধি মানুষের মাঝে স্মরণীয় ছিল। কোন ইবাদত করার সময় লোকে তাঁদের ইবাদত স্মরণ করত। তাঁদের কথা মনে হলে যেন ইবাদতে অধিক মন বসত। তাই তারা তাঁদের কবর যিয়ারত করত। কিছুদিন পর তাঁদের কবরের ধারে-পাশে ইবাদত শুরু করল লোকে। সুযোগ পেয়ে শয়তান ওদের মনে আর এক নতুন কুমন্ত্রণা দিল যে, তাঁদের মূর্তি বানিয়ে যদি তারা তাদের মজলিসে (বৈঠকখানায়) স্থাপন করে তাহলে তাঁদেরকে প্রায় সর্বক্ষণ নিকটে দেখে তাঁদের ইবাদতের কথা সর্বদা মনে পড়বে, ফলে তাদের ইবাদতে মনোযোগ বাড়বে। কিন্তু তারা এর পরিণাম বুঝতে পারল না। শয়তান কৃতার্থ হল। প্রতিমা বানিয়ে তাদের মজলিসে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তখন তাঁদের পূজা হত না। সে যুগের মানুষের মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধরদের মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা পড়ল যে, এঁদেরকেই সম্মুখে রেখে তাদের পিতা-পিতামহরা ইবাদত করত; বরং এঁদেরই পূজা করত। তারা তাই সত্য ভেবে শুরু করল মূর্তিপূজা। আর তখন থেকেই সূচনা হল মূর্তিপূজার। *(কুঃ ৪৯২০)*

অনুরূপভাবে কোন ওলীর তা'যীমে বাড়াবাড়ি করে প্রথমে তাঁর কবর যিয়ারতের ধুম পড়ে। তারপরই তার উপর মাযার তৈরী হয়। ভাবা হয় যে, মাযার নির্মাণ করে আলোকিত ও পরিচ্ছন্ন না রাখলে তাঁর যথার্থ তা'যীম হয় না। অতঃপর মনে করা হয় যে, তাঁর মাযারে গিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলে তাঁর মর্যাদায় তিনি দুআ কবুল করে নেন। পরে ধারণা করা হয়, তিনিই আল্লাহর নিকট দুআ করে মানুষের দুঃখ মোচন করেন এবং সর্বশেষে মাত্রাতিরিক্তভাবে তা'যীম করতে গিয়ে মনে করা হয়, তিনিই সবকিছু দিতে পারেন। তাঁর নামে নযরানা বা কুরবানী পেশ করলে অভীষ্ট লাভ হয় ইত্যাদি। আর এইভাবে সূত্রপাত হয় কবর পূজার।

তাই আল্লাহ তাআলা ধর্মীয় কোন বিষয়ে মাত্রাধিক অতিরিক্ত ও বাড়াবাড়ি করতে এবং কোন বিষয়েয় সীমালঙ্ঘন করতে মুমিনদেরকে নিষেধ করলেন। *(কুঃ ৪/১৭১, ৫/৭৭)* আর তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ ও তাঁকে নিয়ে অতিরঞ্জন এবং তাঁর সসীম (আব্দুহু ও রসূলুহু) তা'যীমের বেড়া অতিক্রম করে নাসারাদের পন্থাবলম্বন করতে নিষেধ করে গেছেন। *(বুঃ ৩৪৪৫)* যাতে করে তাঁকে নবুঅতী থেকে তুলে এলাহী আসনে সমাসীন না করা হয়।

সংসারে প্রত্যেকের নিজস্ব আসন আছে। মায়ের আসন ভিন্ন। স্ত্রীর আসন তার থেকে পৃথক। মায়ের আসন সবার থেকে উপরে। স্ত্রীর কাছে স্বামীর আসন স্বতন্ত্র। স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়দের স্থান আলাদা। তাদের স্ব-স্ব আসন বা স্থান থেকে কাউকে

মাত্রাতিরিক্তভাবে ঊর্ধ্বে বাড়িয়ে দিলে সর্বনাশ ঘটে। যদি স্ত্রীকে মায়ের আসন ও স্বামীর কোন আত্মীয়কে (দেবর ইত্যাদিকে) স্বামীর আসন দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয় সংসারে আগুন লাগে। মা বা স্বামী তা কোনদিনই সহ্য করে না। অনুরূপভাবে কোন সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে, নবী, ওলী বা আব্দকে মা'বুদের আসনে অধিষ্ঠিত করলে অবশ্যই স্রষ্টা মা'বুদ তা কোনদিনই সহ্য করবেন না।

তদনুরূপ বাদশার কোন প্রজা যদি বাদশাহর বর্তমানে কোন অমাত্য বা ভৃত্যকে অথবা সাধারণ কোন প্রজাকে তাঁর আসন দেয়, বাদশাহর মত তার তা'যীম ও খাতির করে, তার জয়গান গায়, তাকে রাজস্ব প্রদান করে, রাজভক্তির ন্যায় তাকে অতিভক্তি করে, তবে নিশ্চয় তা রাজদ্রোহিতা বলে গণ্য হবে। আর এরূপ বিদ্রোহীকে রাজা কোন দিন ক্ষমা করবেন না। তেমনি রাজাধিরাজ আল্লাহকে ছেড়ে যদি তার কোন প্রিয়জন অথবা সৃষ্টির নামে জয়গান গাওয়া হয়, নযরানা পেশ করা হয়, সেজদা করা হয়, তাঁর মত ভক্তি করা হয় তবে তা নিঃসন্দেহে খোদাদ্রোহিতা হবে।

ভক্তি ও শ্রদ্ধার অতিরঞ্জনে যেমন, সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসন দেওয়া হয়, যেমন অবস্থা নাসারাদের; যারা হযরত ঈসা ﷺ-কে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে। ঠিক তেমনিই অভক্তি ও অশ্রদ্ধার অতিরিক্ততায় মান্যকে ঘৃণ্যের আসন দেওয়া হয়, যেমন, অবস্থা ইহুদীদের; যারা হযরত ঈসা ﷺ-কে (বিনা পিতায় জন্ম বলে) জারজ বলে অভিহিত করে। কিন্তু মুসলিম যার যে আসন তাকে সে আসনে রাখে। না তার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করে আর না-ই তার নিম্নে অবতারণ করে। কারণ, অতিরঞ্জনই পূর্ববর্তী বহু উম্মতকে ধ্বংস করেছে। *(মুঃ আঃ ১/২১৫, ইঃ মাঃ ৩০২৯)*

মুসলিম কোন দিন 'গোঁড়া' হয় না। (42) যাকে মানে না তাকে সানেও না। ধর্মীয় ব্যাপারেও কোন বাড়াবাড়ি করে না। ইবাদত করে, কিন্তু তাতে একেবারে সংসার বৈরাগী হয় না। *(কুঃ ২৮/৬৭, ৫৭/২৭)* ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই। *(মুঃ আঃ ৬/২২৬)* সংসার ত্যাগ করে শুধু তপস্যা করায় (ফকীরী নেওয়ায়) ইসলামের অনুমতি নেই। ইসলামের নীতি 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।' ধর্ম জীবন, কর্ম জীবন, সংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এ সব জীবনই মুসলিমের জীবন। এ সকল জীবনের মাঝে থেকে সে পরলোকের সুখী জীবন চায়। এ সকল জীবনেই আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে; যদি তা তাঁর সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আর সেই জীবনই হয় 'আরেফ বিল্লাহ'র জীবন। যে জীবনে সর্বপ্রকার ইবাদত সম্পন্ন করে আল্লাহর অধিক যিক্‌র করে থাকে। মহান আল্লাহর অধিক স্মরণে, কিতাব ও সুন্নার গড়নে ও প্রতি পদে মহানবীর অনুসরণে গঠিত হয় বন্দীগীর যিন্দেগী এবং লাভ হয় অধিক আল্লাহর মা'রেফাত।

আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। *(কুঃ ৯/১০৮)* তিনি সুন্দর, সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। *(মুঃ ৯১)* তিনি চান না যে, বান্দা তার জন্য সৌন্দর্য ত্যাগ করুক। ভালো খাওয়া, ভালো পরা বর্জন করুক। বিবাহ-শাদী না করে অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনতায় বসে শুধু 'আল্লাহ-আল্লাহ' করুক। বরং তিনি বান্দার জন্য সব কিছু চান। এ সবের মাঝে তিনি তাঁর ইবাদত চান। তবে বান্দা যেন তাতে মিতব্যয়ী ও সংযমী হয়। নির্দিষ্ট

---

(৪২) *সত্যাবলম্বীকে যে 'গোঁড়া' বলে সে মিথ্যাবলম্বনে এক গোঁড়া। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব গোঁড়ামি নয়। গোঁড়া তো তারা, যারা অসত্য ও অন্যায়কে অন্ধভাবে সত্য ও ন্যায় জ্ঞান করে তার অনুচিত পক্ষপাতিত্ব করে।*

সীমা যেন উল্লঙ্ঘন না করে। গুপ্ত ও প্রকাশ্য অশ্লীলতা পরিহার করে। *(কুঃ ৫/৮৭, ৭/৩১-৩২)*

বলা বাহুল্য, মুসলিম 'অতি' ও 'নঞ'-এর মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। তাই আকিদায় আল্লাহর কোন গুণকে কোন সৃষ্টির গুণের সহিত উপমা দেয় না, আবার তাঁকে গুণহীনও মনে করে না। অধিক ইবাদতে নিজের আত্মাকে অতি কষ্ট দেয়না, আবার অবহেলায় ইবাদত ত্যাগ করেও বসে না। পাপে (অতি মহাপাপ ব্যতীত) পাপীকে কাফের মনে করে না, আবার একথাও বলে না যে, ঈমানের উপর কোন পাপ কিছু ক্ষতি করে না। তকদীরকে অস্বীকার করে না, আবার বান্দাকেও এখতিয়ারহীন পুতুলসম ভাবে না। কোন নবী বা ওলীকে অতিভক্তিতে আল্লাহর আসনে বসায় না বা আল্লাহর কোন গুণে তাঁদেরকে অংশী করে না, আবার তাঁদেরকে অভক্তিতে নিজের আসনচ্যুতও করে না। খরচে অতি দানশীল বা অপব্যয়ী হয় না, আবার কৃপণ ও ব্যয়কুণ্ঠও হয় না। *(কুঃ ১৭/২৯, ২৫/৬৭)* খাদ্যে (সামর্থ্য থাকতে) উত্তম খাবার, পরনে উত্তম লেবাস পরিত্যাগ করে না, মলিনতা ও অপরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করে না, সৌন্দর্য এবং দাম্পত্য সুখ উপেক্ষা করে সংসার-ত্যাগী হয় না, আবার অধিক বিলাসিতা ও দাম্পত্য সুখোপভোগে মত্ত হয়ে দুনিয়াদার হয়েও যায় না। সংসার ও ইবাদত দুই-ই নবীর আদর্শ। *(বুঃ ৫০৬৩, মুঃ ১৪০১)* তবে সংসার উপলক্ষ্য, কিন্তু ইবাদত ও আখেরাত হল মূল লক্ষ্য। *(কুঃ ২৮/৭৭, ৭/৩২)*

কুরবানী ও পশুবলিদান এক ইবাদত। তাই কুরবানী ও যবেহ শুধু আল্লাহর নামে ও আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি ছাড়া কোন নবী, ওলী, জিন, কবর বা দর্গার নামে বা তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (আল্লাহর নাম দ্বারা) যবেহ হারাম ও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আর সেই উৎসর্গিত যবেহকৃত পশুর মাংসও মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহ তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য যত রকমের ইবাদত বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে কুরবানী ও যবেহ অন্যতম। তাই তা গায়রুল্লাহর জন্য পেশ করা অবশ্যই যুলুম। *(কুঃ ৫/৩, ৬/১৬২, ১০৮/২)* অভিশপ্ত সে, যে আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে পশুবলিদান করে। *(মুঃ ১৯৭৮)*

অবশ্য আল্লাহর নাম দ্বারা মেহমানের জন্য বা মাংসের জন্য যবেহ করা ঐ পর্যায়ে পড়ে না। কারণ, তাতে কারো সামীপ্য বা তুষ্টিলাভ লক্ষ্য থাকে না।

যেরূপ গায়রুল্লাহর নামে বা উদ্দেশ্যে যবেহ শির্ক ঠিক তদনুরূপ এমন স্থানে আল্লাহর নামে ও উদ্দেশ্যে যবেহ নিষিদ্ধ, যে স্থানে গায়রুল্লাহর নামে পশুবলিদান বা যবেহ করা হয়। *(মুঃ আঃ ৪/৬৪, আঃ দাঃ ৩৩১৩)* অতএব যে থান, দর্গা, আস্তানা বা মাযারে গায়রুল্লাহর নামে বা উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহর ভক্তরা যবেহ করে থাকে, সেখানে কোন মুমিন আল্লাহর উদ্দেশ্যেও কুরবানী বা যবেহ করতে পারে না। কারণ, তাতে বাহ্য দৃষ্টিতে মুশরিকদের সহিত সমর্থন, সহমত ও সহায়তার বিকাশ ঘটে। *(কুঃ ৯/১০৮)*

নযর ও মানত

নযর ও মানত মানা ইবাদতের অন্যতম। তাই আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী, ওলী বুযুর্গ, জিন, কবর বা মাযারের নামে নযর মানা বা মানসিক করা শির্ক। আল্লাহর নামে নযর মানলে তা পূর্ণ করা বা আদায় করা ওয়াজেব। *(কুঃ ২২/২৯,৭৬/৭)* সন্তান লাভের জন্য, কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায়, ব্যবসায় লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন রোগ-বালা দূর করার লক্ষ্যে কোন নবী, ওলী বা পীরের কবর বা মাযারে টাকা-পয়সা, মিঠাই, মুরগী, খাঁসি, ধুপবাতি, জ্বালানী তেল ইত্যাদি অথবা ফুল বা চাদর চড়ানোর মানসিক বা নযর মানা নিঃসন্দেহে আল্লাহর ইবাদতে শরীক করা এবং বিদআত। যদি কেউ ভুলক্রমে এরূপ নযর মেনেও ফেলে, তবে তা পুরা করা অবৈধ, এবং তার উপর তওবা ওয়াজেব। কারণ, যে ব্যক্তি এই ধরনের নযর-নিয়ায মেনে থাকে তার বিশ্বাসে নযর দ্বারা যার নামে নযর মানে- তার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভ হয়। ফলে সে তার কার্য সিদ্ধ ও আশাপূর্ণ করে, তাকে রোগ ও বিপদমুক্ত করে, সন্তান দান করে ইত্যাদি। অথচ এর প্রত্যেকটির মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই অভীষ্টদান যাঁর সাধ্যে তাঁর কাছে না চেয়ে, তাঁর নামে নযর না মেনে তাঁর সৃষ্টির কাছে চাওয়া ও নযর মানা অবশ্যই অন্যায়। প্রকাশ থাকে যে, গায়রুল্লাহর নামে (নযর বা খুশীতে) উৎসর্গিত খাদ্য, পশুর মাংস বা মিঠাই মুসলিমের জন্য খাওয়া হারাম। *(কুঃ ৫/৩, ৬/১২১)*

কসম বা শপথ

মুসলিম কোন বিষয়ে কসম খাওয়ার প্রয়োজন মনে করলে কেবল আল্লাহর নামেই কসম খায়। তাছাড়া কোন নবী, ওলী, ফিরিশ্তা, জিন, বুযুর্গ, পিতা-মাতা বা পুত্র-ভ্রাতার নামে অথবা অপর কারো নামে কসম করে না। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে কসম, হলফ, শপথ, দিব্যি বা কিরে করা (ছোট) শির্ক। *(বুঃ ৬৬৪৬, আঃ দাঃ ৩২৫১, তিঃ ১৫৩৫)*

কসমে যার নামে কসম করা হয়-তার তা'যীম অথবা প্রেম উদ্দেশ্য থাকে। যে তা'যীম ও প্রেম কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। কিংবা যে বিষয়ের সত্যতা ও নিশ্চয়তার উপর শপথ করা হয় তা মিথ্যা হলে যার নামে শপথ করা হয়, শপথকারী তার মৃত্যু অথবা বিপদের আশঙ্কা করে। অথচ এরূপ বিশ্বাস যথার্থ নয়।

কোন কিছু স্পর্শ করে বা ছুঁয়ে বলাও কসমের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, মসজিদ, মিম্বর, পীরতলা, আস্তানা, ছেলের মাথা, কারো গা, চোখ বা বই ছুঁয়ে বলা। তদ্রূপ বিদ্যা ছুঁয়ে, লক্ষ্মী চুঁয়ে (সাধারণতঃ খাদ্যবস্তু স্পর্শ করে এই কসম করা হয়। এটি একটি দেবীর নাম। জাহেল মুসলিমরা অজান্তে দেবীর নামেও হলফ করে।) মাটি বা অন্য কিছু ছুঁয়ে বলা। মাইরি (মেরী) বলে দিব্য করা। অনুরূপভাবে,পশ্চিম দিকে মুখ করে বলা, বসুমতী (পৃথিবী বা মাটি)তে দাঁড়িয়ে বলা ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা ইত্যাদি।

অনেক সময় জাহেলরা মহামহিমান্বিত আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খেয়ে থাকে, কিন্তু ছেলের মাথা, পীরতলা বা লক্ষ্মী ইত্যাদি ছুঁয়ে মিথ্যা হলফ বা কিরে খেতে ভয় করে। এ ধরনের মানুষের আল্লাহ প্রসঙ্গে জ্ঞান বা ধারণা যে মোটেই নেই, তা বলাই বাহুল্য "বস্তুতই যারা মুমিন নয় তাদের নিকট এক আল্লাহর কথা উল্লেখিত হলে তাদের হৃদয়

বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। কিন্তু আল্লাহর পরিবর্তে তাদের মান্য বাতিল মা'বুদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। *(কুঃ ৩৯/৪৫)* এ ধরনের বিশ্বাসে শির্কে আকবর হয়।

প্রকৃত মুমিনের নিকট আল্লাহ সব চেয়ে মহান। তাঁর মহত্ত্বের কাছে সমগ্র সৃষ্টি তো উটের বিষ্ঠার মত। *(হেদায়া অনেহায়া আওয়ারেফ ৬৩ বাব, ফাওয়ায়েদুল ফাওয়ায়েদ ৩য় খন্ড ৮ম মজলিস)* তাঁর নামের তা'যীম সে যথার্থ করে। তাই কসম খায় তো তাঁরই নামে। কোন বিষয়ে তাঁর নামের কসম যদি তাকে অন্য কেউ দেয় তবে তা মেনে নেয়। তাঁর নামে শপথকৃত কথায় সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। *(মুঃ আঃ ৫/২৪, ইঃ মাঃ ২১০১, সঃ জাঃ ৭১২৪)* তেমনি তাঁর নাম নিয়ে তার কাছে কেউ কিছু চাইলে তাকে দিয়ে থাকে। *(মুঃ আঃ ২/৬৮, আঃ দাঃ ১৬৭২, নাঃ ২৫৬৮)*

তাঁর নামে কথায় কথায় অযথা কসম খায় না। *(কুঃ ২/২২৪)* মিথ্যা কসম তো খায়ই না। অযথা শপথ করে ব্যবসায় লাভ করতে চায় না। কারণ, তা মহাপাপ ও বর্কতবিনাশী। *(বুঃ ২০৮৭, মুঃ ১৬০৬)*

মুসলিম আল্লাহর উপর কারো ইষ্ট না করার জন্য কসম খায় না। যেমন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ যেন ওদের ক্ষমা না করে' বা 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ যেন ওদের ধ্বংস করে' ইত্যাদি। অবশ্য কেউ তার আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, আস্থা ও ঈমানের উৎসাহবলে কসম করলে এবং নিজের দুর্বলতা স্বীকারের সাথে আল্লাহকে কিছুতে বাধ্য মনে না করলে, সেইরূপ মুমিনের জন্য আল্লাহর উপর কসম খাওয়া বৈধ। আর এই কসমে আল্লাহ ঐ বান্দার অভীষ্ট পূর্ণও করেন। *(বুঃ ২৭০৩, মুঃ ১৬৭৬, ২৬২১, ২৬২২)*

তদনুরূপ তাঁর উপর কোন গায়রুল্লাহর কসমও খায় না। যেমন, 'আল্লাহ তোমাকে তোমার নবীর শপথ বা আলীর কসম, আমার ছেলে বাঁচিয়ে নাও' ইত্যাদি। এরূপ কসম অবশ্যই শির্ক, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মুসলিমের নিকট আল্লাহ যেহেতু মহামহীয়ান, তাই তাঁর নামে যেমন মিথ্যা কসম খায় না, তেমনি কোন কাজ করার নিশ্চয়তা দিয়ে হলফ করলে তা অবশ্যই করে। করতে না পারলে কাফ্ফারা নিশ্চয় আদায় করে। ([43]) নচেৎ সে পাপী হবে।

আল্লাহর যথার্থ তা'যীম প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুসলিম তাঁর নামের সাথে 'তাআলা, আযযা অজাল্ল' ইত্যাদি যুক্ত করে।

কোন মসীবত বা বিঘ্ন নিবারণ করার জন্য, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, জিন বিতাড়ন বা ঘর বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাবীয (কবচ বা মাদুলি, কোন ধাতু নির্মিত) বালা, নোয়া বা সুতো ইত্যাদি ব্যবহার করা মুমিনের ঈমান অসম্পূর্ণতার সাক্ষ্য। এসব ব্যবহার করা ব্যবহাকারীর বিশ্বাসানুযায়ী শির্কে আকবরও হতে পারে; শির্কে আসগরও।

তাবীয নোয়া ইত্যাদিকে ঔষধের সাথে তুলনা করা মহা ভুল। কারণ, আল্লাহ-পাক প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ দিয়েছেন এবং তা ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছেন। ঔষধের প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাবীয বা বালার মসীবত দূর করার

([43]) ১০ জন মিসকিনকে সাধারণ মধ্যম ধরনের খাদ্যদান অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা, আর এ সবে সমর্থ না হলে তিন দিন রোযাব্রত পালন করা। (কুঃ ৫/৮৯)

সাথে কোন সম্পর্কই নেই, তার মধ্যে সে শক্তিও নেই। বিপদ-বালাই দূর করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে। *(কুঃ ১০/১০৭)* তাঁর ব্যবস্থা-পত্রানুসারে পালন ও ঔষধ ব্যবহার করলে দৈহিক আপদ-বালাই দূর হয় এবং আত্মিকও।

তিনি প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে কোন না কোন কারণ বা হেতু সৃষ্টি করেছেন, যার সম্মিলনে কোন কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে। কিছু তো শরয়ী (বিধিগত) এবং কিছু সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক (বৈজ্ঞানিক) হেতু। এই দুটি হেতু ছাড়া কোন জিনিসের প্রতিক্রিয়াতে মুমিনের প্রত্যয় জন্মাতে পারে না।([44])

তাই কোন আরোগ্য-আশায় ব্যবহার্য বস্তুর মাঝে যদি ঐ দুটি হেতুর কোনটি না থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা বা তাতে আরোগ্য লাভের আশা রাখা অথবা ভরসা করা শির্ক হবে। অতএব যে বস্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বা অভিজ্ঞতায় অথবা শরীয়তী ফায়সালায় রোগের প্রতিকারক, প্রতিষেধক ও বিঘ্ননিবারক বলে চিহ্নিত হয়েছে, সে বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে কেবলমাত্র ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসে অব্যর্থ ঔষধ মনে করা ও তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "কবজ, বালা, নোয়া ইত্যাদি ব্যবহারে লাভ তো কিছুই হয় না বরং ক্ষতিই হয়।" *(মুঃআঃ ৪৪৫, ইঃমাঃ ৩৫৩১)* যে সমস্ত তাবীয নক্সা বানিয়ে সংখ্যা দ্বারা লিখা হয়, কোন ফিরিশ্তা, জিন কিংবা শয়তানের নাম দ্বারা তৈরী করা হয় অথবা কোন তেলেস্মাতি জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অথবা কোন ধাতু, পশু-পাখীর হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিকড় দিয়ে বানানো হয়, তা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শির্ক।

অবশ্য কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয প্রসঙ্গে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাও ব্যবহার না করাটাই সঠিক। কারণ, প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ তাবীয ব্যবহারকে শির্ক বলেছেন। তাতে সমস্ত রকমেরই তাবীয উদ্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয ব্যবহারকারী গলায়, হাতে কিংবা কোমরে বেঁধেই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, স্ত্রী-মিলন করবে, মহিলারা মাসিক অবস্থায় ও অন্যান্য অপবিত্রতায় ব্যবহার করবে। যাতে কুরআন মাজীদের অসম্মান ও অমর্যাদা হবে। ([45])

তৃতীয়তঃ, যদি এরূপ তাবীয ব্যবহার বৈধ করা যায়, তাহলে অকুরআনী তাবীযও ব্যবহার করতে দেখা যাবে। তাই এই শির্কের মূলোৎপাটন করার মানসে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করতে কুরআনী তাবীয ব্যবহারও অবৈধ হবে।

চতুর্থতঃ, নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁক করেছেন, করতে আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের উপরেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। অতএব যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতেন। অথচ কুরআন ও সুন্নায় এমন কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। *(মঃযাঃ ইবনে বায ২/৩৮৪)*

অনুরূপভাবে কোন লকেটের উপর 'আল্লাহ' বা 'মুহাম্মাদ' বা কোন কুরআনী আয়াত বা দুআ লিখে ব্যবহার করাও এই পর্যায়ে পড়ে।

কোন রোগ নিরাময় বা বিঘ্ন-বালাই নিবারণ করার উদ্দেশ্যে কুরআনী আয়াত পাঠ করে পানির উপর দম করে অথবা কোন পবিত্র পাত্রে লিখে তা পানি দ্বারা ধৌত করে

([44]) *জ্ঞাতব্য যে, যাদু, ঐন্দ্রজালিক ও শয়তানী প্রতিক্রিয়াও ইসলামে স্বীকৃত।*

([45]) *ওদের মতে তাবীয বেঁধে মড়াঘর বা আঁতুড়ঘর গেলে তাবীয ছুত হয়ে যায়। কিন্তু অচ্ছুতের গায়ে ঐ তাবীয কি করে ছুত না হয়ে থাকে?*

পান করা যায়। *(যাঃ মাঃ ৩/৩৮১)*

মুসলিম যেমন নিজেকে কিংবা তার শিশুকে বদনযর, জিন-ভুত বা রোগ-বালাই হতে বাঁচাবার জন্য তাবীয ব্যবহার করে না। (বরং তার জন্য যথাযথ নববী দুআ ব্যবহার করে।) তেমনি তার বাড়ি, গাড়ি, পশু, ক্ষেতের ফসল বা গাছের ফলাদিকে বদনযর বা অন্যান্য আপদ হতে বাঁচাবার জন্য মুড়ো ঝাঁটা, তার, ছেঁড়া নেকড়া, জাল বা জুতো, লোহা, তামা, কোন পশুর মুন্ড বা হাড়, মাটির ভাঙ্গা হাঁড়ি, ভাঙ্গা ঝুড়ি, আমড়ার আঁঠি, ইত্যাদি ব্যবহার করে না। তদ্রূপ লগনধরা বর-কনের হাতে বা কপালে সুতো বাঁধা, (সাধারণতঃ বদনযর বা জিন ইত্যাদি থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে) সঙ্গে সর্বদা লোহা (যাঁতি বা কাজল লতা) রাখা, বিবাহের পর দাম্পত্যের মঙ্গল বা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনী ভেবে স্ত্রীর (এয়তীর প্রতীকরূপে) হাতে চুড়ি বা কোন অলঙ্কার (অনুরূপভাবে স্বামীর সাথেও আংটি) রাখা জরুরী ভাবা, ছেলেদের খতনা করার পর তাদের পায়ে বা হাতে লোহা বাঁধা, মৃতের গোসল দেওয়ার পর তার ময়লাদি ফেলতে যাওয়ার সময় সঙ্গে লোহা রাখা, আঁতুড় ঘরে লোহা, মুড়ো ঝাঁটা বা ছেঁড়া জাল ইত্যাদি রাখা, কোন খাবার জিনিস বাড়ির বাইরে গেলে তাতে লোহা বা লঙ্কা প্রভৃতি রাখা, গাড়িতে ছেঁড়া জুতা বাঁধা ইত্যাদি -যাতে শরয়ী বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন যুক্তি বা হেতু থাকে না তা- ব্যবহার করা শির্কের শ্রেণীভুক্ত।

ঝাড়ফুঁক

মুসলিম শরয়ী হেতুতে যথার্থ বিশ্বাস রাখে। কুরআনী আয়াত বা (সহীহ্) দুআয়ে রসূল দ্বারা ঝাড়ফুঁকে রোগী সুস্থ হতে পারে। বিশেষ করে বিষাক্ত জন্তুর দংশনে, বদনযরে ([46]) ও শয়তান দূরীকরণার্থে কার্যকরী। যেমন, মুসলিম বিশ্বাস রাখে কুরআনী আয়াত ও দুআর শক্তি, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার উপর এবং আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব ধর্ম ও প্রকৃতিগত গুণের উপর। যেখানে আল্লাহরই আদেশে তাঁর অনুগত ফিরিশ্তাগণ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাধন করে থাকেন। যেমন, হারাম-কার্যে এবং যোগ-যাদু প্রভৃতির প্রতিক্রিয়াতে শয়তান সাহায্য করে থাকে।

ঝাড়-ফুঁক ইসলামে স্বীকৃত। রসূল ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁর উপর করা হয়েছে। *(মুঃ ২১৯১, ২১৯২, ২১৮৬)*

অতএব মুসলিমও ঝাড়ফুঁক করতে পারে। কিন্তু এর বৈধতার জন্য তিনটি শর্ত আছে। প্রথমতঃ যেন তা কুরআনী আয়াত, (সহীহ্) দুআয়ে রসূল অথবা আল্লাহর আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) দ্বারা হয়। দ্বিতীয়তঃ, আরবী ভাষায় এবং তার অর্থ বোধগম্য হয়। তৃতীয়তঃ যেন রোগী ও ঝাড়ফুঁককারী এই বিশ্বাস রাখে যে, ঝাড়ফুঁকের (অনুরূপভাবে ঔষধের) নিজস্ব কোন শক্তি বা তাসীর নেই। বরং (তা আল্লাহর দানে) আরোগ্য তাঁর ইচ্ছা ও তকদীরের উপর হয়। অতএব কোন ফিরিশ্তা, জিন বা কোন দেবতার (যেমন, ষাট বা ষষ্টি মায়ের) নামের যিক্র নিয়ে অথবা কোন অর্থহীন মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা বা করানো শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

ঝাড়-ফুঁকের উপর কোন বিনিময় গ্রহণ করা মুসলিমের জন্য বৈধ। *(বুঃ ৫৭৩৭, মুঃ ২২০১)*

([46]) *বদ-নযর লাগা সত্য ও ইসলামে স্বীকৃত। যার নযরে নযর লেগেছে তাকে জানতে পারলে তার গোসল করা পানি দ্বারা যাকে নযর লেগেছে তাকে গোসল করালেও নিরাময় হয়।*

যাদু সত্য। আল্লাহর নবী ﷺ-কে যাদু করা হয়েছিল। *(মুঃ২ ১৮৯, বুঃ ৩২৬৮)* যাদু কোন জিনিসের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না; বরং নকল বা কৃত্রিম খেয়াল ও ধারণার জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে যা নয় তা বোধ হয় বা মনে হয় মাত্র, যেমন জলাতঙ্ক রোগীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই যাদু-কৃত ব্যক্তি রশিকে সাপ মনে করে। *(কুঃ ২০৬৬)* অকারণে ভয় পেয়ে থাকে। যা করেনি তা করেছে মনে হয় ইত্যাদি।

যাদুর প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে হয়। তাতে শারীরিক ক্ষতিও হয় এবং তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শয়তানী সহায়তায় হয়। তাই যাদুবিদ্যা শিক্ষা মুসলিমের জন্য অবৈধ ও হারাম। জিন ও শয়তান দ্বারা যাদু করা শির্কের শ্রেণীভুক্ত। কোন ঔষধ বা জড়িবটী দ্বারা হলে শির্ক না হলেও গোনাহে কাবীরা (মহাপাপ) হবে।

যে যাদুকর তার মন্ত্রবলে কোন জিন বা শয়তানকে বশীভূত করে যাদুর কাজে ব্যবহার করে, সে কাফের। *(কুঃ ২/১০২)* ইসলামী আইনে তার শাস্তি হত্যা। *(তিঃ ১৪৬০)* যেমন, যে মনে করে যে তার যাদু আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা বিনা ইষ্ট অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে, সেও কাফের।

জ্যোতিষ ও হাতগণা

কোন মুমিন নিজ ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ জানার জন্য কোন ফকীরবাবা, গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যায় না। হারিয়ে যাওয়া জিনিসের খোঁজে অথবা কোন অদৃশ্য খবর জানার উদ্দেশ্যে কোন জিনবাবা বা জিনবিবির নিকট আসে না। তাদের অদৃশ্য খবরে ও ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাসও করে না। কারণ, তাতে সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারে। *(মুঃআঃ ২/৪০৮, আঃদাঃ ৩৮০৪)* যেহেতু সকল প্রকার ভুত-ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। *(কুঃ ৬/৫৯,২৭/৬৫)*

আল্লাহ তাআলা তারকারাজিকে আকাশমন্ডলীর সৌন্দর্য ও সুশোভনতার উপকরণ, গোপনে আসমানী তথ্য সংগ্রহকারী শয়তান দলকে বিতাড়িত করার জন্য তাদের প্রতি ক্ষেপণীয় অস্ত্র (উল্কা)স্বরূপ এবং অন্ধকারে জল ও স্থলপথের পথিকদের জন্য পথ নির্দেশক ও দিক নির্ণায়ক স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ৬/৯৭, ১৬/১৬,৩৭/৬-১০,৬৭/৫)* পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল ঘটনাঘটনের সহিত তাঁর এই সৃষ্টি-বিচিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। তাই মুসলিম জ্যোতিষবিদ্যার শুভাশুভ বিচারে বিশ্বাসী নয়। বৃষ্টি-বর্ষা ও ফল-ফসলের বিধাতাও আল্লাহই। কোন রাশিচক্রের বলে না বৃষ্টি হয়, না ফসল ফলে। সব কিছু তাঁরই ইঙ্গিতে ঘটে থাকে, মানুষ অনুমান ও ধারণা করে মাত্র।

কারো হস্তরেখা দেখে ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিরূপণ, দৈহিক কোন লক্ষণ যেমন, টেরা চক্ষু, জোড়া ভ্রূ,কূপগাল, ছয় আঙ্গুল, তিল, জড়ুল প্রভৃতি দেখে ভাগ্য বা চরিত্র বিচার, 'আবজাদি' হিসাব জুড়ে, ফালনামা খুলে, শুভাশুভের অক্ষর বা হরফ নির্দিষ্ট করে চক্ষু বুজে হাত দিয়ে, ফালকাঠি টেনে, বা পাখী উড়িয়ে ভাগ্য-ভবিষ্যৎ বা যাত্রা-কর্ম ইত্যাদির শুভাশুভ নির্ধারণ জাহেলিয়াতি ও মূর্খতা। ইসলাম এ সবকে সমর্থন করে না। *(কুঃ ৫/৯০)*

মুসলিম এসবে বিশ্বাস করে না। তদনুরূপ হাত চালিয়ে, বদনা ঘুরিয়ে সাপ দেখা, চোর ধরা বা কিছু বলাও অনুমান মাত্র।

অবশ্য কোন বিষয়ের মীমাংসা ও ফায়সালার জন্য (যেমন কোন কাজে একাধিক লোকের মধ্যে কে সর্বাগ্রে অংশ গ্রহণ বা আরম্ভ করবে তা নির্ণয় করার জন্য) লটারি করা যায় এবং এটা ঐ পর্যায়ের নয়। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানের লটারি খেলায় অংশ গ্রহণ করা এবং তাতে পুরস্কার গ্রহণ করা মুসলিমের জন্য হারাম।

গায়বী খবর

ইলমে গায়ব বিনা কোন অসীলা বা মাধ্যমে গুপ্ত অদৃশ্য বা ভুত-ভবিষ্যতের খবর জানাকে বলে। এরূপ জ্ঞান কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার আল্লাহই এ বিষয়ে সম্যক্ পরিজ্ঞাত। *(কুঃ ২৭/৬৫)*

কিন্তু যদি কেউ কোন অসীলার মাধ্যমে কোন অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকে তবে তা গায়বী খবর জানা নয়। অতএব যদি কেউ ফিরিশ্তার সাহায্যে (আম্বিয়াগণের জন্যই নির্দিষ্ট) অদৃশ্য বা ভূত-ভবিষ্যতের খবর বলে থাকেন তবে তা ইলমে গায়েব নয়। তাই আম্বিয়াগণ গায়েব জানতেন না। কারণ, তাঁদের সমস্ত খবর আল্লাহর তরফ থেকে জিব্রীল (আঃ) কর্তৃক ওহী মারফত পরিবেশিত হত।

অনুরূপভাবে কেউ কোন জিন বা শয়তানের সাহায্যে অদৃশ্যের খবর বলে থাকলে তাও গায়েব জানা বা বলা নয়। যেমন, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমাদের দৃশ্যে নেই। আমরা যদি তার সম্পর্কে কোন খবর যার কাছে জিন আসে এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করি এবং সেই জিন ঐ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে চিনে থাকে এবং ইতিমধ্যে তাকে দেখে থাকে কিংবা তার সম্পর্কে শুনে থাকে ও তার মানুষ সঙ্গীকে খবর দেয় এবং সে আমাদেরকে ঐ ব্যক্তির খবর জানায় তবে তা গায়েব বা অদৃশ্যের খবর নয়, বরং দৃশ্যের খবর।

পক্ষান্তরে জিন দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের তত্ত্ব ব্যতীত অদৃষ্ট-পূর্ব বা অশ্রুতপূর্ব কোন ভুত-বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের তত্ত্ব জানতে বা জানাতে পারে না। *(কুঃ ৩৪/১৪)* কারো কিছু চুরি হয়ে গেলে চোরের সন্ধান দেওয়া কোন জিনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে চুরির সময়ে যদি জিন সেখানে বর্তমান থেকে চোরকে দেখে ও চিনে থাকে অথবা চোর কে তা কারো কাছে শুনে থাকে, তবে হয়তো বলতে পারে। আর তা গায়বী তথ্য নয়।

তদনুরূপ যন্ত্রযোগে কোন অদৃশ্যের সন্ধান জানা গেলে তাও গায়েব জানা নয়। যেমন, গর্ভবতীর গর্ভে কি সন্তান আছে তা যন্ত্রের দ্বারা বুঝা গেলে তা অদৃশ্য জ্ঞান নয়।

তেমনি দীর্ঘ পরীক্ষা, সমীক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে যে খবর পরিবেশন করা হয় তাও গায়বী খবর নয়। যেমন, চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্ত ও গ্রহণ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদির নির্দিষ্ট সময়াদি জানা গায়েব জানা নয়। আবার এই ধরনের তথ্যের বা হিসাবের খবরে ভুল-ভ্রান্তিও ঘটে থাকে।

বহু গণকের কথা যা রটে, তার কিছু না কিছু সত্য ঘটে। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা যখন আসমানে পৃথিবীর কোন ঘটনার ফায়সালা করেন, ফিরিশ্তারা সে কথা শুনেন যেন পাথরের উপর শিকল পড়ার শব্দ। তাতে তাঁরা ঘাবড়ে যান বা মূর্ছিত হন। তাঁদের ঘাবড়ানি বা মূর্ছা দূর হলে একে অপরকে প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহ কি বললেন বা কি

ফায়সালা করলেন?' বলেন, 'সত্য।' ফিরিশ্তাগণের আপোষের আলোচনায় নিম্ন আসমানের ফিরিশ্তামন্ডলীও শামিল হন। তার কিছু চুরি-ছুপে শয়তান জিন শুনে নেয় এবং তারাও একে অপরকে আপোসের মধ্যে জানিয়ে থাকে। আকাশের ধারে-পাশে শুনতে গেলে উল্কা ছুটে এসে বাধা দেয়। আল্লাহ পাক আকাশকে অবাধ্য শয়তান হতে হেফাযতে রেখেছেন। ফলে সে উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। *(কুঃ ৩৭/৭-১০)*

কিছু শয়তান সেই খবর পৃথিবীতে তাদের সহচর গণকদের মনে পৌছে দেয়। গণকরা তাদের অনুমান ও ধারণার আরো শত মিথ্যা জুড়ে বিশদভাবে প্রচার করে। ফলে যা সত্য তা সত্য ঘটে, কিছু আন্দাজও সঠিক হয়ে যায় এবং অধিকতরই মিথ্যা ও অবাস্তব। *(কুঃ ২৬/২১-২২৩, বুঃ ৪৭০১)*

অতএব কিছু প্রকৃত সত্য ঘটিতব্য খবর, গণক কোন শয়তানের মাধ্যমে জানতে পারে। সুতরাং তাও তার গায়েব জানা নয়। তেমনি অনুমান ও ধারণাও গায়েব জানা নয়। তা কখনো ঠিক হতেও পারে; কিন্তু বেশীর ভাগ ভুলই হয়ে থাকে।

গায়েবের চাবি পাঁচটি, যা কোন প্রকারে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না ঃ-

১। বিশ্ব কখন ধ্বংস হয়ে মহাপ্রলয় দিবস কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

২। বৃষ্টি কখন, কোথায় এবং কি পরিমাণে হবে। আবহাওয়ার পূর্ববার্তায় বৃষ্টি হবার পূর্বে যন্ত্রের সাহায্যে কিছু লক্ষণ ধরে বর্ষণের সম্ভাবনা বলা হয় মাত্র এবং অনুমান করে তার স্থান ও পরিমাণ ঘোষণা করা হয়। তা ইলমে গায়ব নয়। সে খবর কখনো সঠিক হয় আবার কখনো ভুল।

৩। গর্ভবর্তী গর্ভের ভ্রূণ, গর্ভাশয়ে অবস্থানকাল, আয়ু, আমল, রুজী, ভাগ্য এবং আকৃতি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে সে ছেলে না মেয়ে, বিকলাঙ্গ না পূর্ণাঙ্গ ইত্যাদি বিষয়। আকৃতি আসার পর অথবা কোন সমীক্ষার ফলে কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা কোন যন্ত্রের সাহায্যে তার লিঙ্গ, অঙ্গ-বিকৃতি ইত্যাদি নির্ধারণ করা ইলমে গায়ব নয়। *(ফঃলঃ ২/১১৬, ফঃউঃ ৩/৭৭)*

৪। কে আগামী কাল (ভবিষ্যতে) কি করবে, কি ঘটবে ইত্যাদি। হয়তো পরিকল্পনা ও মনঃস্থ করে কেউ বলতে পারে যে, কাল সে বাজারে যাবে বা মাঠে যাবে। কিন্তু সে জানে না যে, হঠাৎ করে তাকে হাসপাতাল যেতে হবে অথবা ঘরেই থাকতে হবে।

৫। কে কোথায় মরবে। জলে-স্থলে না শূন্যে, ঘরে, বাইরে, গ্রামে না বহিঃগ্রামে। এ সমস্ত বিস্তারিত সঠিক ও নিখুঁত বিবরণ আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী ,ওলী, জিন, কারো জ্ঞান, বিজ্ঞান আদৌ বলতে পারে না। *(কুঃ ৩১/৩৪)*

মুসলিম কোন বস্তু বা ঘটনা বিশেষকে অশুভ লক্ষণ বলে মানে না। তার অন্তরে থাকে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা। কোন কিছুকে অশুভ ধারণায় সে কোন কাজে পিছপা হয় না। কোন বছর, কোন মাস কোন দিনই তার অশুভ নয়। কোন স্থান, প্রাণী বা ব্যক্তি বিশেষের কারণে কোন অমঙ্গল আসে না।

অবশ্য এমন নাম যার অর্থ মনে ভয় ও অশুভ ধারণার সৃষ্টি করে তেমন নামকে

মুসলিম ঘৃণা করে। কারণ, ব্যক্তির উপর নামের তাসীর ইসলামে স্বীকৃত। *(বুঃ ৬১৯০)*

মঙ্গলামঙ্গল তো আল্লাহরই হাতে, তাঁর ইচ্ছাতেই এসে থাকে। তাই সে বলে না ও বিশ্বাস রাখে না যে, অমুক মাসে বিবাহ নেই, অমুক দিনে ধান দিতে নেই, বাঁশ কাটতে নেই, যাত্রা নেই ইত্যাদি। সকাল বেলায় অমুক দেখলে সারাদিন অমঙ্গলে কাটে। অমাবস্যায় অমুক করলে অমুক হয় ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে, ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কপাল চাঁদা হলে অশুভ ধারণা, কুকুরের কান্নাসুরে ডাক শুনে বা দাঁড় কাকের 'কা-কা' শুনে কোন দুর্ঘটনা বা আচমকা বিপদ আসন্ন ভাবা, কারো এক চক্ষু দেখলে ঝগড়া হবে ভাবা, বামচক্ষু লাফালে নোকসান হবে মনে করা মুসলিমের জন্য উচিত নয়।

তবে সময়ে কোন ভালো ও হৃদয়ের উৎফুল্লতাদায়ক কথাকে শুভ লক্ষণ বলে মানতে পারে। কারণ, তাতে তার মনোবল দৃঢ় হয় এবং কাজে উৎসাহ পায়। *(হাঃ)* উদাহরণ স্বরূপ একজন কোন অফিসে চাকুরীর জন্য আবেদন পত্র পেশ করেছে। কিন্তু তা মঞ্জুর বা গৃহীত হবে কি না তা নিয়ে তার মনে খুবই সংশয় সঞ্চিত হয়েছে এবং তার ফল জানার জন্য বিশেষভাবে প্রতীক্ষা করছে। সেই উদ্দেশ্যে যাবার পথে ঐ বিষয়ের কোন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ হল। তার নাম জিজ্ঞেস করলে বলল, 'মনযুরুল হক।' তখন তার শুভ ধারণা হল যে, নিশ্চয়- আল্লাহ চাইলে তার দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। অনুরূপভাবে সঙ্কট ও সমস্যার পথে কোন স্থানের নাম সমাধানপুর শুনলে সমাধানের আশা করা, ব্যবসার পথে মুনাফার কথা শুনলে লাভ হওয়ার আশা করা নিন্দনীয় নয়।

তবে বাজারের নাম লাভপুর হলেই যে সেখানে কোন নোকসান হবে না এবং কারো নাম হুদা হলে যে সে বেহুদা ও আব্দুল্লাহ বা মতীউর রহমান হলেই যে সে চোর হবে না তা নয়।

অশুভ বা কুলক্ষণীয় যদি কিছু হয় তবে তা, গৃহ, স্ত্রী এবং ঘোড়া। *(মুঃ ২২২৫)* কিন্তু এসবও কুলক্ষণ নয়। অথবা এ সবের কুলক্ষণ বলতে বাহ্যিক ক্ষতির কথা ধরা যায়। যেমন, স্ত্রীর কুলক্ষণ ঃ তার বন্ধ্যাত্ব ও চরিত্রহীনতা, গৃহের কুলক্ষণ ঃ সঙ্কীর্ণতা ও প্রতিবেশীর কদাচরণ এবং ঘোড়ার কুলক্ষণ ঃ তার পৃষ্ঠে চড়তে না দেওয়া ও মন্দ আচরণ করা প্রভৃতি।

কোন বস্তু বিশেষকে অশুভ বা কুলক্ষণীয় বলে মানা বা বিপদ আসার কারণ মানায় আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা হয়। অথচ মুসলিম আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে আদিষ্ট হয়েছে। তাই কিছু দেখে বা শুনে বিপদের আশঙ্কা না করা, আল্লাহর উপর ভরসা রাখা এবং আল্লাহ তাকে বিপদগ্রস্ত করবেন না -এই ধারণা করাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা। অন্যথা কুধারণা ও পাপ।

যুগের দোষ

মুসলিম যুগ, জামানা কিংবা কোন প্রাকৃতিক অবস্থাকে গালি দেয় না। কোন বিপদ ও বিপর্যয়ে যুগ, কাল, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় বা তুফানকে দোষারোপ করে না। কারণ, আল্লাহই বিশ্বের নিয়ন্তা, যুগের মালিক, -যুগের বিবর্তন তিনিই ঘটান। প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ামক তিনিই। অতএব যুগ বা প্রকৃতিকে গালি দিলে, (ক) তাকে গালি দেওয়া হয় যে গালি খাওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ, যুগ বা প্রকৃতি তো আল্লাহর সৃষ্টি, তার কোন

অপরাধ নেই। বরং সে তেমন চলে যেমন তিনি চালান। তার কোন এখতিয়ারই নেই। (খ) শির্ক করা হয়। কারণ, প্রকৃতিকে গাল-মন্দকারী তখনই গাল-মন্দ করে যখন সে ধারণা করে যে, ইষ্ট-অনিষ্টের পিছনে প্রকৃতির হাত আছে। অথচ প্রকৃতি বা যুগের নিজস্ব কোন এখতিয়ার নেই। (গ) সেই গালি পরোক্ষভাবে যুগ বা প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রতিপালককে লাগে। কারণ, তিনিই যুগ ও প্রকৃতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাই যুগ বা প্রকৃতিকে গালি দিলে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়। *(বুঃ ৭৪৯১, মুঃ ২২৪৬)*

অবশ্য যুগ বলতে যদি কেউ যুগের মানুষকে বুঝায় এবং তার পরিস্থিতি বর্ণনা করে, যেমন বলে 'যামানা বড় খারাপ, যুগ বড় ঘুষখোর।' প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিস্থিতি বর্ণনায় যেমন, 'দুনিয়া বড় স্বার্থপর, সর্বগ্রাসী বা সর্বনাশী (গালির অর্থে নয়) বন্যা বা ঝড়, বিশ্রী গরম ইত্যাদি বলে, তাহলে তা দোষাবহ নয়।

মুমিন জানে যে, যে বিপদ আসে তা তার কোন গোনাহের কারণে আসে। তাই সে যুগ বা প্রকৃতিকে গালি না দিয়ে নিজের আত্মাকে ভর্ৎসিত করে এবং তওবা করে। আর কাফের, ফাসেক বা জাহেল করে এর বিপরীত।

অন্ধানুকরণ

মুসলিম সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। সর্দার নির্বাচিত করে ও তার আনুগত্য করে। সর্ব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ-এর (কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর) অনুকরণ করে। অজানা বিষয়ে সলফে-সালেহীনদের (সাহাবা ও তাবেয়ীন), মুহাদ্দেসীন, আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন ও উলামাদের অনুকরণ করে। কিন্তু কারো অন্ধানুকরণ করে না। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের উপর কারো নির্দেশ ও রায়কে অনুকরণীয় বলে মনে করে না। যা আল্লাহ ও রসূল হারাম করেছেন কারো রায় মতে তা হালাল মনে করে না এবং যা হালাল করেছেন কারো কথা মোতাবেক তা হারাম ভাবে না। কারণ, এরূপ অনুকরণ শির্কের পর্যায়ভুক্ত। *(কুঃ ৯/৩১, তিঃ ৩০৯৫)*

অনুরূপভাবে বাপ-দাদার পরম্পরাগত কোন প্রথা, আচার বা রীতি-রেওয়াজ -যা ইসলামী শরীয়তের পরীপন্থী হয়- তার অনুকরণ করাও শির্কের শ্রেণীভুক্ত।

মুসলিম সর্দারের সর্দারী ও নেতার নেতৃত্ব মানে, তাদের আনুগত্যও করে। কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানী করে কোন অন্যায় ও পাপ কার্যে আনুগত্য নয়। পুত্র মাতা-পিতার এবং স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে কোন গর্হিত কাজে নয়। যেমন পিতা-মাতা যদি রোযা রাখতে নিষেধ করে, অসৎ কাজে পয়সা অর্জন করতে বলে অথবা কোন শির্ক করতে বলে এবং স্বামী যদি পর্দায় থাকতে নিষেধ করে অথবা কোন নোংরা কাজে নামতে নির্দেশ দেয় অথবা কোন ধর্মীয় কাজে বাধা দেয়, তবে তাদের আদেশ মানা হারাম। *(কুঃ ২৯/৮, বুঃ ৭১/৪৪, মুঃ ১৮/৩৯, মুঃ আঃ ৫/৬৬)* পক্ষান্তরে আমীর সর্দার ইমাম বা নেতা যতই যুলুম বা অত্যাচার করুক, মুসলিম তার জন্য বদ্দুআ করে না। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা যুদ্ধ ঘোষণা করে না। বরং ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন গোনাহ এবং আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানী করার আদেশ দেয় ও প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হয়। বরং তার জন্য

হেদায়েত সুপথ ও সুমতি প্রাপ্তির দুআ করে এবং গোপনে নসীহত ও পরামর্শ দান করে থাকে। আল্লাহর বিষয়ে হক কথায় কাউকে ভয় এবং কারো তোষামদ করে না। কারণ, আমীরের আনুগত্য ওয়াজেব। *(কুঃ ৪/৫৯, বুঃ ৭০৫৬, মুঃ ১৭০৯, ১৮৫৪)* তার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য, তার অবাধ্যতা আল্লাহর অবাধ্যতা। *(বুঃ ৭১৩৭, মুঃ ১৮৩৫)*

আবার যে ব্যক্তি বিনা জামাআত ও আমীরের আনুগত্যে মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের, (ইসলামের নয়)। *(মুঃ ১৮৪৯, বুঃ ৭০৫৪)*

ইমামত বা রাষ্ট্রপ্রধান মনোনয়ন দ্বীনের অন্যতম প্রধান জরুরী অংশ এবং তা এক বিরাট দায়িত্ব; যা না হলে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা কিছুতেই সম্ভব ও সম্পন্ন হতে পারে না। শরীয়তে তা ফর্যে কিফায়া মানা হয়েছে।

এই ইমামত তিন ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়ঃ-

১। পূর্ববর্তী রাষ্ট্র প্রধানের মনোনয়নে।

২। দায়িত্বশীল, বহুদর্শী ও ন্যায়বাদী নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গের অবাধ নির্বাচনে। যে প্রতিনিধিদল পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনীত থাকে অথবা পরে তা মনোনয়ন ও গঠন করা হয়।

৩। বিক্রম ও বিজয়ের মাধ্যমে।

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হলে সকলের উপর তার আনুগত্য বরণ ও স্বীকার করা ওয়াজেব হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, আমীর বা নেতা যে বংশ, রঙ বা বর্ণ থেকেই হোক, মুসলিম তার অনুগত হয়। যালেম হলে তার যুলুমে ধৈর্য ধরে। তার অধিকার তাকে প্রদান করে এবং নিজের অধিকার আল্লাহর নিকট চেয়ে নেয়। যেহেতু বিদ্রোহ ঘোষণায় অধিক ফাসাদ, বিপত্তি ও অশান্তি সৃষ্টি হবে। অথচ ধৈর্যে গোনাহের কাফ্ফারা ও অধিক পুণ্য লাভ হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহ মানুষের কৃতকর্মে যুলুমের ফলে তাদের উপর যালেম নেতা বা বাদশাহ নিয়োজিত করেন। *(কুঃ ৬/১২৯)* তাই প্রজা ভালো হলে রাজাও ভালো হবে। নচেৎ মন্দ হলে মন্দ। *(শঃ তাঃ ৪৩০, বুঃ ৭০৫২, মুঃ ১৮৪৩)*

প্রত্যেক নেক ও ফাসেক ইমামের সহিত ও তার আনুগত্যে হজ্জ ও জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। কোন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা তা বাতিল করতে পারবে না। তার জন্য কোন মাসুম (নিষ্পাপ) ইমামের প্রয়োজনীয়তা নেই। *(শঃ তাঃ ৪৩৭)*

কিতাব ও সুন্নাহ

বর্তমানে মুসলিমদের 'নানা মুনির নানা মত' ও নানা পথের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বাপ-দাদার অনুকরণে পুরানো প্রথায় চলছে, কেউ বা (অপ্রকৃত) বুযুর্গদের কথা মত, কেউ বা নিম আলেমের ওয়ায মত, কেউ বা নিজের জ্ঞান ও বিবেক মত চলে দ্বীনদারীর দাবী করছে।

কিন্তু মুসলিমের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মত ও পথ কিতাব ও সুন্নাহর ([47]) মত ও উভয়ের নূরে আলোকিত পথ। যে পথে ভ্রষ্টতা বা কোন বিপদ-আপদের ভয় নেই, ভয় নেই তার

(৪৭) *কিতাব বলতে কুরআন এবং সুন্নাহ বলতে সহীহ (ও হাসান) হাদীস। যেমন 'আহলে হাদীস' বা সুন্নাহ বলতে 'আহলে সহীহ হাদীস' বা সুন্নাহ বুঝা হয়।*

অমূল্য ঈমান-সম্পদ হারাবার। কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টি-পাথরে সকল প্রথা, সকলের কথা, মত ও পথকে পরখ করে চললে দ্বীন ও ঈমানে ভেজালের ভয় থাকেনা।

মুসলিম কুরআন পাঠ করে, বুঝে এবং নিজেকে তার নির্দেশ মত চালনা করে। কুরআন ও সুন্নাহ আজ প্রায় সকল ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। আলেম ছাড়াও যারা নিজের ভাষা পড়তে পারে তারাও কুরআন ও হাদীস বুঝতে পারে। আল্লাহ কুরআনকে বুঝার জন্য এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য খুব সহজ করেছেন। *(কুঃ ৫৪/১৭)*

তাই মুসলিমের কোন ওজর-আপত্তি চলে না। চোখ বন্ধ রেখে সকাল না হওয়ার ওজরে ঘুমের ভান আর সাজে না। যেহেতু জ্ঞান অনুসন্ধান করা ফরয। *(সঃ জাঃ ৩৮০৮)*

অতএব তাকেও পড়তে হবে, বুঝতে হবে, বুঝতে না পারলে আলেমদের নিকট বুঝে নেবে, নিজে শিক্ষা করে স্ত্রী-পরিজনকে শিক্ষা দেবে। ([48])

মুসলিমের ধর্ম, যুক্তি প্রমাণের ধর্ম। তাই সে বিনা দলীলে কিছু বলে না, মানে না, করেও না। তার সর্বপ্রথম দলীল কুরআন ও সুন্নাহ, অতঃপর ইজমা (সর্ববাদিসম্মতি) এবং কিয়াস (অনুমিতি)। ইসলাম-দুশমনরা বহু জাল হাদীস তৈরী করে ইসলামে বিভ্রান্তি আনার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে বড় বড় মুহাদ্দেসীন দ্বারা সকল সহীহ হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সঙ্কলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে এবং যয়ীফ (দুর্বল) ও মওযু' (গড়া) বা জাল হাদীস চিহ্নিত হয়েছে। মুসলিম যয়ীফ কমজোর ও বাতিল বা জাল হাদীসকে ভিত্তি করে কোন আমল করে না। ([49])

কুরআন ও সুন্নায় মুসলিম যে কথা পায়, তা খাঁটি সত্য বলে এবং যে মীমাংসা ও ফায়সালা পায় তা শেষ ফায়সালা বলে নির্দ্বিধায় জানে ও মানে। এই দুয়ের বিপরীত কারো জ্ঞান, রায়, কাশ্‌ফ অথবা কথাতে এক পয়সা বরাবরও দাম আছে বলে মুসলিম মনে করে না। *(কুঃ ৪/৬৫, ৩৩/৩৬)*

যখন মুমিনদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য (কোন বিতর্কিত বিষয়ে সঠিক সমাধান দেওয়ার জন্য) আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের (কিতাব ও সুন্নাহর) দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা কো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম' (আর বৈমুখ্য ও অনীহা প্রকাশ করে না)। ওরাই তো সফলকাম। *(কুঃ*

---

(৪৮) *সতর্কতার বিষয় বিষয় যে, কোন একটি বিচ্ছিন্ন আয়াত অথবা হাদীস নিয়ে কোন মতবাদ সৃষ্টি করা আদৌ উচিত নয়। এ মর্মে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আয়াত অথবা হাদীসের সাহায্য প্রয়োজন। আবার অনেক রহিত আয়াতও আছে যেমন বহু দুর্বল ও জাল হাদীসও রয়েছে। তাই নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ অথবা আলেমের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র অনুবাদে কুরআন ও হাদীস সহজবোধ্য নয়।*

(৪৯) *কোন আমল বা কোন বিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণের দলীল হিসাবে শুধু এই কথাই যথেষ্ট বা যুক্তিযুক্ত নয় যে, তা অমুক কিতাবে আছে। কারণ, তা ভিত্তিহীন কোন কথা হতে পারে। অনুরূপভাবে এও বলা যথেষ্ট নয় যে, আবু দাউদ বা তিরমিযী শরীফ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে আছে। বরং তার প্রকৃত অবস্থা দেখা একান্ত দরকার। কারণ, ঐসব গ্রন্থের সমস্ত হাদীসই সহীহ (বা হাসান) নয়। বরং যয়ীফ ও মওযু' বা জাল হাদীসও আছে। আবার এ কথাও যথেষ্ট নয় যে, অমুক হাদীসকে ইবনে হিব্বান, হাকেম বা তিরমিযী সহীহ বা হাসান বলেছেন, অতএব তা সহীহ বা আমলের যোগ্য। বরং এমনও হতে পারে যে, ঐ হাদীস ওঁদের জানা মতে সহীহ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য মুহাদ্দেসীনদের জানা মতে তা সহীহ নয়। যেমন, 'কুতুবে সিত্তাহ'কে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা মহাভুল। কারণ, বস্তুতঃপক্ষে সাধারণভাবে সহীহ হাদীস কেবল সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম) শরীফেই পাওয়া যায়। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে যয়ীফ ও জাল হাদীস বর্তমান, যদিও তাতে বেশীর ভাগই সহীহ হাদীস আছে।*

মোট কথা হাদীস প্রকৃত পক্ষে সহীহ বা হাসান হলে অথবা মনসুখ বা রহিত না হলে, সঠিক অর্থ বুঝে তার উপর আমল জরুরী, নচেৎ না।

২৪/৫১)

কিতাব ও সুন্নাহর পর মুসলিম জামাআত অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ﷺ এবং সলফে সালেহীনের অনুসরণ করে। কারণ, তাঁদের মত ও পথ ব্যতিরেকে চলাই গোমরাহী ও দোযখের পথে চলা। *(কুঃ ৩/১১৫)* জামাআতবদ্ধভাবে আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণ করে *(কুঃ ৩/১০৩)* এবং বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য ও মতবিরোধকে মুসলিম অত্যন্ত ঘৃণা করে। *(কুঃ ৩/১০৫)* কারণ, মতদ্বৈধতা ও এখতিলাফ উম্মতের জন্য রহমত নয় বরং যহমত ও ধ্বংসের কারণ। *(মুঃ আঃ ৪/২৭৮)*

কুরআন ও সহীহ (ও হাসান) হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা অবিকৃত অবস্থায় গৃহীত হবে এবং তা সেই মত বুঝতে হবে, যেই মত সলফে সালেহীনগণ বুঝেছেন। তাই মুসলিম তাতে তার বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে কোন প্রকার অসঙ্গত তাৎপর্যের অনুপ্রবেশ ঘটায় না। অথবা প্রকৃতির প্ররোচনায় কোন সংশয় সৃষ্টিকারীর সংশয়কে প্রশ্রয় দেয় না। কারণ, ধর্মীয় ব্যাপারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই পদস্খলন হতে নিরাপদ থাকতে পারে, যে প্রবৃত্তির বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত। যে কোন প্রকার প্ররোচনায় কর্ণপাত করে না এবং সকল মীমাংসা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (কিতাব ও সুন্নাহর) উপর ন্যস্ত করে। কারণ, আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার ছাড়া কারোই কদম ইসলামে দৃঢ় থাকতে পারে না এবং নির্ভেজাল তাওহীদ, মা'রেফাত ও বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করতেও পারে না। উপরন্তু সে সন্দেহের বেড়াজালে ঘুরপাক খেয়ে, না প্রকৃত মুমিন হতে পারে, আর না-ই অস্বীকারকারী কাফের।

মযহাব

ইয়াহুদী ৭১ দলে এবং নাসারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মাদীয়া ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এই ৭৩ দল বিভিন্ন ছোট ছোট মযহাব ও উপদলের উৎস ও মূল মাত্র। কারণ, মুসলিম জাহানে ৭৩ এর অধিক মযহাব বিদ্যমান। এই ৭৩ দলের একটি ছাড়া সবগুলিই জাহান্নামী। সেই একটি দল তারা যারা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ﷺ বৃন্দের মত ও পথে চলে। এই দলই মুক্তি ও পরিত্রাণের সৌভাগ্য লাভ করবে। যে দল দুনিয়াতে বিদআত থেকে মুক্ত থাকবে এবং আল্লাহর তরফ হতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ায়ে বিজয়ী থাকবে। আর আখেরাতে সেই দলই আল্লাহর আযাব থেকে বহু দূরে থাকবে, সেই দলই ফির্কা নাজিয়াহ, আহলে সুন্নাহ, আহলে হাদীস বা সালাফী জামাআত।

এই দলের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা আক্বিদা ও বিশ্বাসে, আমল ও কাজে কিতাব ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হবে। আল্লাহর প্রভুত্বে, ইবাদতে এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে বিশুদ্ধ তাওহীদবাদী হবে। কুরআন ও সুন্নাহতে যা প্রমাণিত হবে, তা কোন প্রকার হেরফের, অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত তাৎপর্য না করেই বিশ্বাস করবে।

এই জামাআত তার বিশ্বাস ও নীতিমালা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের তরীকা হতে গ্রহণ করে। বিশ্বাস ও নীতিমালা প্রস্তুত করার পর কুরআন ও সুন্নাহর দলীল খোঁজে না এবং এর প্রতিকূলে কোন আয়াত বা হাদীসকে তা'বীল করে না।

তারা ইবাদতে তার সংখ্যা, পরিমাণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সময়-স্থান এবং বিভিন্ন কারণ ও

প্রকার ভেদে আল্লাহ রসূল ﷺ-এর অনুগামী। এ দলের কাছে বাড়তি (বিদআত) বলে কোন জিনিসই নেই। ফির্কাহ নাজিয়াহ সেই পথের অনুসারী যে পথের দিশা খোদ রসূল ﷺ দিয়েছেন এবং তাঁর পরে তাঁর সাহাবাগণ যে পথের অনুসারী ছিলেন।

কোন বিষয়ে মতবিরোধ ও বিতর্কের সময় তারা উদার-চিত্তে কুরআন ও (সহীহ্) সুন্নাহর প্রতি রুজু করে এবং তাতে যে ফায়সালা থাকে তা ঘাড় পেতে মেনে নেয়।

এই তায়েফাহ মনসূরাহ কুরআন ও হাদীসের উপর কারো কথা , রায় বা অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয় না। *(কুঃ ৪৯/১)*

ফির্কাহ নাজিয়ার প্রথম উদ্দেশ্য হল শির্ক দূরীভূত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, শির্ক (মাযার ইত্যাদি পূজা), বিদআত প্রভৃতি কুফরীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আহকাম ও ফাযায়েলের তাকীদ অথবা ইসলামী রাষ্ট্র রচনার পরিকল্পনা করে না। যেহেতু সর্বাগ্রে ঈমানী ও তাওহীদী তরবিয়ত, তারপর সেই বুনীয়াদে আহকাম ও রাষ্ট্র-রচনা হয়। আর এই ভিত্তি মজবুত না হলে সবকিছুই ভঙ্গুর ও বিফল হয়।

আহলে হাদীস ইবাদত, আচরণ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহকে জীবিত রাখে। তারা কুরআন ও (সহীহ্) সুন্নাহর মত ছাড়া অন্য কারো মতের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করে না। তারা আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। কোন নির্দিষ্ট এক ইমাম বা ধর্মসংস্কারকের অন্ধানুকরণ ও পক্ষপাতিত্ব করে না। তাঁদের মধ্যে যাঁর কথা কুরআন ও (সহীহ্) সুন্নাহর অনুবর্তী হয় তাঁর কথা গ্রহণ করে; যেমন তাঁরা করেছেন এবং সকলকে তা করতে আদেশ করেছেন।

এই জামাআত সৎকর্মে আদেশ এবং অসৎকর্মে বাধা দান করে। দ্বীনে নব-রচিত পন্থা বা বিদআতকে অস্বীকার ও রদ্দ করে এবং প্রতি সেই দল ও জামাআত থেকে দূরে থাকে যা তাওহীদের মূলে কুঠারাঘাত হানে এবং উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

তারা মুসলিম তথা সারা বিশ্বের মানুষকে কেবল কিতাব ও সুন্নাহকে ভিত্তি ও অনুসরণ করে ঐক্যের প্রতি আহবান করে। মানব-রচিত মনগড়া কানুন অস্বীকার করে এবং ইসলামী কানুন দ্বারা বিচার ও মীমাংসা করার দাওয়াত দেয়। এর পদ্ধতি, সর্বাগ্রে সংশোধন, অতঃপর সংগঠন। এর বিপরীত নয়।

তারা মুসলিমদেরকে রসনা, লিখনী, অর্থ ও জীবন দ্বারা জিহাদের প্রতি ডাক দেয়। যাতে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামের শান্তি-রাষ্ট্র রচিত হয়।

এ ছাড়া এই জামাআতের অন্যান্য বিশ্বাস ও নীতি এই পুস্তিকায় আলোচিত হয়েছে।

চরিত্রগত দিক থেকে তারা সবার উপরে। এক অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী, উদারবক্ষ, সাক্ষাতে সুস্মিত, সুভাষী, সদালাপী, অন্তরঙ্গ সাথী এবং স্থৈর্যে ও বীর্যে বড় আদর্শবান।

ব্যবহারে তাদের সততা, মহত্ত্ব, মহানুভবতা, অঙ্গীকার পালন, আমানতদারী ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

অবশ্য ব্যবহারিক বা চারিত্রিক কোন গুণের ঘাটতির কারণে 'ফিরকাহ নাজিয়াহ' হতে কেউ খারিজ হয়ে যায় না। তবে তাওহীদ ও আকীদার কোন অসম্পূর্ণতা এবং বিদআত (যা কাফের করে ফেলে) এই জামাআত থেকে খারিজ করতে পারে।

তারা বাতিলের খন্ডন ও প্রতিবাদ করে কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা। বিদআতকে অন্য বিদআত দিয়ে, অভক্তিকে অতিভক্তি বা অতিরঞ্জন দিয়ে এবং অতিরঞ্জনকে অভক্তি দিয়ে, খন্ডন করে না।

মুসলিম একতা চায়। দলাদলি মুসলিমের চরিত্র নয়। *(কুঃ ৬/১৫৯)* কিন্তু আহকামের

মাসায়েলে (কার্যাকার্যের ব্যবহারিক জীবনের সমস্যায়) কিছু ইজতেহাদী মতবিরোধ থাকার জন্য আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের মধ্যেও বিভিন্ন মযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনদের মতানৈক্যে তাঁদের মুকাল্লেদগণ তাঁদের নামে আপন আপন মযহাব তৈরী করে নিয়েছে। যে ইমামের মুকাল্লেদ কম, সে ইমামের নামে কোন মযহাব তৈরী হয়নি। কিন্তু যে চার ইমামের মুকাল্লেদ বেশী ছিল, তাঁদের নামে প্রসিদ্ধ চারটি মযহাবের জন্ম হয়। ([50]) ·

অথচ সকলের উৎসমুখ কুরআন ও সুন্নাহ। সকল ইমামই আহলে সুন্নাহ বা হাদীস ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণকে তাঁরা ওয়াজেব জানতেন এবং সবাই এতে একমত ছিলেন। তাঁরা এ কথাও জানতেন যে, রসূলের কথা ছাড়া বাকী অন্য কোন সাহাবী, তাবেয়ী ইমাম বা আলেমের কথা মান্যও হতে পারে এবং অমান্যও। কিন্তু তাঁরা মা'সুম ছিলেন না, মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁদের কোন ফায়সালা ভুল হলে একটি এবং ঠিক হলে দু'টি নেকীর তাঁরা হকদার হন।

কিন্তু পরিষ্কার শুদ্ধ বা সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কখনো কখনো বহু বিষয়ে তার বিপরীত (হাদীস বিরুদ্ধ) মীমাংসা বা সমাধান কেন দিয়েছেন? তার কয়েকটি কারণ আছে ঃ-

১। তাঁর নিকট ঐ সহীহ হাদীসটি পৌছেনি। রসূল ﷺ-এর সমস্ত হাদীস জানা কোন একজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উম্মতের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন সাহাবীগণ। বিশেষ করে চার খলীফা এবং তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর ﷺ সর্বদা রসূল ﷺ-এর সাথে সাথে থাকতেন । তবুও তাঁর পক্ষে সমস্ত হাদীস জানা সম্ভব হয়নি। তিনি অপর সাহাবীকে হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। *(আঃ দাঃ ২৮৯৪)*

অনুরূপভাবে হযরত ওমর ﷺ ও অন্য সাহাবীর নিকট জেনে নিতেন। *(বুঃ ৬২৪৫, মুঃ ২১৫৩)*

অতএব নিঃসন্দেহে তাঁদের পরে কোন ইমামের নিকট সমস্ত সহীহ হাদীস যে পৌছেনি তা খাঁটি সত্য। তেমনি নির্দিষ্ট কোন একটি কিতাবে ও সমস্ত হাদীস একত্রিত পাওয়া যায় না। (পরন্তু তাঁদের যুগে হাদীসের এত বড় বড় সকল গ্রন্থও ছিল না।) যার জন্য কোন সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে ইমাম সাহেব কোন যয়ীফ হাদীস অথবা কিয়াস অথবা নিজ রায়কে ভিত্তি করেন, যা ঐ সহীহ হাদীসের বিপরীত হয়। কিন্তু যদি তাঁর নিকট ঐ সহীহ হাদীস পৌছে থাকত, তবে নিশ্চয় তিনি তা সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তা অমান্য না করে তদনুসারে ফায়সালা দিতেন।

২। হাদীস তো ইমামের নিকট পৌছেছে কিন্তু যে রেজাল (বর্ণনাকারী) সূত্রে তাঁর নিকট পৌছেছে তা যয়ীফ অথচ সেই হাদীসই অন্য রেজাল-সূত্রে সহীহ।

৩। হাদীস তাঁর নিকট যয়ীফ অথচ (একই রেজাল-সূত্রে) অপরের নিকট তা সহীহ। এই জন্য ইমামের কথায় পাওয়া যায়, 'এই মাসআলায় (সমস্যায়) আমার এই রায়, কিন্তু হাদীসে বর্ণিত রায় ভিন্ন। অবশ্য হাদীস যদি সহীহ হয়, তাহলে আমার রায় হাদীসের রায়।'

৪। কোনও রেজাল-সূত্রের কোন স্তরে কোন বর্ণনাকারী একা পড়লে (খবর ওয়াহেদ) অনেকের মতে তা গ্রহনীয় নয়। আবার অনেকের নিকট কিছু শর্তে গ্রহনীয় এবং

---

(৫০) *জ্ঞাতব্য যে, নজদী বা ওয়াহাবী কোন পৃথক মযহাবের নাম নয়। নজদের শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব কোন অভিনব মযহাবের প্রবর্তক ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাহ বা সালাফী জামাআতের সংস্কারক।*

অনেকের নিকট তা বিনা শর্তে গ্রহণীয়।

৫। হাদীস তাঁর নিকট পৌঁছানর পর তিনি তা ভুলে গেছেন। যেমন হযরত ওমর ﷺ এর ঘটেছিল। *(বুঃ ৩৩৮, দু মঃ ২/৪৬৬)*

৬। হাদীসের মূল উদ্দেশ্য তাঁর নিকট ব্যক্ত হয়নি। কোন বাক্য বা শব্দের একাধিক অর্থ থাকার কারণে অথবা তার আভিধানিক অর্থ এক রকম এবং শরয়ী অর্থ অন্য রকম হওয়ার কারণে নিজ নিজ বুঝের উপর ভিত্তি করে কোন বিষয়ে ফায়সালা দেন। যেমন, রোযার দিনে সাহাবীদের সাদা ও কালো সুতো রাখার ব্যাপার। 'খাইত্ব' এর আভিধানিক অর্থ সুতো কিন্তু শরীয়তে 'খাইতুন আবয়্যায্' (সাদা সুতো) এর অর্থ উষা (সুবহে সাদেক), এবং খাইতুন আসওয়াদ' (কালো সুতো) এর অর্থ রাত্রি। *(কুঃ ২/১৮৭, বুঃ ১৯১৭)* কিন্তু তাঁরা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে আমল শুরু করেছিলেন।

৭। ইমামের নিকট হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ের কোন ঈঙ্গিত বহন করে না।

৮। হাদীস যে মাসআলার জন্য দলীল রূপে পেশ করা হয়, ইমামের নিকট ওর বিপক্ষে এমন একটি দলীলও আছে যাতে তিনি পূর্বের দলীল বা হাদীসকে সঠিক মনে করেন না। তাই নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট, সাধারণ-বিশেষ, মূখ্যার্থ-গৌণার্থ আভিধানিক বা আলঙ্কারিক অর্থ, প্রকৃত-অপ্রকৃত প্রভৃতি ব্যাকরণ, ফিকহ্ এবং অসূল-শাস্ত্রীয় নিয়ম-নীতির মতবিরোধে একটি গ্রহণ করে অপরটিকে পরিত্যাগ করেন।

৯। অনেক সময় ইমাম হাদীসকে (পরস্পর-বিরোধী হওয়ার জন্য) মনসুখ (রহিত) দুর্বল অথবা ভিন্ন তাৎপর্যযোগ্য বলে মনে করেন। অথচ অন্যের নিকট তা পরস্পর-বিরোধী বা মনসুখ নয় ইত্যাদি।

এ ছাড়া বহু কারণে ইসলামে এই মতভেদের সৃষ্টি হয়। অতএব এ ব্যাপারে তাঁদের কোন ত্রুটি ছিল না। তাই তাঁরা সকলেই সওয়াব ও নেকীর অধিকারী। মুসলিম তাঁদের প্রতি কোন কটূক্তি করে না। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখে। যখন তাঁদের উল্লেখ করে, ভক্তি ও দুআর সাথে করে; *(কুঃ ৫৯/১০)* 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।' যাঁদের মেহনত ও প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত। "তাঁরা এক সম্প্রদায় যাঁরা গত হয়ে গেছেন। তাঁরা যা করেছেন তাঁর প্রতিদান পাবেন এবং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। অতীতে বিগতজনেরা যা করেছে সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।" *(কুঃ ২/১৩৪)*

কিন্তু রহস্য জানার পর মুসলিমের উচিত কি ?

তার উচিত, যখন তার নিকট কোন মতবিরোধপূর্ণ সমস্যা আসে, তখন সমাধানের জন্য কিতাব ও সুন্নাহর আলো খোঁজা। সকলের মত ও পথ পরিত্যাগ করে আল্লাহর নির্মিত এবং রসূলের প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করা। এটাই ঈমানের পূর্ণ দাবী। *(কুঃ ৪/৫৯)* সহীহ হাদীসের সঠিক অর্থ জানার পর তার প্রতিকূলে কারো কথায় বা মতে চলা মুসলিমের ধ্বংসের কারণ। *(কুঃ ৪/১১৫)*

তাই নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তকলীদ করা ওয়াজেব নয়। ([51]) ওয়াজেব তো শুধু

---

(৫১) *চার মাযহাবের কোন একটির তকলীদ ওয়াজেব হওয়ার উপর কোন দিন 'ইজমা' (সর্ববাদিসম্মতি)ও হয়নি। যে বিষয়ে চির-বিরোধ থেকেই গেছে তাকে 'মুজমা' আলাইহে' বা সর্ববাদিসম্মত কি করে বলা যায়? তাছাড়া অন্যের মতের উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র আপোসের সমর্থনে ইজমা' কায়েমের দাবী করলেই ইজমা' হয় না।*

মুহাম্মদ ﷺ এর অনুসরণ। অবশ্য যারা জানে না তারা আলেমদের তকলীদ করবে। আলেম যে বিষয় জানেন না, সে বিষয়ে বড় ওলামা, মুহাদ্দেসীন ও আয়েম্মাগণের 'ইত্তেবা' করবেন। মতভেদ পেলে তাঁর ফায়সালা বা কথা গ্রহণ করবেন যাঁর কথা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী। যাঁর ফায়সালার দলীল অধিক মজবুত।

মুসলিম সমস্ত ফকীহগণের লিখিত গ্রন্থাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা রাখে। সেই অমূল্য ইলম ভক্তি ও যত্নসহকারে অধ্যয়ন করে। তাঁদের বিভিন্ন মতের মধ্যে সেই মতটিকে গ্রহণ করে যা কিতাব ও সুন্নাহর অধিক অনুসারী।

হক ও বাতিল

মুসলিমের উচিত যে, সে যেন কোন বে-আমল ফাসেক আলেম অথবা কোন মূর্খ আবেদের (ভন্ড তপস্বী, ধর্মধ্বজী ও দরবেশদের) বাহ্যিক বেশভূষা ও আড়ম্বরপূর্ণ চালচলন দেখে তাদেরকে বিরাট কিছু মনে না করে এবং তাদের অনুসরণ বা অনুকরণ না করে; যারা অসৎ উপায়ে ধোকা দিয়ে লোকের অর্থ লুটে বেড়ায়। *(কুঃ ৫/৭৭, ৯/৩৫)*

মুসলিমের স্বভাব নয় যে, সঠিক কোন যুক্তি বা দলীল ছাড়া বিগত যুগের লোকদের দোহাই দিয়ে কোন কাজ করে। *(২৩/২৩-২৫, ২৮/৩৬-৩৭)* অথবা হক বাতিলের পরিচিতির জন্য সংখ্যাধিক্যকে মানদন্ড মনে করে। অতএব কোন বিষয়ের অনুসারীদের সংখ্যা অধিক হলেই যে তা হক এবং অল্প হলেই যে তা বাতিল -তা অবশ্যই ধারণা করে না। যাদের যুক্তি ও দলীল অধিক মজবুত তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও তারাই হকপন্থী। *(কুঃ ৫/১০০, ৬/১১৬)*

অনুরূপভাবে, হক জানার মানদন্ড কোন জাতির শক্তি, পার্থিব্য জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্ব, সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তিও নয়। ধর্ম হারিয়ে এ সকল বিষয়ের উন্নয়ন প্রগতি নয়, দুর্গতি। *(কুঃ ৩৪/৩৪-৩৬, ৪৬/২৬)* প্রকৃতপক্ষে যারা ধর্মের জ্যোতির সাথে বিজ্ঞানে উন্নত তারাই 'প্রগতিশীল'। আর যারা ধর্মের আলোর সাথে বিজ্ঞানের আলো পেয়ে থাকে, তারাই 'আলোক প্রাপ্ত' মানুষ। যদিও আসলে ধর্মের আলোয় যাদের মন মস্তিষ্ক ও জীবন আলোকিত তারাই আলোকপ্রাপ্ত, সুপথপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

যারা ইহলোককেই সবকিছু মনে করে অথবা যাদের জীবনের কোন লক্ষ্যই নেই তাদের জন্য পশ্চিমের আলোই (ধর্মহীনতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি) যথেষ্ট এবং উপযুক্ত। কিন্তু যাদের জীবনের মূল লক্ষ্য পরলোকের চিরস্থায়ী সুখ তাদের জন্য পশ্চিমের আলো অন্ধকার এবং ইসলামের আলোই পথের দিশারী। পশ্চিমের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি অবশ্যই দুনিয়ার আলোক, তা বলে তার সাথে তাদের সমাজ-ব্যবস্থা ও লাগামহীন জীবন ব্যবস্থাকে আলোক বলা যায় না। আবার বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের কোন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয় অথবা ধর্মহীনতার ফল নয়। ধর্ম বিজ্ঞানের পথে যেতে বাধা দেয় না। তবে ঐ স্রোতে থেকে তারা যাকে সভ্যতা, স্বাধীনতা, প্রগতি ও স্বাচ্ছন্দ্য মনে করছে, ধর্ম তাকে তার বিপরীত মনে করে।

মুসলিম প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকদেরকে চোখ বুজে যেমন হকপন্থী মনে করে না, তদ্রূপই কোন দুর্বল শ্রেণীর মানুষদেরকে নির্বিচারে বাতিলপন্থী মনে করে না। হকপন্থী তারাই যাদের কাছে সত্যই হক থাকে। *(কুঃ ১১/২৭)*

মুসলিম হকপন্থী হয়। উদার মনে হক কবুল করেও থাকে। যেমন, হক ও সত্য

জানার পর তা গোপন করে না এবং হক ও বাতিলের সংমিশ্রন ঘটায় না। *(কুঃ ৩/৭১)*

সে না বুঝার বা মন ঠিক না থাকার অজুহাত দেখিয়ে হকের (ধর্মের) অনুশাসন থেকে দূরে থাকতে চায় না। কারণ, কাফেরই এরূপ খোঁড়া অজুহাত পেশ করে থাকে এবং ভাবে যে, তার অন্তর জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরপুর। তার আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। তাই নাক সিটকিয়ে বলে, 'মোল্লাদের কথায় কান দিয়ে কি দরকার?' *(কুঃ ২/৮৮, ১১/৯১, ৪১/৪-৬)*

মুসলিম দলীয় নীতির বিরোধী হওয়ায় বা পরশ্রীকাতরতায় কোনও হক বা সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে না। *(কুঃ ২/৯১)* (যেমন নর্দমায় পড়ে থাকলেও সোনাকে সোনার মানই দেয়।) আবার কারো যাদু বা জিন দ্বারা কৃত অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড দেখে নির্বিচারে 'কারামত' মনে করে তাকেই হকপন্থী মনে করে না। *(কুঃ ২/১০১-১০২)*

যেখানে প্রতি দল নিজের বিশ্বাস নিয়ে গর্বিত, প্রত্যেক দলই কথায় বা কাজে নিজেকে হকপন্থী ও সত্যানুসারী বলে দাবী করে, সেখানে মুসলিম যুক্তি ও দলীল অন্বেষণ করে। নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তায় সেই যুক্তি ও দলীল নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে, এবং দলীল ও যুক্তি যাকে সমর্থন করে তাকে সেও সমর্থন করে। *(কুঃ ২/১১-১১৩)*

পরন্তু তাকে এও খেয়াল রাখা উচিত যে, যাতে সামান্য বিষয় নিয়ে আপোষে তর্ক-বিবাদ বা দ্বন্দ্ব শুরু না হয়। কারণ, কতক আহকাম এমন আছে যা দুইভাবে পালন করা হয়। যেমন, নামাযের ইকামত একক অথবা ডবল, জুমআর এক আযান অথবা (প্রয়োজন পড়লে) দুই আযান, ইস্তেফতাহে 'আল্লাহুম্মা বায়েদ বায়নী' পড়বে অথবা 'সুবহানাকা' পড়বে, সিজদায় যাবার সময় আগে হাত রাখবে না হাঁটু রাখবে, জানাযার নামাযের প্রত্যেক তকবীরে হাত তুলবে কি না তুলবে, ইত্যাদি বিষয়। ঊর্ধ্বপক্ষে একটি অপরটি থেকে আফযল বা উত্তম। কিন্তু যেটা নিজে করে সেটাকেই অবশ্য পালনীয় বা ঠিক এবং অন্যে যেটা করে সেটাকে অবশ্য বর্জনীয় বা ভুল মনে করে আপোষে তর্কাতর্কি ও মনোমালিন্য সৃষ্টি মুসলিম করে না। তেমনি যেখানে অধিক মতপার্থক্য বা হালাল-হারামের মতভেদ দেখা দেয়, সেখানে সমঝোতার সাথে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের সমাধানকেই নির্বিবাদে ঘাড় পেতে মেনে নেয়। যেমন, মুসলিম কোন দিন না জেনে কোন বিষয়ে অযৌক্তিক তর্ক ও ঝগড়া করে না। *(কুঃ ৩/৬৬)*

যুগে যুগে হকপন্থীরা হকের অনুসারী হয়ে চলে। কিন্তু বাতিলপন্থীরা তাদের উপর দোষারোপ করে থাকে। তাদেরও দাবী তারাই হকপন্থী। (সবাই বলে লায়লা আমার, লায়লা কাউকে চেনে না।) তারা হকের ঠিকেদার হয়ে হকপন্থীদেরকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে; নবীর উপর দরূদ পড়েনা, নবীকে ভালোবাসে না, নবী ও আওলিয়াদের প্রতি তাদের কোন ভক্তি ও আদব নেই, ইত্যাদি। কারণ, হকপন্থীরা তাঁদেরকে আল্লাহর আসনে বসায় না বা শরীক করে না তাই! আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের কথার উপর কারো কথাকে প্রাধান্য দেয় না বলে তাদেরকে গায়র মুকাল্লেদ কাফের বলা হয় ! ইত্যাদি।

পূর্বেও কখনো বা হকপন্থীকে স্বার্থান্বেষী, প্রতিপত্তি-লোভী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। *(কুঃ ১০/৭৮)* শান্তি সৃষ্টি করতে চাইলে তাদেরকে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। *(কুঃ ২/১১-১২)* ভুল ধরিয়ে হকের সন্ধান দিতে চাইলে তাদেরকে দ্বীন পরিবর্তনকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে। *(কুঃ ৪০/২৬)* সত্য প্রচার করতে গেলে তারা তাদের বিরুদ্ধে দেশের সরকারকে কানভাঙ্গানি দিয়েছে এবং হকপন্থীদের বিরুদ্ধে সরকার-বিরোধী চক্রান্তের মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে। *(কুঃ ৭/১২৭)*

যেমন, রসূলের নির্দেশমত কুফরী না দেখা পর্যন্ত ক্ষমতাসীন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলে তাদেরকে রাজতোষ প্রভৃতি বলা হয়েছে। কখনো বা তাদেরকে পাগল, গোঁড়া ও নির্বোধও বলা হয়েছে। *(কুঃ ২/১৩, ৭/১৬)* কিন্তু হক দমে যায়নি, হার মানেনি, সত্য আজও জীবিত। বিজয় চিরদিন সত্যেরই।

মুসলিম চরিত্র গঠনকারী আল্লাহর পদাবলী কুরআন (ও সুন্নাহ) থেকে মুখ ফিরিয়ে চরিত্র বিনষ্টকারী শয়তানের পদাবলী (নাস্তিকতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা ও যৌন সম্পর্কিত বই, পত্র-পত্রিকা) পঠনে অবশ্যই মনোযোগী হয় না। তেমনি ধর্মীয় বাণী প্রত্যাখান করে সুর-বাদ্য ও সঙ্গীত শ্রবণে বা অশ্লীল ছবি দর্শনে অবশ্যই মন দেয় না। ইন্দ্রিয় (চক্ষু,কর্ণ হৃদয় ইত্যাদি) আল্লাহরই দান। ইন্দ্রিয় সম্পর্কে বিচার দিবসে বান্দাকে কৈফিয়ত করা হবে। *(কুঃ ১৭/৩৬)*

বিজাতির অনুকরণ

সত্যানুসারী সদা সত্যের অনুসরণ করে। কখনোও মিথ্যার অনুসরণ করে না। অসত্য ও মিথ্যা থেকে দূরে থাকে। মুসলিম সত্যের অনুসারী তাই মিথ্যানুসারী কোন বিজাতির অনুকরণ করে না। কারণ, যে মিথ্যার অনুকরণ করে, সে যেন মিথ্যাকে পছন্দ করে, তাতে সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ করে। আর যে যার অনুকরণ করে সে তার দলভুক্ত। *(আঃ দাঃ ৪০৩১, মঃ জাঃ ৬০২৫, মুঃ আঃ ২/৫০)*

ইসলামে মুসলিমদের জন্য দু'টি ঈদ বা খুশীর দিন; ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা। এ দু'টি ছাড়া ইসলামে কোন পালনীয় তৃতীয় ঈদ নেই। যেহেতু ইসলামে ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই, তাই মুসলিম কারো জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন করে না, ঈদে মীলাদুন নবী (নবী দিবস) ফাতেহা ইয়াযদাহাম, ফাতেহা দোয়াযদাহাম, আখেরী চাহার শোম্বা, মুহার্রম, শবে-বরাত, শবে-মি'রাজ ইত্যাদি কোন পালপর্বের অস্তিত্ব ইসলামে নেই। মুসলিম এ ধরনের কোনও আমোদিত উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর স্মৃতি জাগাতে চায় না। যেহেতু স্মৃতি-বার্ষিকীতেই তাঁর স্মরণ যথেষ্ট নয়। তাঁর স্মরণ ও অনুসরণ তো মুসলিমের দৈনন্দিন বরং সার্বক্ষণিক কর্তব্য। কারণ, মুসলিমকে সর্বদা সর্বকাজে (এমন কি প্রস্রাব পায়খানার সময়ও) তাঁর আদর্শ মতে চলতে হয়। অতএব ক্ষণেকের এ স্মরণ, এ মহব্বত কোন কাজের নয়। তাঁর স্মৃতি ও স্তুতিকে আল্লাহ তাআলা উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। *(কুঃ ৯৪/৪)* আর মুসলিমের জীবন তো তাঁর আদর্শ, তাঁর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

সুতরাং মুসলিম খৃষ্টানদের যীশুর জন্মদিন পালন করা দেখে নবী-দিবস পালনের খেয়াল আনে না। তাদের 'হ্যাপী বার্থডে' ও 'হানী-মুন' ইত্যাদি পালনে আনন্দের জোয়ার দেখে মুসলিম অযথা তার সম্পদের অপচয় ঘটায় না। কারো শোকদিবস উদ্‌যাপন করা দেখে ইমাম হুসাইন ﷺ -এর শোক দিবসের নামে মর্সিয়া-মাতম, তাযিয়া বা নিশানা মিছিলের সাথে বিভিন্ন বাদ্য-বাজনায় আত্মপ্রহারে উন্মত্ত হয় না। যেহেতু মৃতের জন্য শোকপালন, উৎসব করা জাহেলিয়াতের প্রথা। *(মুঃ ৯৩৪, মুঃ ৫/৩৪২)*

মুসলিম তার আচারে-অনুষ্ঠানে ও পোশাকে-পরিচ্ছদেও বিজাতির সাদৃশ্য ধারণ করে না। তাই মুসলিম নর-নারী এমন সংকীর্ণ (টাইট্‌ফিট) পোশাক পরে না, যাতে তাদের

শরীরের উঁচু-নিচু প্রকাশিত হয়। অথবা এমন পাতলা পরে না, যাতে তাদের দেহ প্রকাশ পায়। অথবা (কোন খেলা বা কাজের জন্য বা ফ্যাশান (?) ঝোঁকে) এমন খাটো পোশাক পরে না, যাতে পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মেয়েদের (গায়ের মাহরামের সামনে) মাথার কেশ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কোনও অংশ প্রকাশ পায়। অথবা এমন লম্বা পরে না যে, তাতে পুরুষের পায়ের গাঁট দেহের পোশাকে স্পর্শ করে। কারণ, এ ধরনের লেবাস বিজাতির। ফ্যাশানের নামে যাতে ইজ্জত প্রকাশ পায়, বিলাসিতার নামে অহংকার (মস্তানী) বৃদ্ধি পায় এবং সভ্যতার নামে বাড়তে চলে চক্ষুর ব্যভিচার ও শুরু হয় যৌন-উন্মাদনা।

অনুরূপভাবে মুসলিম (নর বা নারী) এমন কোন পরিচ্ছদ ও বেশ-ভূষা ধারণ করে না, যা বিজাতির কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য। যেমন, ক্রুশ, টাই, গেরুয়া, সিন্দুর, নোয়া, মঙ্গল-সূত্র, পুরুষের দাড়ি না রাখা এবং মেয়েদের চুল ছাঁটা ইত্যাদি।

বিজাতির অনুকরণে নারী-স্বাধীনতার নামে মুসলিম তার মা-বোনকে নগ্নতায় নামায় না। পর-পুরুষের সাথে অবাধ মিলা-মিশার সুযোগ দেয় না। যেমন, প্রসিদ্ধিজনক ও পুরুষের লেবাস পরতে তাদেরকে অনুমতি দেয় না।

মুসলিম সালাম করতে প্রণামের অনুকরণ করে না। মুসলিমের উচ্চশির শুধু আল্লাহর সামনেই অবনত হয়। অতএব বিজাতির অনুকরণ করে কোন রাজা-বুযুর্গ ও গুরুজনকে সালাম করতে গিয়ে মাথা নত করে না, পায়ে পড়ে না বা ঝুঁকে (প্রণাম করে) না। মুসলিম তো কাফেরদের বিপরীত করতে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখতে আদিষ্ট হয়েছে।

আকীদায় এমন তফাৎ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহার করে। *(কুঃ ৬০/৮)* তাদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পার্থিব জীবনের অন্যান্য দুয়ারে তাদের সহিত অংশগ্রহণ করে। ন্যায়-পরায়ণতা ও উদার মানবতার সাথে বিচার ও মীমাংসা করে। তাদের উপহার ও উপঢৌকন -যা ইসলামে হালাল তা- গ্রহণ করে এবং মুসলিম তার প্রতিদানও দিয়ে থাকে। তাদের দরিদ্রকে (নফল সদকা হতে) সাহায্য করে, বিপদে সাহায্য করে। তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার প্রচেষ্টা করে। *(বেঃ এঃ ৭১-৭৪)*

অবশ্য তাদের শির্ক ও অন্যায়ে কোন প্রকারের সহায়তা করে না। শির্ক ও অন্যায়ের মজলিস, মহফিল মেলা এবং সমাবেশে অংশগ্রহণ করে না। *(কুঃ ৬/৬৮)* তাদের শির্কী, কুফরী, (তদনুরূপ কোন পাপ ও বিদআতের) ঈদ বা পর্বে তাদেরকে মোবারকবাদ বা অভিনন্দন জানায় না এবং চাঁদাও দেয় না। কারণ, তাতে তার সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ পায়।

আবার যারা ইসলাম-দুশমন। মুসলিমের রক্তপিপাসু, যাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি হয়, ইসলামের জলন্ত প্রদীপকে ফুঁ দিয়ে নির্বাপিত করতে চায়। ইসলামের উপর মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ রটাতে চায়, ইসলামের ক্ষতিতে যারা মিষ্টি হাসি হাসে, মুসলিমদের জন্য অমঙ্গল ও বিপদ কামনা করে- তাদেরকে মুসলিম নিজে অন্তরঙ্গ করে না। কুরআন তাদের বিরুদ্ধে লড়তে বলেছে। *(কুঃ ২/১৯০,৫৮/২২, ৬০/৯)*

পাপকে ঘৃণা, পাপীকে নয় (?)

'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।' কারণ, পাপী এক দিন তওবা করে ধার্মিক হতে পারে। আর এই জন্য পাপীকে মানবিক সাহায্য (কোন অধর্মীয় গর্হিত কাজে নয়) হতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কারণ, প্রত্যেক (উপকারী অথবা যার দ্বারা কোন অপকার সাধিত হয় না এমন) জীবেরই জীবন বাঁচাতে সাহায্য করায় পুণ্য আছে। তাই কুকুর-বিড়ালকেও খাদ্য-পানীয় দিয়ে সাহায্য করলে পাপ ক্ষয় হয়। *(মুঃ ২২৪৪-২২৪৫)* অতএব মানুষ তো এর চাইতে বেশী হকদার। কিন্তু কোন মানুষ যদি কুকুর বিড়াল থেকেও নিকৃষ্ট হয়? (মানুষ কর্মদোষে চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট হয়।) *(কুঃ ৭/১৭৯)*

'হিংস্র বাঘের আক্রমণকে ভয় কর, বাঘকে নয়। সাপের দংশনকে ভয় কর, সাপকে নয়।' কিন্তু তাও কি সম্ভব? সম্ভব তখনই, যখন হিংস্রের হিংস্রতাকে কাবু অথবা নিষ্ক্রিয় করা যায়।

অনুরূপভাবে মহাপাপীর মহাপাপ অভ্যাসকে দূর না করে তাতে ঘৃণা না করা কোন যুক্তির কথা নয়। অন্যায় ও পাপ দেখলে হাত দ্বারা (শক্তি দ্বারা) বাধা দিতে হবে। না পারলে জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে বা ভীতি প্রদর্শন করে), তাতেও অপারগ হলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা জানতে হবে-পাপকে এবং পাপীকেও। পাপী ছাড়া শুধু পাপকে কি প্রকারে বাধা দেওয়া যায় বা ঘৃণা করা হয়? সাপকে ভালোবেসে যদি অজান্তে দংশন করে বসে? পাপীর ভোগ্যফল যদি নিষ্পাপী বন্ধুকেও ভোগ করতে হয়? স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তবে কে বলবে যে, ব্যভিচারকে ঘৃণা কর স্ত্রীকে নয়? আর এভাবে কি পাপ ও অন্যায়ের তুফান রোখা সম্ভব হবে? সমাজে কি শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজ হবে?

পাপীকেও ঘৃণা করা হয় বলেই তাকে ফাসেক, মুনাফেক, কাফের ইত্যাদি বলা হয়। আর তার জন্যই শান্তিরক্ষাবাহিনী, আদালত, কারাগার এবং বিভিন্ন দন্ডাদি নির্ধারণ করা হয়। অন্তরে ঘৃণা জেনেও পাপীদের পাপ মজলিসে অংশ গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তাতে বাহ্যতঃ পাপের সমর্থন হয়। *(কুঃ ৬/৬৮)* আবার যদি কারো অন্তরে ঘৃণা না জন্মে, তাহলে তার ধূলিকণা পরিমাণও ঈমান নেই বলে জানতে হবে। *(মুঃ ৪৯)*

মোট কথা, পাপীকে প্রথমে বুঝাতে হবে। তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন ও পাপ বর্জন করার লক্ষ্যে উপদেশ দিতে হবে। যদি সে পাপ বর্জন না করতে চায় তবে দেখতে হবে যে, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাতে অথবা সামাজিক বয়কটে কোন ফল আছে কিনা। যদি তাতে কোন সুফল লাভের আশা থাকে বা পাপী পাপ ত্যাগ এবং সত্য পথের অনুসরণ করবে বলে মনে হয়, তাহলে বয়কট করতে হবে। *(বুঃ ৪৬৭৭, মুঃ ২৭৬৯)*

কিন্তু যদি তাতে কোন লাভ পরিদৃষ্ট না হয়, বরং বয়কটে বা সামাজিক সম্পর্ক ছিন্নতায় ক্ষতির আশঙ্কা অধিক থাকে, তবে তা করা যাবে না।

আবার তার সাথে ওঠা-বসা মিলা-মিশা বা ভাব-বন্ধুত্ব রাখাতে যদি তার প্রত্যাবর্তনের আশা থাকে, তাহলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বা উঠা-বসা রেখে তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করতে হবে। নচেৎ নিজস্ব কোন স্বার্থে পাপীর সঙ্গে (হাতে-জিবে-মনে বিনা কোন প্রতিবাদেই) বন্ধুত্ব করার অর্থই হল তার পাপে সম্মত হওয়া। যা কোন মুসলিমের পক্ষে আদৌ বৈধ নয়।

যেমন, 'ওদের সাথে মিশতে নেই' বলে উপদেশ করা হতে দূরে থাকাও উচিত নয়।

যেমন 'যে কাঠ খাবে সে আঙ্গার হাগবে' বলে কর্তব্যহীনতা প্রকাশ করাও অনুচিত।

আবার যে পাপী বা বিদআতীর সংস্রবে প্রভাবান্বিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ থাকে তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা, তার থেকে দূরে থাকা, বন্ধুত্ব না রাখা, তাকে সালাম না দেওয়া, সাক্ষাৎ না করা ইত্যাদি অবশ্যকর্তব্য হয়।

মুসলিম আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কোন সাহাবী (সহচর)কে গালি-মন্দ বা অভিসম্পাত করে না। *(মুঃ ২৫৪০, বুঃ ৩৬৭৩)* যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে গালি দেয়, সে ইসলামী আইনে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। অবশ্য তাকে হত্যা করা হবে কি না, সে নিয়ে মতভেদ আছে। যে ব্যক্তি তাঁদের সকলকে অথবা কিছুকে কাফের বা ফাসেক মনে করে তাহলে সে কাফের। আবার যে তাঁদের কাউকে কৃপণ বা ভীরু ইত্যাদি বলে গালি দেয় সে কাফের না হলেও পাপী বটে। তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকারের মন্দ মন্তব্যকারীর জন্য ইসলামে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

মুসলিম তার হৃদয় ও রসনাকে সাহাবায়ে কেরামগণের জন্য উদার, পবিত্র ও শ্রদ্ধাসিক্ত রাখে। তাদের উপর কোন প্রকারের কুধারণা ও কুবাক্য ভুলেও মুখে আনে না। মুসলিম তাঁদের জন্য তাই বলে, যা প্রতিপালক আল্লাহতাআলা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' *(কুঃ ৫৯/১০)*

কিছু সাহাবাবর্গ প্রসঙ্গে সমালোচনা-সম্বলিত বর্ণনার কিছু তো মিথ্যা। আর কিছু এমন যাতে কম-বেশী ও হেরফের করে আসল ঘটনা চাপা রেখে অথবা কোন দলীয় স্বার্থে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা যা করে গেছেন তাতে তাঁদের ওযর ও অজুহাত ছিল। তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন; সঠিক কর্তব্য করে থাকলে দুটি এবং ভুল করে থাকলে একটি নেকীর অধিকারী হবেন এবং তাঁদের ভুল ক্ষমার্হ হবে। *(বুঃ ৭৩৫২)*

মুসলিম এ বিশ্বাসও করে না যে, প্রতি সাহাবীই সমান অথবা মা'সুম কিংবা সাগীরাহ ও কাবীরাহ গোনাহ থেকে মুক্ত ছিলেন। বরং তাঁরা মানুষ ছিলেন। তাঁদের দ্বারা পাপ হওয়া কোন অসম্ভব ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। কিন্তু তাঁদের প্রচুর পুণ্য ও নেক আমল, ইসলামে অগ্রগামিতা এবং বহু মান-মর্যাদা রয়েছে; যাতে যদিও তাঁদের দ্বারা কোন পাপ হয়ে থাকে তবুও তা মাফ হয়ে যায়। এমন কি যেমন তাঁদের পাপ ক্ষমা করা হয়, তেমন কোন পরবর্তী কালের মানুষের জন্য করা হয় না। কারণ, তাঁদের যে পুণ্য ছিল -যার দ্বারা পাপক্ষালন হয়- তা তাঁদের পরবর্তীকালের কারো মধ্যে নেই।

তাঁদের শতাব্দী ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দি। *(কুঃ ২৫৫০, বুঃ ৩৬৫০)* আম্বিয়াগণের পর তাঁরাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য মানুষ। তাঁদের এক মুদ্দ্ (প্রায় ৬২৫ গ্রাম) পরিমাণ অথবা তার অর্ধভাগ দান তাঁদের পরবর্তীকালের কারো পর্বতসম স্বর্ণদানের চেয়েও উত্তম। *(মুঃ ২৫৪০)*

পক্ষান্তরে, যদি তাঁদের মধ্যে কারো দ্বারা কোন পাপ ঘটেই গেছে, তবে তিনি তা থেকে তওবা করেছেন, কিংবা এমন নেক আমল করেছেন যার কারণে তা মার্জিত হয়ে গেছে।

অথবা তাঁর ইসলামে অগ্রগামিতার জন্য তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছে। নতুবা প্রিয় নবী ﷺ এর শাফাআতের ফলে আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দেবেন। (কারণ, সাহচর্যের ফলে তাঁর শাফাআতের অধিকারী তাঁরাই বেশী। কিংবা কোন রোগ-বালা-মসীবত তাঁর গোনাহের কাফ্‌ফারা হয়েছে।

অতএব সাধারণ গোনাহের ক্ষেত্রে যদি তাঁদের এই অবস্থা হয়, তাহলে যে বিষয়ে তাঁরা ইজতিহাদী ভুল করেছেন; যাতে সঠিক হলে দুটি, ভুল হলে একটি নেকী পাওয়া যায় এবং ভুল ক্ষমার্হ হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। আবার তাঁদের মধ্যে যারা কিছু গোনাহ্ করে ফেলেছেন তাঁদের সংখ্যা নেহাতই কম। তাঁরা এমন এক কওমের মাঝে ঢাকা পড়েন যাঁদের অতিশয় মর্যাদা ও প্রশংসনীয় বহু সৎকার্য রয়েছে। আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি প্রগাঢ় ঈমান ও ভক্তি তাঁর রাস্তায় জিহাদ, হিজরত, ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা, ফলপ্রসূ ইল্‌ম এবং আরো অনেক নেক আমল যাঁদেরকে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে।

মুসলিম সাহাবায়ে কেরাম প্রসঙ্গে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। তাঁদের আপোষের মাঝে যে বিবাদ-বিগ্রহ হয়েছিল তাতে একদলকে নিষ্পাপ ও অপর দলকে পাপী মনে করে না। কাউকে মা'সুম ও কাউকে কাফের মনে করে না। বরং যুদ্ধে উভয় দলের নিহতদের জন্য দুআ করে। সকলের জন্য সাহাবী হলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং তাবেয়ী হলে 'রাহেমাহুল্লাহ' বলে। উভয় দলকেই মুমিন মনে করে। কারণ, শরীয়ত শিক্ষা দেয় যে, লড়াই-ঝগড়ার ফলে মুমিন থেকে ঈমান খারিজ হয়ে যায় না *(কুঃ ৪৯/৯)* এবং শির্ক ও কুফ্‌র ছাড়া কোন পাপের জন্য (তা হালাল মনে না করলে) কাউকে কাফের বলা যায় না।

ইসলামী স্বর্ণযুগে যে ফিতনার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কিছু মুনাফিক ও ইয়াহুদীর সম্পূর্ণ হাত ছিল। ফলে যে মহাশক্তি শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়ত ভায়ে ভায়ে গৃহযুদ্ধে সেই শক্তির অপচয় হল। হযরত উসমান ﷺ-এর খুনের বদলাকে কেন্দ্র করে ইয়াহুদী চক্রান্তে হযরত আলী ﷺ ও হযরত আয়েশার (রাঃ) লড়াই হল।

হযরত মুআবিয়া ﷺ যখন আলীর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তখন তিনি খেলাফতের দাবী করেননি, খেলাফতের বায়াতও নেননি। যুদ্ধের সময়ও ভাবেননি যে, তিনিই খলীফা, কিংবা তিনিই খেলাফতের উপযুক্ত। আর না-ই তিনি ও তাঁর সমর্থনকারী দল হযরত আলীর ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বৈধ মনে করতেন। বরং হযরত আলী ﷺ যখন দেখলেন যে, মুআবিয়া ﷺ-ও তাঁর সমর্থনকারীদের জন্য তাঁর হাতে বায়াত করা এবং বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করা ওয়াজেব। কারণ, সমাজের জন্য একই সময়ে দুটি খলীফা (অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার সাথে) হতে পারে না। কিন্তু তাঁরা (হযরত মুআবিয়া ﷺ এর দল) তাঁর আনুগত্যের বাইরে। তখন তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত ভাবলেন, যাতে তাঁরা তাঁদের ওয়াজেব আদায় করেন এবং আনুগত্য ও ঐক্য লাভ হয়।

কিন্তু হযরত মুআবিয়া ﷺ-এর দল ভাবল, তাদের উপর হযরত আলী ﷺ-এর বায়াত ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজেব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত ওসমান ﷺ-এর খুনীদের কাছ থেকে তাঁর খুনের বদলা না নেওয়া হয়েছে; যে খুনীরা হযরত আলী ﷺ-এর সেনাদলে শামিল ছিল।

হযরত আলী ﷺ তো খুনের বদলা নিতেই চাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি সুযোগ ও অনুকূল সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। নতুন খেলাফতে আসার পর কার্যভার পূর্ণভাবে সামলে নিয়ে পরিস্থিতি শান্ত হলে অপরাধীকে উচিত শাস্তি দেবার কথা ভাবছিলেন, যাতে ঐ

প্রতিক্রিয়াতে অভিনব কোন বিদ্রোহ শুরু না হয়ে যায়।

অন্যদিকে মুআবিয়া ﷺ-এর দল ভাবল হযরত আলী ﷺ ইচ্ছা করেই খুনের বদলা নিতে চান না। (এবং এতে তাঁর স্বার্থ আছে অথবা ঐ হত্যাকান্ডের সহিত তিনি জড়িত ও সম্মত ছিলেন।) এই ভুল বুঝাবুঝির ফলে মুসলিম জাহানে বড় দুর্দিন শুরু হয়েছিল। কিন্তু যথার্থ ন্যায় ও হক ছিল হযরত আলী ﷺ-এর সাথে। মুআবিয়া ﷺ-ও তাঁর দল মাহদী, রাশেদ ও দূরদর্শী খলীফাকে বুঝতে ভুল করলেন।

ঐ দ্বন্দ্বের জের হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) ও ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার উপর বর্তাল। হযরত হাসান ﷺ মুসলিমদের খুন রক্ষার্থে এবং তাদের মাঝে ঐক্য ও সমশক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে খেলাফতের দাবী বর্জন করলেন। এই উৎসর্গে মুসলিম জাহানে এক প্রকার শান্তি এল। কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত হুসাইন ﷺ অধিকার মতে খেলাফতের দাবী করলেন এবং কুফাবাসীর চক্রান্তে পড়ে কারবালায় শহীদ হলেন।

ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা এই যে, সে মুসলমানদের একজন সাধারণ বাদশাহ ছিল। যার পাপও ছিল, পুণ্যও ছিল। যার জন্ম ছিল হযরত উসমান ﷺ এর খেলাফতকালে। অতএব সে কোন সাহাবী ছিল না। আল্লাহর কোন অলীও না। তবে সে কাফেরও ছিল না। কিন্তু তার কারণে কারবালা প্রান্তরে আহলে বায়তের উপর যুলুম হল। হযরত হুসাইন ﷺ শহীদ হলেন। তারই কারণে মদীনা নববীয়ার হার্রাতে বৃহৎ হত্যাকান্ড হল। তাই তাকে ফাসেক বলা যায় (যদি হত্যাদিকে হালাল না ভাবে)।

মুসলিম ইয়াযিদকে না শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে, আর না-ই গালি-মন্দ ও অভিসম্পাত করে। কারণ, নির্দিষ্ট কোন ফাসেককে লানত বা অভিশাপ করা বৈধ নয়। *(বুঃ ৬৭৮)*

আবার কোন নির্দিষ্ট ফাসেকের জন্য এও ধারণা ভুল যে, সে জাহান্নামী। কারণ, জাহান্নামী কে তা নির্দিষ্টভাবে আল্লাহই জানেন। তাছাড়া ফিস্ক করার পর সে তওবা করতে পারে, কিংবা এমন নেক আমল করে যাতে তার ফিস্কের গোনাহ মার্জিত হয়ে যায়। অথবা কোন মসীবত তার গোনাহের কাফ্ফারা (পাপের প্রায়শ্চিত) হতে পারে। কিংবা কোন শাফাআতের কারণে ক্ষমার্হ হতে পারে।

আর মুসলিম তাকে শ্রদ্ধা এই জন্য করে না যে, তার এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভালো কাজ বা নেক আমল নেই, যার কারণে সে শ্রদ্ধার্হ হতে পারে। বরং আহলে বায়ত ও আহলে হার্রার উপর যুলুম, অত্যাচার ও হত্যাকান্ডের কারণ হওয়ার ফলে মুসলিমের হৃদয়ে তার জন্য বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

সাহাবায়ে কেরাম ﷺ ছিলেন আম্বিয়ার পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যাঁদের উপর আল্লাহ জাল্লা শানুহ সন্তুষ্ট এবং যাঁরা আল্লাহতে সন্তুষ্ট। *(কুঃ ৯/১০০)* তাঁরা ছিলেন অতি আদর্শবান মানুষ এবং সৃষ্টি-সেরা মানুষের অতি বিশ্বস্ত সহচর। না তাঁরা কোন বিষয়ে মিথ্যা বলতেন, আর না-ই কোন সাহাবীর কথাকে মিথ্যা ধারণা করতেন। যার জন্য তাঁদের সকল রেওয়ায়াত (হাদীস বর্ণনা) গ্রহণীয়। বর্ণনাকারী এক হোক কিংবা একাধিক, স্ত্রী হোক অথবা পুরুষ, আকীদায় হোক অথবা আহকামে, সকল বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে তাঁদের বর্ণনা কবুল করা হয়। (অবশ্য সাক্ষ্যপ্রদান ও গ্রহণের ব্যাপার স্বতন্ত্র।) যাঁদের আমানতদারী, সততা এবং স্মৃতি ও ধীশক্তি প্রখরতায় আমরা পূর্ণ অবিকৃত শরীয়ত পেয়েছি।

মুসলিম বিশ্বাস রাখে যে, সাহাবাবর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক। অতঃপর উমার ফারুক, অতঃপর হযরত উসমান যুন নূরাইন। অতঃপর হযরত আলী মুরতাযা রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। *(বুঃ ৩৬৫৫, মুঃ ২৩৮৪)*

যাঁরা ক্রমান্বয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অব্যবহিত পরে, তাঁর চার হেদায়াত ও সুপথপ্রাপ্ত খলীফা (স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ছিলেন।) যাঁদের সুন্নাহ ও আদর্শের অনুসরণ করতে মুসলিম আদিষ্ট হয়েছে। *(মুঃআঃ ৪/১২৬, আঃদাঃ ৪৬০৭, তিঃ ২৬৭৬, সঃ জাঃ ২৫৪৯)* তাঁদের পর মর্যাদায় রয়েছেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বাকী ছয়জন সাহাবা। অতঃপর অবশিষ্ট অন্যান্য সাহাবাগণ।

মুসলিম মহানবী ﷺ-এর বংশধর আহলে বায়তকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে এবং সুগভীর ভক্তি রাখে তাঁর পাকিজা স্ত্রীগণের প্রতি; যাঁরা মুমিনদের মাতা। তাঁদের সকলের জন্য মুসলিম বলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম।' আর সকল সাহাবাবৃন্দকেই আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু কারো শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অতিরঞ্জন করে না। কাউকে 'মুশকিল কুশা' বা বালা দূর করার অসীলাও মনে করে না।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি ঈমানের অংশ এবং দ্বীনের অঙ্গ। তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তি প্রকাশ, ঘৃণা ও বিদ্বেষপোষণ অথবা কোন প্রকারের কটুক্তি করা কুফরী, মুনাফেকী এবং মহাপাপ। তাই মুসলিম তাদেরকেও ভালোবাসে যারা সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে, যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করে। *(আঃ তাঃ)*

আল্লাহর আওলিয়া

প্রত্যেক মুমিন-মুত্তাকী বান্দা আল্লাহর অলী। *(কুঃ ২/২৫৭, ১০/১১)* যে সবার চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভালোবাসে এবং যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আর বন্ধুর বন্ধুত্ব তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন বন্ধু বন্ধুর ইচ্ছা ও মনমত চলে। তাই অলী তাই ভালোবাসেন, যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাই মন্দ বাসেন যা আল্লাহ মন্দ বাসেন।

যার ঈমান ও তাকওয়া যত বেশী হবে তিনি তত বড় আল্লাহর অলী হবেন। তাই আম্বিয়াগণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আওলিয়া এবং শ্রেষ্ঠতম অলী ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। অতঃপর শ্রেষ্ঠ আওলিয়া ছিলেন তাঁর সাহাবাগণ এবং সাহাবাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আওলিয়া ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক ؓ।

সুতরাং আম্বিয়া আওলিয়া হতে শ্রেষ্ঠ। বরং একজন মাত্র নবী সকল আওলিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ। *(শঃ তাঃ ৫৫৫)* অলীর ইবাদত ও রিয়াযত যতই হোক না কেন, কোন মতেই তিনি কোন নবীর দর্জায় (পজিশনে) পৌঁছতে পারেন না।

আম্বিয়া শরীয়তী জ্ঞান আল্লাহর নিকট হতে অর্জন করেন। আওলিয়া জ্ঞানার্জন করেন এবং আল্লাহর মা'রেফাত পান আম্বিয়ার নবুয়ত থেকে। নবীর প্রদর্শিত পথ শরীয়ত ছাড়া অলীর জন্য আল্লাহর মা'রেফাত লাভের কোন পথ নেই। জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকারের ইল্‌ম নবুঅতে বা শরীয়তে মজুদ। শরীয়তের পথ ছাড়া বেলায়তের দাবী মিথ্যা।

হযরত ঈসা ؑ পৃথিবীতে পুনর্বার এসে শরীয়তে মুহাম্মাদিয়ার অনুকরণ করবেন। তিনি ছাড়া যদি অন্য কোন নবীরও আগমন ঘটত, তবে এই শরীয়তের অনুকরণ ব্যতীত তাঁর জন্য আল্লাহর প্রেম ও সামীপ্য লাভের কোন রাস্তা থাকত না। *(কুঃ ৩/৮১, মুঃ ১৫৫, দাঃ ১/১১৫-১১৬, মিঃ ১৭৪)*

অতএব এই শরীয়তের ইত্তেবা ব্যতিরেকে কারো পক্ষে অলী হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর আওলিয়া তো তাঁরা, যাঁরা তাঁর শরীয়তের অনুগামী। ফারায়েয ও সুনান যাঁরা

আদায় করে থাকেন। জুমআহ ও জামাআতে যাঁরা হাজির হন। হারাম ও না জায়েয পরিত্যাগ করেন।

এ ছাড়া যারা নিজেদেরকে শরীয়তের ঊর্ধ্বে ভাবে। যাদের নিকট শরীয়তের হারাম-হালাল একাকার। জুমআহ ও জামাআত ত্যাগ করে, মাদকদ্রব্য সেবন করে, সিজদা গ্রহণ করে, নিজেদের নামে নযর ও নিয়ায গ্রহণ করে, গায়র মাহারেম স্ত্রী-কন্যাদের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে এবং তাদের কাছে দৈহিক খিদমত নেয়, কবরে মেলা বসাবার ও কবর পূজার তাকীদ দেয়, গান বাজনায় তন্ময় হয় অথচ কুরআন শোনা অপছন্দ করে, শরীয়ত ত্যাগ করে মারেফতের নাম নিয়ে এবং শরীয়তকে জাহেরী ভেবে বাতেনী ইল্‌ম ও আমলের দাবী করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, শরীয়তের বর্ণিত ইবাদত পদ্ধতি-ছাড়া মনগড়া পদ্ধতিতে ইবাদত ও রিয়াযত করে -তারা আল্লাহর নয়, বরং শয়তানের আওলিয়া এবং তারা আওলিয়া নয়; বরং আউলিয়া (সহজপন্থী সাধক আউল সম্প্রদায়ের লোক) বা বাউলিয়া। (কারণ, এই ধরনের চরিত্র ও অভ্যাস ইসলামে অবৈধ ও শির্ক।) যদিও বা তারা বহু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে, বাতাসে ওড়ে, পানির উপর চলে, শাপে কাউকে পঙ্গু করে, লোক চক্ষে অদৃশ্য হয়, গায়েবের খবর বলে, চোরের সন্ধান দেয়, কেউ তাদের নামে মানত ও নযর মানলে তার আশা পূর্ণ হয় ইত্যাদি।

কেননা, এই ধরনের অলৌকিকতা বহু মুশরিক ও কাফেররাও দেখিয়ে থাকে, এবং অনেকের মতে মাটি-পাথরের কাছেও আশা পূর্ণ হয়। যা সাধারণতঃ শয়তান দ্বারাই বেশি সম্ভব হয়। শয়তান বা জিন বশীভূত করে বিভিন্ন তামাশা দেখায় তারা। *(কুঃ ২৬।২২১)* আবার কতক অঘটন যাদু দ্বারা ঘটানো হয়। তেলেস্মাতি প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের সাদা মন লুটা হয়। কখনো বা যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক কোন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে নিজেদের কেরামতি প্রকাশ করে থাকে অজ্ঞ মানুষদের কাছে। এবং অধিক সময়ে 'ঝড়ে কাক মরে, আর ফকীর সাহেবের কেরামতি বাড়ে' অন্ধ ভক্তদের নিকট।

অতএব মুসলিম তাদের নিকট মোটেই ধোকা খায় না। কারণ 'চকচক করলেই সোনা হয় না।' তার কাছে কুরআন ও সুন্নাহর মূল্যবান কষ্টিপাথর আছে। তা দিয়ে সব কিছুকে সে পরখ করে নেয়। যাতে সে আওলিয়াউর রহমান ও আওলিয়াউশ শয়তানকে সহজে চিনতে পারে।

আল্লাহর অলী যা কিছু বলেন তা বিশ্বাস করা ও মান্য করা ওয়াজেব নয়। শরীয়তের নিক্তিতে মেপে বিশ্বাসযোগ্য ও মান্য হলে তা গ্রহণীয় হবে, নচেৎ তা কোন ভুল বলে মনে করা হবে। কারণ, আওলিয়া মা'সুম নন। কিন্তু আম্বিয়া যা কিছু বলেন, তা বিশ্বাস ও মান্য করা ওয়াজেব। কারণ, তাঁরা মা'সুম এবং যা কিছু বলেন আল্লাহর তরফ থেকে বলেন।

আল্লাহর ওলী গুপ্ত থাকতে চান,নিজেকে লোকসমাজে প্রকাশ করতে চান না। সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি চান না, লোক তাঁর নিকট ভিড় জমাক তাও চান না।

আল্লাহর আওলিয়া দুই প্রকারেরঃ-

আল-মুক্কতাসিদূন (মধ্যগামী) এবং আস-সাবিকূনাল আওয়ালূন (অগ্রগামী ও অগ্রণী)। আল-মুকতাসেদূন, যাঁরা আল্লাহর ফারায়েয আদায় করে এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা বর্জন করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে থাকেন। নফল ও মুস্তাহাব আমল করতে তাঁরা ততটা সক্ষম হন না। কিন্তু আস-সাবেকূনাল আওয়ালূন, যাঁরা ফারায়েযের সাথে

সাথে বহু পরিমাণে নফল ইবাদত ও আমল দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে থাকেন। তাঁরা ওয়াজেব ও মুস্তাহাব দুই পালন করেন এবং হারাম ও মকরূহ সবই পরিহার করেন। যথাসম্ভব আল্লাহর সকল প্রকার প্রিয় আমল ও ইবাদত দ্বারা তাঁর অধিক তুষ্টি ও সামীপ্য অর্জন করে থাকেন। ফলে আল্লাহ তাঁদেরকে এত ভালোবাসেন যে, তিনি তাঁদের শ্রবণ করার কর্ণ, দর্শন করার চক্ষু, ধারণ করার হস্ত এবং বিচরণ করার চরণ হয়ে যান। অর্থাৎ তাঁর সাহায্য ও সন্তুষ্টি মত তাঁরা শুনেন, দেখেন, ধারণ করেন ও চলেন। আর তাঁরা তাঁর নিকট যা চান, তাই পেয়ে থাকেন। *(বুঃ ৬৫০২)*

আল্লাহর অলীর বাহ্যিক এমন কোন নির্দিষ্ট রূপ ও বেশ নেই; যার দ্বারা তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব তাঁকে তাঁর আলখাল্লা লেবাস, লম্বা বা ছোট চুল ইত্যাদিতে চেনা যায় না। কারণ, বেলায়ত অন্তরের গুপ্তধন। তবে তাঁর আমলে অবশ্যই প্রকাশ পায়। তাঁর হৃদয় থাকে পরিশুদ্ধ এবং তাকওয়া ও ইহসানে পরিপূর্ণ। ([52])

উম্মতের সকল শ্রেণীর মানুষ, জ্ঞানী-গুণী, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী, ধনী-গরীব, কারীগর-চাষী, আরবী-আজমী, ইত্যাদির মাঝে অলীউল্লাহর আবির্ভাব হয়। তার জন্য কষ্টিপাথর শুধু তাকওয়া। *(কুঃ ৪৯/ ১৩)*

অলী হওয়ার জন্য শর্ত নয় যে, তিনি নিষ্পাপ হবেন এবং কোন প্রকারের ভুল-ত্রুটি তাঁর দ্বারা ঘটবে না। বরং তাঁর নিকট পূর্ণ শরীয়তের জ্ঞান নাও থাকতে পারে। ইজতেহাদী ভুলে কোন বৈধকে অবৈধ ও তার বিপরীত মনে করতে পারেন। কোন শয়তানী অতিপ্রাকৃত চক্রান্তকে নিজের কারামত মনে করতে পারেন। তবুও তিনি অলী। কারণ, আল্লাহপাক বান্দার ভুল করা ও ভুলে যাওয়াকে উপেক্ষা করেন। *(কুঃ ২/ ১৮৬, ৩৩/৫)*

অনুরূপভাবে কারামত প্রদর্শনও অলী হবার জন্য কোন শর্ত নয়। আল্লাহর রাজত্বে তাঁর আওলিয়াদের কোন হাত বা এখতিয়ার নেই। তাঁরা স্বেচ্ছায় যা চান তা হয় না; বরং শুধু তাই হয় যা তিনি একা চান। কারো কোন সাহায্য করতে, মসীবত দূর করতে, কোন রোগ নিরাময় করতে, সন্তান দান করতে তাঁদের কোন এখতিয়ার নেই। *(কুঃ ৩৫/ ১৩, ৪৬/৫-৬)* আর তাঁরা গায়েবও জানেন না।

তাই মুসলিম তাঁদের যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করে, তাঁদের উপদেশ মত আমল করে, কিন্তু তাঁদের কাছে এমন কিছু চায় না; যা একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন। তাঁদের (জীবনে অথবা মরণের পর) কাউকে 'মুশকিল কুশা' (বিপত্তারণ) (যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দিতে পারে না, তার) 'দাতা' বা কিয়ামতে তরে যাওয়ার অসীলাও মনে করে না। কারণ, এসব ধারণা শির্ক। *(ফঃলঃ ১/ ১০০)*

হযরত খিযির ﷺ-কে মরুভূমি বা পানির (সমুদ্রের পীর বা) অধিষ্ঠাতা ও অধিকর্তা মনে করে না। কেউ পথ ভুলে গেলে তিনি পথ দেখান তাও ভাবে না। তিনিও অন্যান্য মানুষের মত ইন্তেকাল করেছেন। *(কুঃ ২১৩৪, বুঃ ১১৬, মুঃ ২৫৩৮)* তাঁর হাতে বা অন্য কোনও নবী বা অলীর হাতে কোন প্রকারের এখতিয়ার নেই। বিপদে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া বা তাঁদের নিকট কোন সাহায্য ভিক্ষা করা শির্ক। *(ফঃ ১/ ১০১)*

---

(৫২) *ইহসান বলে এমনভাবে ইবাদত (সৎকর্ম ও উপাসনা) করাকে, যাতে আবেদ মনে করে, সে যেন আল্লাহকে দেখছে অথবা আল্লাহ তাকে দেখছেন।*

আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা আম্বিয়াগণকে যেমন বিভিন্ন মু'জেযা দিয়ে তাঁদের সত্যতা প্রমাণ করেন, তেমনি তাঁর আওলিয়াগণকেও প্রয়োজন যত কারামত দিয়ে দ্বীনের তাবলীগে সাহায্য করে থাকেন। যে কারামত শুধু নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ইত্তেবার বরকতেই আওলিয়াগণ লাভ করে থাকেন।

খাবার পাত্রের তসবীহ পাঠ, *(বুঃ ৩৫৭৯)* অন্ধকার রাত্রে লাঠি জ্যোতির্ময় হওয়া। *(মুঃ আঃ ৩/১৩৮)* বাঘের সাহায্য করা, অন্ধত্ব দূর হওয়া, শত্রুর চক্ষে অদৃশ্য হওয়া ইত্যাদি বহুপ্রকার অনৈসর্গিক কারামত বহু আওলিয়াদের হাতে প্রদর্শিত হয়েছে।

কিছু খাস আওলিয়ার নিকট আল্লাহর তরফ থেকে কাশ্‌ফ ও ইলহাম হয়ে থাকে। যার দ্বারা তাঁরা মঙ্গলামঙ্গল অনুমান করতে পারেন। *(মুঃ২৩৯৮)*

কাশ্‌ফ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে ঃ-

১। কাশ্‌ফে ঈমানী; যাতে আল্লাহতাআলা তাঁর অলীর অন্তঃকরণে ঈমানী নূর বিচ্ছুরিত করেন। যার দ্বারা অলীর নিকট বহু সমস্যার সমাধান এবং বহু বিষয়ের আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। যাঁর যত ঈমানী শক্তি বেশী হবে, তাঁর তত নূর ও কাশ্‌ফ বেশী হবে। (তা বলে নিজ ইচ্ছামত কোন গায়েবের খবর বলতে পারেন না। তাছাড়া এই কাশ্‌ফ হবে শরীয়ত মুতাবিক। আর এই কাশফের কোন বিষয়কে শরীয়ত মনে করা যাবে না।)

২। কাশ্‌ফে রিয়াযী, রিয়াযত (বিভিন্ন সাধনা ও অনুশীলন) দ্বারা যেমন, উপবাস, রাত্রি জাগরণ, নির্জনতাবলম্বন ইত্যাদিতে যা লাভ হয়ে থাকে। এরূপ কাশ্‌ফ মুমিন কাফের সকলের হতে পারে। তাই এটা অলী হবার দলীল নয়। উপরন্তু এই ধরনের কাশ্‌ফ কোন কল্যাণমূলক রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম নয়। যা শুধু চিন্তা ও কল্পনা-প্রসূত।

৩। কাশ্‌ফে খালকী (সৃষ্টি বা প্রকৃতিগণ কাশ্‌ফ) যা সাধারণতঃ ডাক্তার ও গবেষকদের নিকট হয়ে থাকে। শরীরের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয়, কোন বস্তুর গুণ-ধর্ম ইত্যাদি আবিষ্কার। কোন অলীর সাথে এ ধরনের কাশ্‌ফের কোন সম্পর্ক নেই। *(শঃ তাঃ ৫৬৩)*

মুসলিম কোন কাশ্‌ফের ধোকায় পড়ে না। কারণ, কাশ্‌ফ বা ইলহাম কোন অহী নয়। কাশ্‌ফে লব্ধ কারো জ্ঞান ঈমানী হতে পারে, আবার শয়তানী অথবা মনমানি কুমন্ত্রণাও হতে পারে। তাই তার উচিত, কিতাব ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে তা নিকষিত করে নেওয়া।

এমন অনেক আল্লাহর আওলিয়া থাকেন যাদের দ্বারা কোন কারামত বা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু তবুও তাঁরা আওলিয়া। কারণ আওলিয়ার কারামতে নিজস্ব কোন এখতিয়ার ও অধিকার নেই। আল্লাহ চাইলে তাঁদের হাতে তা প্রদর্শন করে থাকেন। অবশ্য আওলিয়া কোন বিপদে পড়লে রক্ষার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে অলৌকিক ভাবে সাহায্য ও পথ পেয়ে থাকেন। কল্পনাতীতভাবে রুজী লাভ করে থাকেন। *(কুঃ ৬৫/২-৩)* এমন জ্ঞানলাভ করে থাকেন, যার দ্বারা হক ও বাতিলকে পৃথকীকৃত করতে পারেন। *(কুঃ ৮/২৯)* আখেরাতে এবং পার্থিব জীবনেও বহু সু-সংবাদ পেয়ে থাকেন। *(কুঃ ১০/৬২-৬৪)*
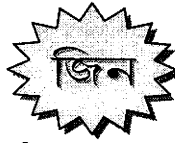
জিন মানুষের মতই একটি জাতি। যাদেরকে মানুষের পূর্বে অগ্নি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। *(কুঃ ১৫/২৭)* এ জাতির আদি পিতা হল ইবলীস। দৈত্য, দানব, শয়তান, অসুর, রাক্ষস, দেও-পরী, ভুত-প্রেত-প্রেতিনী, প্রেতাত্মা, পিশাচ -এসব কিছু জিনেরই বিভিন্ন ভাষায় অথবা বিভিন্ন গুণের উপর এক একটা নাম।

মুসলিম যেমন অদৃশ্য ফিরিশ্তা জগৎকে বিশ্বাস করে, তেমনি জিন জগৎকেও বিশ্বাস করে। যেহেতু কুরআন ও সুন্নায় তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। *(কুঃ ৭২)*

বহু বিশ্বস্ত মানুষের কাছে শোনা যায় যে, তাঁরা জিন দেখেছেন। যেমন, কিছু জন্তু-জানোয়ারও জিন দেখে থাকে। *(আঃ দাঃ ৫১০২, মু আঃ ৩/৩০৬)*

বহু জিনিস আছে যা আমরা দেখতে পাই না, অথচ কোন জন্তু তা দেখতে পায় যেমন, মৌমাছি বেগুণীর উপরে আলোকরশ্মি দেখতে পায় এবং এই জন্য তারা মেঘলা দিনেও সূর্য দেখতে পায়। যেমন, পেঁচা রাতের অন্ধকারেও শিকার দেখতে পায়। *(আঃ জিঃ ১২)*

জিন খায় ও পান করে। তারা আল্লাহর নাম নিয়ে প্রাণীর অস্থিতে হাত দিলে তা মাংসে পরিণত হয়। আর গোবর তাদের পশুদের খাদ্য। *(মুঃ ৪৫০)*

জিনদের স্ত্রী-পুরুষ আছে তারা বিবাহ-শাদী করে এবং সন্তানের জন্ম দেয়। *(কুঃ ৫৫/৫৬)* কিন্তু জিনের সাথে ইনসানের বিবাহ হয় কি না তা শোনা গেলেও সঠিক বলা যায় না। অনেকের মতে তা সত্য ঘটে থাকে। *(ফঃইঃতাঃ ১৯/৩৯)* এবং তাদের মিলন হয় ও সন্তানও জন্মায়। যেমন, জান্নাতের হুরীর সঙ্গে জিন ও ইনসান উভয়েরই মিলন সম্ভব। *(কুঃ ৫৫/৫৬)*

তারা মৃত্যুবরণ করে। *(কুঃ ৭৩৮৩, মুঃ ২৭১৭)* তবে তাদের মধ্যে শয়তানই দীর্ঘজীবি। *(কুঃ ৭/১৪-১৫)*

যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে সেই পৃথিবীতেই জিনও বাস করে। তবে তারা বেশীর ভাগ পোড়ো বা ধ্বংসাবশেষ ঘর-বাড়ি, খালি ময়দান, পর্বতগুহা ইত্যাদিতে বাস করে। কিন্তু শয়তান প্রকৃতির জিনরা প্রস্রাব-পায়খানার জায়গায়, বিভিন্ন নোংরা স্থানে এবং কবরস্থানে বাস করে।

শয়তান জিন মানুষের বাসগৃহেও বাসা বাঁধে। তবে আল্লাহর নাম, যিক্র, কুরআন তেলাঅত, বিশেষ করে সূরা বাক্বারাহ ও আয়াতুল কুরসী শুনে পলায়ন করে থাকে। সন্ধার সময় শয়তান জিনরা বেশীর ভাগ ছড়িয়ে পড়ে। যার জন্য বিশেষ করে ছোট শিশুদেরকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। *(বুঃ ৩২৮০, সঃ জাঃ ৭৭৬)* আবার 'বিসমিল্লাহ' বলে বাড়ির দরজা বন্ধ করলে কোন দিকেই শয়তান ভিতরে আসতে পারে না। *(সঃজাঃ ৭৭৬)*

শয়তান জিনদেরকে রমযান মাসে বন্দী করে রাখা হয়। *(বুঃ ৩২৭৭, মুঃ ১০৮০)* যেমন, আযান ধ্বনি তারা শুনতে পারে না, আযান শুনে দৌড়ে পলায়ন করে থাকে। *(বুঃ ৬০৮)*

শয়তানদের আসল চেহারা ভয়ঙ্কর কুৎসিত ও বীভৎস হয়। যার জন্য জাহান্নামের যাক্কুম গাছের ফলকে তাদের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। *(কুঃ ৩৭/৬৪-৬৫)* শয়তানের দুটি শিং আছে। *(বুঃ ৩২৭৩, মুঃ ৫১,৮-২৮)* বাম হাত দ্বারা খায় ও পান করে। *(মুঃ ২০২০)*

আল্লাহ তাআলা জিন জাতিকে মানুষের চেয়ে অধিক আজব আজব শক্তি দান করেছেন। যেমন, তারা চোখের পলকে বিজলির মত যেখানে-সেখানে উড়ে যেতে-আসতে পারে। এক ইফরীত হযরত সুলাইমান নবী ﷺ-এর আদেশে বিলকিস রাণীর সিংহাসন ইয়ামান থেকে ফিলিস্তিনে তাঁর এক বৈঠকের আগে উপস্থিত করার কথা প্রকাশ করেছিল। *(কুঃ ২৭/৩৯)*

শয়তান জিনরা আকাশের খবর ফিরিশ্তাদের নিকট হতে চুরি করে গণকদের কাছে পৌঁছায়। *(কুঃ ৪৭০, মুঃ ২২২৯)*

জিন ইচ্ছামত রূপ বা আকৃতি ধারণ করতে পারে। এক বৃদ্ধের রূপে মক্কার কাফেরদের নিকট এসে রসূল ﷺ-কে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিল। *(সীঃ ইঃ হিঃ ২/৯৩-৯৫)* সুরাকা বিন মালেকের রূপে বদর যুদ্ধে কোরাইশের স্বপক্ষে শরীক হয়েছিল। *(দুঃ মঃ ৪/৭৭)* চোরের রূপ ধরে যাকাতের মাল চুরি করতে এসে আবু হুরাইরার হাতে তিনবার ধরা পড়েছিল। আর শেষে আয়াতুল কুরসী পড়লে শয়তান আসে না এবং আল্লাহর তরফ থেকে হিফাযত হয়- তা শিখিয়েছিল। *(বুঃ ২৩১১)* অবশ্য সে মহানবী ﷺ-এর রূপ ধারণ করতে পারে না। *(বুঃ ১১০, মুঃ ২২৬৬)*

জিন বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারেরও রূপ ধারণ করে থাকে। অধিকাংশ কালো কুকুর, কালো বিড়াল এবং সাপের আকৃতি ধারণ করে থাকে। কোন কোন মুসলিম জিন সাপের রূপে মানুষের বাসগৃহে বসবাস করে থাকে। এই জন্য পৃষ্ঠে দুই রেখাবিশিষ্ট লেজ মুড়া সাপ ব্যতীত অন্য কোন সাপকে ঘরের ভিতর শীঘ্র মারা উচিত নয়। বারংবার যদি সেই সাপকে ঘরে দেখা যায়, তাহলে তাকে এই বলতে হয়, 'আল্লাহর কসম! ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, নচেৎ মেরে ফেলব।' যদি এরূপ তিন দিন (বা তিন বার) বলার পরও দেখা যায় তবে তাকে মেরে ফেলতে হয়। *(মুঃ ২২৩৩,২২৩৬/সঃ জাঃ ২২৩৭)*

বিষধর সাপ যেহেতু মানুষের ও অন্যান্য জীবের শত্রু, তাই ঘরের বাইরে যে কোন জায়গায় দেখলে তাকে মেরে ফেলতে হয়।

প্রত্যেক মানুষের সহিত যেমন ফিরিশ্তা থাকেন, তেমনি জিনও থাকে। যাকে 'কারীন' বলা হয়। *(কুঃ ৪১/২৫,৪৩/৩৬, মুঃ ২৮১৪, মুঃ আঃ ১/৩৮৫)* অবশ্য মুমিনের নিকট ঈমানী শক্তি থাকার ফলে এই 'কারীন' তাঁর কিছু ক্ষতি করতে সক্ষম হয় না।

আমাদের মতই জিনদেরও সমাজ আছে। ভালো-মন্দ, মুসলিম-কাফের আছে। *(কুঃ ৭২/১১)* মানুষেরই মত তারাও দ্বীন-ধর্ম করে, কেউ অধর্ম (শয়তানী) করে। আল্লাহ জিন-ইনসান উভয়কেই তাঁরই ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ৫১/৫৬)* মানুষের মত তারাও জান্নাত অথবা জাহান্নামবাসী হবে। *(কুঃ ৭/১৭৯, ৫৫,৪৬-৪৭)* জিন আগুনের সৃষ্টি হয়েও জাহান্নামের আগুনে জ্বলে কষ্ট পাবে; যেমন মানুষ মাটির সৃষ্টি হয়েও মাটির আঘাতে কষ্ট পায়।

তাদের নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, আমাদের শরীয়ত তাদের শরীয়ত। *(কুঃ ৪৬/২৯-৩২, ৭২/১২)* তারাও আপোষে দ্বীন প্রচার করে থাকে। কখনো কখনো ছদ্মবেশে বা অদৃশ্যে মানুষ উলামাদের নিকটও ইল্ম্ শিক্ষা করে।

আমাদের মত তাদেরও বিভিন্ন শিল্পকলা ও কারিগরি আছে। *(কুঃ ৩৪/১৩)* আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহ হযরত সুলাইমান ﷺ-এর জন্য জিন ও বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে তাদেরকে ব্যবহার করতেন। তিনি দুআ করেছিলেন যে, তাঁকে এমন রাজত্ব দেওয়া হোক, যেন তাঁর পরে আর কারো জন্য

তেমন রাজত্ব না হয়। *(কুঃ ৩৮/৩৫)* অতএব সেইরূপ বশীকরণ আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তবে জিন ইচ্ছামত কোন মানুষের অনুগত হতে পারে।

সুতরাং যদি কেউ তার অনুগত জিনকে আল্লাহর ইবাদত শিক্ষা দেয় এবং তাকে জিন ও ইনসানের মাঝে দ্বীনের তবলীগে ব্যবহার করে তবে তা শ্রেষ্ঠ অলীর কাজ। আবার কেউ যদি তাকে কোন বৈধ সাংসারিক কাজে ব্যবহার করে এবং এই আনুগত্যের বিনিময়ে জিন যদি ইনসানের কাছে কোন হারাম মূল্য (যেমন, তার জন্য সেজদা, কুরবানী বা পশুবলিদান ইত্যাদি) না চায় -তবে তা জায়েয। কিন্তু যদি কেউ জিনকে অবৈধ কাজে যেমন, শির্ক, হত্যা, চুরি ইত্যাদিতে, নিজেকে অলী বা বুযুর্গ জাহির করার উদ্দেশ্যে তার সাহায্যে কেরামতি প্রদর্শন, শত্রুতা করে কিংবা পয়সা কামাবার লোভে কাউকে অসুখে ফেলা, কোন নারী হাত করা ইত্যাদিতে ব্যবহার করে তবে তা সুনিশ্চিতভাবে হারাম। *(ফঃ ইঃ তাঃ ১১/১০৭, ফঃ উঃ ২/২২৯)*

জিন বা শয়তান কোন গায়েবের (অদৃশ্যের) খবর জানে না। *(কুঃ ৩৪/১৪)* অতএব কোন জিনের নিকট ভাগ্য এবং ভবিষৎ যা জিনের নিকট অদৃশ্য ও অজ্ঞাত সে সম্পর্কে (সে গায়েব জানে মনে করে) প্রশ্ন করা এবং তার খবরে বিশ্বাস করা জেহালতি, শির্ক ও কুফ্র। অবশ্য পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করা (এবং উত্তরে বিশ্বাস না রাখা)তে অথবা জিনের দেখা, শোনা বা জানা হতে পারে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করাতে কোন দোষ বা গোনাহ নেই।

জিন আকর্ষণ

আয়েম্মায়ে আহলে সুন্নাহ এ বিষয়ে একমত যে, জিন মানুষের দেহে-মনে প্রবিষ্ট হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যাঁরা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে।" *(কুঃ ২/২৭৫)* আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "শয়তান মানুষের রক্তশিরায় পরিভ্রমণ করে।" *(বুঃ ৩২৮৯, মুঃ ২৯৭৪)*

আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, আমি পিতাকে (ইমাম আহমাদকে) বললাম, 'বহু লোক বলে থাকে যে, জিন মানুষের দেহে প্রবেশ করে না?' তিনি বললেন, 'বেটা ওরা মিথ্যা বলছে। (জিন প্রবিষ্ট হয় এবং) মানুষের জিবে কথা বলে।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, 'তিনি (ইমাম আহমদ) যা বলেছেন তাই প্রসিদ্ধ। কারণ, মানুষ জিন আকৃষ্ট হয়ে কখনো এমন ভাষা বলে যার অর্থ বুঝা যায় না। তার দেহে এত বেশী আঘাত করা হয় যে, যদি বা সে আঘাত কোন উঁটের উপর করা যায়, তো উঁট কষ্ট পায়। অথচ আকৃষ্ট ব্যক্তি সে আঘাতের কিছুও অনুভব করে না।' *(ফঃ ইঃ তাঃ ২৪/২৭৬)*

আবার অনেক সময় এমন ক্ষমতা প্রদর্শন করে যে, ক্ষমতা সেই আকৃষ্ট মানুষের নয়। কখনো বা কুরআন পড়ে, যে আরবী অক্ষর পর্যন্ত চিনে না।

তিনি আরো বলেন, 'আয়েম্মায়ে মুসলেমীনদের কেউই মানুষের দেহে জিন প্রবেশকে অস্বীকার করে না। যে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে এবং দাবী করে যে, শরীয়ত তা মিথ্যা মনে করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেই শরীয়তের উপর মিথ্যা বলে। আর শরীয়তে এমন কোন দলীল নেই, যা জিন আকৃষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করে বা দেহে জিন প্রবেশকে

অসম্ভব মনে করে।' *(ফত্‌ঃ ইঃ তাঃ ২৪/২৭৭)* আর তিনি *(১৯/ ১২তে)* আরো উল্লেখ করেন যে, 'একথা মু'তাযেলার এক সম্প্রদায় অস্বীকার করে থাকে।' তদনুরূপ বিজ্ঞান ও বাস্তববাদীরাও এসব কিছুকে অলীক ধারণা মনে করে।

নবী করীম ﷺ হতে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে; যাতে বুঝা যায় যে, জিন মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। যারে' নামক জনৈক সাহাবী তাঁর এক উন্মাদ ছেলে অথবা ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে রসূল ﷺ-এর নিকট এলেন এবং তার জন্য তাঁকে দুআ করার আবেদন জানালেন। তিনি ছেলেটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন এবং বললেন, 'ওর পিঠের দিকটা আমার নিকট কর।' তারপর তিনি ছেলেটির কাপড়ে ধরে পিঠে আঘাত করতে করতে বললেন, 'বের হ' আল্লাহর দুশমন, বের হ' আল্লাহর দুশমন'। সাথে সাথে ছেলেটি সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তিনি পানি দ্বারা তার মুখ মুছে দিলেন এবং তার জন্য দুআ করলেন। *(ইঃ মাঃ ৩৫৪৮, মাঃ যা ৯/২)*

অনুরূপভাবে অপর এক ঘটনায় তিনি এক শিশুর মুখে থুথু দিয়ে জিন বিতাড়িত করেছেন। *(মুঃ আঃ ৪/১৭০-১৭১)*

জিন আকর্ষণ সাধারণতঃ তিন কারণে হয়ে থাকে ঃ

১। জিন মানুষকে তার কোন গুণ বা সৌন্দর্য দেখে ভালোবেসে ফেলে। যেমন, মানুষে-মানুষে হয়ে থাকে। ফলে অভিভূত, বিমোহিত, মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে সর্বদা (বা কোন কোন সময়ে) মানুষের কাছে থেকে মনোসুখ ও সঙ্গতৃপ্তি লাভ করে থাকে। কখনো বা ব্যভিচারও করতে চায়। মানুষ সম্মত না হলে তাকে বিভিন্ন ভয় ও কষ্ট দিয়ে থাকে। আবার খবীস না হলে বন্ধুত্বের বেশে তার বহু উপকারও করে থাকে। সে ক্ষেত্রে মানুষের কোন কষ্ট হয় না। এ পর্যায়ে সাধারণতঃ পুরুষের প্রতি নারী জিন এবং নারীর (যুবতীর) প্রতি পুরুষ জিন আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

২। মানুষ অজান্তে জিনকে কখনো (তার উপর প্রস্রাব করে, পানি ফেলে অথবা প্রাণীর বেশে থাকা কালে তার উপর আঘাত করে) কষ্ট দিয়ে থাকে। ফলে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় তার দেহে এসে তাকে কষ্ট দেয়। প্রাণী (সাপ-বিছা ইত্যাদি) রূপ জিনকে মানুষ হত্যা করতে চাইলে জিনও মানুষকে মারার চেষ্টা করে। বা মেরেও ফেলে। *(মুঃ ২২৩৬)*

৩। অকারণে খামাকা মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। তাকে পূজা বা সিজদা করতে আদেশ দেয়। যেমন দুষ্ট ছেলেরা কোন অপরিচিত মুসাফিরের সহিত অনুচিত ব্যবহার করে থাকে। (পূজা বা সিজদা করতে বললে তার কথা মানা রোগীর কোনক্রমেই উচিত নয়।) *(দঃ রুঃ ১৪-১৫)*

আবার যারা জিনের পূজা করে (সাধারাতঃ যেখানেই গায়রুল্লাহর পূজা হয় যেমন, মূর্তি, পাথর, গাছ, কবর ইত্যাদি সেখানেই শয়তান জিন-আঁটন বা আড্ডা গাড়ে এবং পূজা নেয়) *(মুঃ আঃ ৫/১৩৫)* তাদেরকে মানে, তা'যীম করে ও তাদের নিকট ভয়ে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে, জিন তাদেরকে আরো অধিক ভয় প্রদর্শন করে। যাতে তার শক্তি ও তার প্রতি ভক্তিতে অধিক গর্বানুভব এবং পূজা বৃদ্ধি হয়। *(কুঃ ৭২/৬)* এ জন্যেই ভয়ার্তরা অধিক ভয় পেয়ে থাকে। আবার অনেক সময় স্নায়ুবিক দৌর্বল্যের কারণে মানুষ সামান্য কিছু দেখলেই ভয় পায়।

কেউ জিন আকৃষ্ট হলে, জিন বিতাড়িত করার জন্য সবচেয়ে বড় ঔষধ আয়াতুল কুরসী। *(বুঃ ২৩১১)* তারপর ইস্তেআযাহ (জিন-শয়তান হতে রেহাই পাওয়ার জন্য

বিভিন্ন আশ্রয় প্রার্থনা-মূলক দুআ) প্রয়োজন হলে ধমক ও প্রহারও ব্যবহার করা যায়। তবে তা ইনসাফ মত। প্রহারের ব্যথা রোগী অনুভব করে না। প্রকৃতপক্ষেই জিনের উপরে হয়। *(ফঃইঃ তাঃ ১৯/৬০)* অবশ্য রোগী পরে বেদনা অনুভব করে।

চিকিৎসার জন্য কুরআনী আয়াত পাঠ করে পানিতে দম করে অথবা পবিত্র পাত্রে লিখে তা ধৌত করে পান করানো যায়। *(ফঃ ইঃ তাঃ ১৯/৬৪)*

অন্যথায় জিনের কথা বা শর্ত মত কোন পশু তার নামে বলিদান করে বা তাকে সিজদা করে সন্তুষ্ট করে দূর করা পাক্কা শির্ক। অবশ্য বিভিন্ন সহীহ সুন্নতী দুআ ইত্যাদি দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা যায়। যে ঝাড়-ফুঁকের শর্তাবলী পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

কুরআনী আয়াত লিখে তাবীয বানিয়ে ব্যবহার করা সম্পর্কে ওলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, তাও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আবজাদী নক্সা বানিয়ে, ফিরিশ্তা বা শয়তানের নাম দিয়ে অথবা তেলেস্মাতি কবজ তৈরী করে ব্যবহার শির্ক তা সর্বদা মনে রাখা দরকার। চিকিৎসককে (এবং রোগীকেও) এসব বিষয়ে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে কোন শির্ক না করে বসে।

আবার সম্ভবতঃ জিন ওঝার চেয়ে বেশী জবরও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঈমানী শক্তি ও অধিক দুআ দরূদকে কার্যকরী করতে হবে। খবীস জিন অধিক মিথ্যা বুলি এবং ঝুটা ভয় দেখিয়ে থাকে, তাতে কারো ভয় করা উচিত নয়।

তেমনি ওঝার উচিত সর্বাগ্রে রোগ নির্ণয় করা। সম্ভবতঃ রোগীর উন্মাদনা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি (ব্রেন ডিফেক্ট) অথবা মূর্ছা (হিস্টিরিয়া) জাতীয় কোন রোগও হতে পারে। অতএব জিন মনে করে শুধু শুধু মারধর করে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দেওয়া উচিত নয়। আবার অনেক সময় রোগীর উপর কারো যাদুর প্রতিক্রিয়া, কিংবা তার কোন মানসিক রোগ অথবা কোন অভীষ্ট লাভের আশায় সুপরিকল্পিত অভিনয় (ছলা-কলা)ও হতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ওঝা তা সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।

জিনের এক উচ্ছৃঙ্খল সম্প্রদায়ে নাম শয়তান। এদের সর্দার ইবলীস। ইবলীস প্রথমে আল্লাহর নিকটতম বান্দাদের মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু হযরত আদম ﷺ-কে আল্লাহর আদেশে সিজদা না করার ফলে মালউন শয়তান হল। শুরু হল আদম ﷺ ও তাঁর সন্তানদের প্রতি তার শত্রুতা। এই শত্রুতার জন্য শয়তান আল্লাহর নিকট শক্তি ভিক্ষা করল। আল্লাহ তাকে সেই শক্তি দান করলেন। মানুষের রক্তশিরায় ও ধমনীতে প্রবেশ করে তাকে প্রলোভন ও কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রষ্ট ও সুপথ-হারা করাই হল তার প্রধান কাজ। কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থেকে সে এই কাজ করতে থাকবে। কিন্তু তার এত বড় শক্তি সত্ত্বেও আল্লাহর নেক বান্দার কাছে সে বড় কমজোর ও নাচার। *(কুঃ ৪/৭৬, ১৭/৬৫)* মুমিনের কাছে সে কোনদিন বিজয়ী হতে পারে না।

শয়তান তার পরিণতি জাহান্নাম তা জানে। তাই মানুষের পশ্চাতে তার দুশমনির প্রধান উদ্দেশ্য হল, যার কারণে সে জাহান্নামে যাবে তাকে তারই কারণে যতটা সম্ভব জাহান্নামের সঙ্গী করে নেওয়া। *(কুঃ ৭/১১-১৮)*

মানুষের পশ্চাতে সদা ফেরে শয়তান। মুসলিম ও নেক মানুষের কাছে তার বেশী

আগমন। কারণ, কাফের তো কাফেরই। মৃতকে মেরে ফল কি? (তবে তাদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।) তাই ঈমানে জীবিত মানুষকে মারার বিভিন্ন চক্রফাঁদে প্রথমতঃ তাকে কুফ্র ও শির্কে ফেলার চেষ্টা করে। কমজোর ঈমানের মানুষ রোগ, মসীবতে বা বন্ধ্যত্বে পড়লে শয়তান বৃহৎ সুযোগ গ্রহণ করে। আল্লাহর দরজা ছাড়িয়ে তাদেরকে অন্যের দরজায় (দরগায়) চাওয়া করায়। কোন হিতাকাংখীর বেশে এসে তাকে বলে, 'অমুক দরগায় যা, তোর সব আশা পূর্ণ হবে। তোর ছেলে মারা গেছে, এত টাকা নোকসান হয়েছে, আল্লাহ তোর প্রতি যুলুম করেছে---' ইত্যাদি।

যদি কাফের ও মুশরিক নাও বানাতে পারে, তবে সে মানুষকে কোন মহাপাপে ফেলার চেষ্টা করে। তাদের প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতাকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে আপোষে হিংসা, দ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ভায়ে-ভায়ে ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য ও ঝগড়া বাধিয়ে এক অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে। *(কুঃ ২/১৬৯, ৫/৯১, মুঃ ২৮১৩)*

যখন কোন পাপেও ফেলতে পারে না, তখন সে মানুষকে তাদের মনে বিভিন্ন ভয়, কুমন্ত্রণা ও প্রলোভন দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে বাধা দেয়।

কেউ মুসলিম হতে চাইলে বলে, 'বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবি? লোকে কি বলবে?' হিজরত করতে চাইলে বলে, 'মাতৃভূমি ত্যাগ করবি, বিদেশে সুখ পাবি?' জিহাদ করতে চাইলে বলে, 'খুন হয়ে যাবি, তোর সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্রের কি হবে?' নামাযী ফজরের নামায পড়তে চায় তো শয়তান বলে, 'এখনো বহু রাত বাকী। ঠান্ডায় ওযু করে নামায পড়া বড় কঠিন, ঘুমা।' কেউ মাদ্রাসায় পড়তে চাইলে বলে, 'ফকীরী বিদ্যা, ওতে পয়সা নেই, পেট চলবে কি করে? মেগে খেতে হবে' ইত্যাদি!

হজ্জ করতে চাইলে বলে, 'হজ্জ করবি? এত হাজার খরচ হয়ে যাবে, পয়সাটা অন্য কাজে লাগবে।' যাকাত দিতে গেলে বলে, 'যাকাত কিসের ? ওতে ধন কমে যাবে। ও জরিমানা কেন দিবি? ও তো তোর নিজের কামাই।' রোযা রাখতে চাইলে বলে, 'বড় কঠিন! স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবে। কাজ হবে না, চাষ হবে না' ইত্যাদি। স্ত্রী কন্যাকে বোরকা পরালে বা দাড়ি রাখলে বলে, 'ছিঃ! দেখতে ভুত লাগে, লোকে ঠাট্টা করবে। এ যুগে আর ওসব চলে না।' শরীয়তী পর্দা করলে শয়তান আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সুযোগ গ্রহণ করে বলে, 'ছিঃ! ওদের বাড়ী যাবি কেন? মেয়েরা লুকোলুকি করে।' ইত্যাদি। *(সঃ জাঃ ১৬৪৮)*

অবশ্য 'নাফ্সে আম্মারাহ'ও মানুষকে এরকম বলতে পারে। তাই তো রমযানে শয়তান বন্দী থাকলেও এই নাফ্স শয়তানের কাজ করে। ফলে বহু পাপ বন্ধ হয় না।

শয়তান যখন মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়া সত্ত্বেও ইবাদতে বাধা দিতে পারে না, তখন তার (মুমিনের) ইবাদতকেই সমূলে নষ্ট করার চেষ্টা করে। যাতে ইবাদতে সে কোন নেকী বা ফল না পায়। অতএব তার নামাযে এসে সাংসারিক যত কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহর দরবার থেকে তার মন ফিরিয়ে নেয়। যার ফলে নামাযে বিভিন্ন ভুল হয়। নামায সহ অন্যান্য সকল ইবাদতে 'রিয়া' ভরার চেষ্টা করে এবং আরো বিভিন্ন পথে তার ইবাদত বিনষ্ট করার চেষ্টা করে। অনেকের কাছে তার সে চেষ্টা সফল হয়। কিন্তু পাক্কা মুসলিমের কাছে শয়তানের কোন কু-বুদ্ধিই সফল হয় না।

প্রত্যেক সেই কাজ যাতে আল্লাহর নাফরমানী হয় তাতে শয়তানের (অথবা মনের) তাবেদারী হয়। প্রত্যেক পূজা, উপাসনা, নযর-নিয়ায, বলিদান যা গায়রুল্লাহর নামে হয় তা বস্তুতঃ শয়তানের নামেই। কারণ, শয়তানই এসবের আদেশ-নির্দেশ ও পরামর্শ

দিয়ে থাকে। এই জন্য যারা ফিরিশ্তার পূজা করে, প্রকৃত পক্ষে তারা শয়তানেরই পূজা করে। *(কুঃ ৪/১১৭, ১১৮,৩৪/৪০-৪১)*

মোট কথা, শয়তান প্রত্যেক ভালো ও ন্যায় কার্যে বাধা ও ভীতি এবং মন্দ ও অন্যায় কার্যে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে থাকে। *(কুঃ ২/২৬৮, ৭/১৬-১৭)*

কিন্তু শয়তান তাতেই ক্ষান্ত নয়। বরং মানুষকে মানসিক ও শারীরিক কষ্টও দিয়ে থাকে। *(কুঃ ৫৮/১০)* কাউকে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়ে, *(সঃ জাঃ ৩৫২৬)* কারো ঘর বা কোন কিছু জ্বালিয়ে, *(আঃদাঃ ৫২৩৬)* জন্মের সময় স্পর্শ করে, (যখন শিশু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে) *(বুঃ ৩৪৩১)* মৃত্যুর সময় স্পর্শ যন্ত্রণা দিয়ে, *(সঃ জাঃ ১২৯৩)* বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ ও রোগ এনে, *(কুঃ ৩৮/৪১ সঃজাঃ ৩৫৭৯,৪১০৭)* মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হয়ে, *(ফঃ ইঃ তাঃ ২৪/২৭৬)* কষ্ট দিয়ে থাকে।

শয়তানের শয়তানী কাজে তার বহু ফৌজও আছে। সমুদ্রের উপর সিংহাসন রেখে তার ফৌজ মানুষের নিকট পাঠিয়ে থাকে। তার নিকট সবচেয়ে উত্তম সে, যে অধিক বড় ফাসাদ ও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ আনতে পারে। *(মুঃ ২৮১৩)* তার মানুষ বন্ধুও আছে অনেক। বন্ধুবেশে মানুষকে পাপে ফাঁসিয়ে দূর থেকে হাসে। ধ্বংসের পথে বাড়িয়ে দিয়ে পশ্চাৎপদে পলায়ন করে। *(কুঃ ৮/৪৮)*

অনুরূপভাবে কিয়ামতেও যখন তার অনুসারী বিপথগামী শাস্তিযোগ্য মানুষ তাকে দোষারোপ করবে, তখন সে সব কিছু অস্বীকার করবে এবং কোন প্রকারের অপরাধ ঘাড়ে নেবে না। *(কুঃ ১৪/২২)*

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার যুদ্ধের জন্য শয়তান তার দোস্ত-বন্ধুদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে। *(কুঃ ৬/১২১)* মুসলিদেরকে বিষন্ন করে। *(কুঃ ৫৮/১০)* তাদেরকে তার বন্ধু-বান্ধবদের ভয় দেখায়। *(কুঃ ৩/১৭৫)* নারী-স্বাধীনতা, প্রগতিবাদ ইত্যাদির নাম নিয়ে শয়তান তার বান্ধব-বান্ধবীদেরকে সাজিয়ে মুসলিমদেরকে কি টানা-পোড়েনেই না ফেলে! মৌলবাদী, প্রাচীনপন্থী, কট্টরপন্থী, সন্ত্রাসী ইত্যাদির নাম নিয়ে এবং ইসলামে বিভিন্ন সংশয়, সন্দেহ ও বিতর্ক সৃষ্টি করে অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

সংসারের নিয়মই এই। সৎ কম, অসৎ বেশী। পৃথিবীতে প্রত্যেক যুগে (ভাবী হযরত ঈসা ﷺ-এর যুগ ব্যতীত) কিয়ামত পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কতক লোক ছাড়া সবাই তো শয়তানেরই চেলা-চামুন্ডা। *(কুঃ ৩৪/২০)*

শয়তানের ভ্রষ্ট করার পদ্ধতি অসংখ্য। যার জন্য পথভ্রষ্ট মানুষের সংখ্যা অধিক। তার কিছু পদ্ধতি, যথা ঃ-

১। হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক করে প্রদর্শন। *(কুঃ ১৬/৬৩)* যাতে ফেঁসে অগণিত মানুষ নামায-রোযা ত্যাগ করে কবর ও দর্গা পূজায় মন বসায়। সুন্নাতকে বিদআত ও বিদআতকে সুন্নাত মনে করে। প্রাচ্যের (ইসলামের) পবিত্র সামাজিক জীবনযাত্রা ও শিষ্টাচারকে পরাধীনতা এবং প্রতীচ্যের নগ্নতা, দ্বীনহীনতা ও দুর্গতিকে স্বাধীনতা ও প্রগতি বলে। যেখানে পুরুষরা তাদের নারীদের পবিত্রতা ও সতীত্বের জীবন অতিবাহিত করতে তাদেরকে লালায়িত কুকুরের হাত হতে হিফাযতে রাখে, সেখানে নারীকে ভোগ্যপণ্য বলে। আর যেখানে পুরুষরা মাঠে, ঘাটে, পথে, বিদ্যালয়ে, অফিসে ইত্যাদিতে নারীর রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবন নিয়ে খেলা খেলে সেখানে তাদেরকে ধন্য-ধন্য বলে। সত্য ও ন্যায়কে অসত্য ও অন্যায় করে দেখিয়ে শয়তান বড় সাফল্য অর্জন

করেছে এবং মানুষ এই ফাঁসে ফেঁসে সর্বাধিক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। *(কুঃ ৪/৫১, ৬/১৩৭, ১৮/১০৩, ২৭/২৪, ২৯৩৮)*

২। হারাম বা অবৈধ, অশ্লীল ও অসভ্য জিনিসের মনোলোভা, শ্লীল ও সভ্য নামকরণঃ যেমন জান্নাতে হযরত আদম ও হাওয়ার (আঃ) নিকট নিষিদ্ধ বৃক্ষের নাম দিয়েছিল অবিনশ্বর বৃক্ষ (যার ফল ভক্ষণ করে অবিনাশী জীবন লাভ হয়।) *(কুঃ ২০/১২০)* আর আজও ধর্মহীনতার নাম ধর্ম-নিরপেক্ষতা, নগ্নতার নাম নাম ফ্যাশান ও সভ্যতা। সূদের নাম লভ্যাংশ ও ইনটারেষ্ট, মদ্যের নাম সুরা ও শারাব, ঘুষের নাম বখশিস, ব্যভিচারের বা অবৈধ সম্পর্কের নাম ভালোবাসা, গান-বাদ্যের নাম রূহের খোরাক, বেশ্যা ও কসবীর নাম যৌনকর্মী ইত্যাদি দিয়ে মানুষকে ধোকায় ফেলে তার আখেরাত বরবাদ করে।

৩। অতিরঞ্জন ও অভক্তি, অবজ্ঞা এবং অবহেলা সৃষ্টি করা। যে মানুষের মনে ধর্ম চেতনা বেশী দেখে তার মনে অতিরঞ্জনের কুমন্ত্রণা দেয়, ফলে মানুষ আব্দকে মা'বুদের আসনে বসিয়ে মা'বুদ ছেড়ে আব্দের নিকট সব কিছু চেয়ে থাকে এবং প্রায় প্রত্যেক ইবাদতে কিছু না কিছু অতিরিক্ত (বিদআত) করে থাকে।

পক্ষান্তরে যার মনে ধর্ম-চেতনা কম তার মনে আরো অধিক অবজ্ঞা ও অবহেলা এনে তাকে প্রায় বে-আমল করে ফেলে। আর দুজনকেই সিরাতে মুসতাকীম হতে সুদূরে অপসারিত করে।

৪। মানুষকে অলসতা ও নিরুদ্যমে ফেলা, যাতে মানুষ ইবাদতে ঢিল দিতে দিতে একদিন বিলকুল ত্যাগ করে বসে। *(বুঃ ১১৪২, মুঃ ৭৭৬)* ([53])

৫। বিভিন্ন অসৎকার্যে মানুষকে সফলতার অঙ্গীকার ও আশা প্রদান। *(কুঃ ৪/১২০)* অসৎ ব্যবসায় অধিক লাভের আশাদান। নাহক লড়ায়ে বিজয়ের আশাদান। *(কুঃ ৮/৪৮)* ইত্যাদি।

৬। হিতাকাঙ্খীর রূপে মানুষকে সর্বনাশে ফেলা। *(কুঃ ৭/২১)*

৭। মানুষের মঙ্গলজনক ও হিতকর স্মরণীয় বস্তুকে বিস্মৃত করা। *(কুঃ ২০/১১৫, ১৮/৬৩)* ধর্মীয় অনুশাসন ও কর্তব্যকে বিস্মৃত করা। *(কুঃ ৬/৬৮)* বান্দার মন থেকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেওয়া। *(কুঃ ১২/৪২,৫৮/১৯)*

৮। তার চেলা-চামুন্ডাদেরকে মুসলিমদের সামনে বড় (উন্নত ও শক্তিশালী) করে দেখিয়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা। *(কুঃ ৩/১৭৫)*

৯। মুমিনের মনে বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা। যেমন, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ সবকে সৃষ্টি করেছে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?! ইত্যাদি। *(বুঃ ৩২৭৬, মুঃ ১৩৪, মুঃ আঃ ১/২৩৫)*

মানুষকে বিপথগ্রামী করার বিভিন্ন ফাঁদ, জাল বা হাতিয়ার রয়েছে শয়তানের। যথাঃ মদ্য, জুয়া, মানুষের মনগড়া মা'বুদ, ফালকাঠি বা ফালনামা। *(কুঃ ৫/৯০-৯১)* যাদু *(কুঃ ২/১০২)* মানুষের প্রবৃত্তি ও রিপু; কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য, নারী, পার্থিব প্রেম, অশ্লীল ছবি, গান-বাজনা, গাফেল মন প্রভৃতি।

বস্তুতঃ এইসব ফাঁদ দ্বারা মানুষের ঈমান-ধর্ম শিকারে ইবলীস বড় সফলতা অর্জন করেছে। মানুষের সম্বন্ধে ইবলীসের প্রত্যাশা সফল হয়েছে। ওদের মধ্যে একটি মুমিন

([৫৩]) *মানুষ যখন নিদ্রাবেশে অথবা আলস্যে হাই তোলে তখন শয়তান হাসে। তাই হাই দমিত করা অথবা সে সময় মুখে হাত রাখা উচিত। (বুঃ ৩২৮৯)*

দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করেছে। অথচ ওদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই। *(কুঃ ৩৪/২০-২১)*

শয়তান মানুষের (মুসলিমের) চিরশত্রু। সেই শত্রুর সাথে মৃত্যু পর্যন্ত তার জিহাদ ([54]) চলে। যে জিহাদের অস্ত্র ঈমানের সজাগ দিল, কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ, ইস্তিআযাহ (আল্লাহর নিকট শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা), আল্লাহর যিক্র,পূর্ণ ইসলামী সমাজে বাস, শয়তানের বিভিন্ন ধোকাদান পদ্ধতি ও মাধ্যমাদি সম্পর্কে জ্ঞান, তার বিরোধিতাকরণ ইত্যাদি। ([55])

এসব অস্ত্র মুসলিম যখন ব্যবহার করে, তখন শয়তান কাবু হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। নেক ও মুমিন বান্দার কাছে সে কোনদিন জয়লাভ করতেই পারেনা। *(কুঃ ১৫/৪২, ১৬/৯৯)*

শয়তান যদি না হত, তাহলে মানুষ সরল পথে চলতে পারত এবং পাপ হতে বাঁচতে পারত, কিন্তু আল্লাহপাক তাকে কেন সৃষ্টি করলেন?

নিষ্পাপ সৃষ্টি ফিরিশ্তামন্ডলী। অগণিত ফিরিশ্তা কোন প্রকারের পাপ না করে সদা তাঁর ইবাদতে মগ্ন। কিন্তু তিনি এমন এক সৃষ্টি চাইলেন যারা ইবাদত করে আবার পাপও করে এবং সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। কারো দরগায় না গিয়ে শুধু তাঁরই দরগাহে ভুলের মাথা অবনত করে ক্ষমা প্রার্থনার হস্তোত্তলন করে। কিন্তু শয়তান সৃষ্টি না করলে মানুষ হয়তো পাপ করতো না। আর মানুষ নিষ্পাপ হয়ে ইবাদত করলে তাহলে তো ফিরিশ্তাই যথেষ্ট ছিল। আবার তাঁর আদেশ পালন করা যেমন ইবাদত, তেমনি তাঁর নিষেধ মানাও ইবাদত, পাপ না করাও ইবাদত। পাপের মহান নেতা (লিডার ও ডিলার) ইবলীসের সাথে লড়াই করাও ইবাদত।

তদনুরূপ ভালো-মন্দ বাছাই করার জন্যও শয়তান সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। যেহেতু অন্ধকার সৃষ্টি না করলে আলোর কদর হত না। শয়তান সৃষ্টি না করলে নেকী বা পুণ্যের কদর হত না। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এক ভীষণ পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান, অসংখ্য বন্ধন ও বাধা সত্ত্বেও সমস্তকে উল্লঙ্ঘন করে কে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে কেবল তাঁরই ইবাদত করছে। শয়তানের বাধা ও তার চক্রবন্ধন না হলে সে পরীক্ষা (বিনা প্রশ্নে) অসমাপ্ত থেকে যায়। *(কুঃ ৭/১৬৮, ২১/৩৫)*

([54]) জিহাদ সত্য ও ন্যায়ের প্রতিবন্ধক দূরীকরণার্থে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বলে। এর বিশেষ অর্থ, কুফরী ও শির্কের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর এক দ্বীন প্রতিষ্ঠা, স্বদেশ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা। সাধারণ অর্থে, আত্মা ও প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনার বিরুদ্ধে, বিভিন্ন নোংরামী, অশ্লীলতা ও পাপের বিরুদ্ধে এবং শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াই লড়াকে জিহাদ বলা হয়। যে জিহাদ হয় যুগোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র, ইল্ম, লেখনী ও বাকতরবারী ইত্যাদির সাহায্যে। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন শক্তি দ্বারা লড়া যেরূপ জিহাদ, তদনুরূপ কুপ্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণাকে পরাভূত করে আল্লাহর ইবাদত করাও এক জিহাদ। বাতিল মতবাদ এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর আরোপিত অপবাদ খন্ডন করাও জিহাদ। কিন্তু এর জন্য ইল্মের ধারাল অস্ত্রের প্রয়োজন। তাই ইলম্ শিক্ষা করাও এক জিহাদ। কাল-পাত্র ভেদে জিহাদ ফরয অথবা ফরযে কিফায়াহ (যথেষ্ট পরিণামে কিছু লোক তা করলে অন্যের উপর ফরয নয়)। কিন্তু শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ সকলের উপর ফরয।

([55]) তবে শয়তানকে গালাগালি বা অভিসম্পাত করা মোটেই উচিত নয়। কারণ, তাতে সে স্ফীত ও গর্বিত হয়। (আঃ দাঃ ৪৯৮২, মুঃ আঃ ৫/৫৯)

মানুষ নিদ্রিতাবস্থায় আত্মাচক্ষুতে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে থাকে, যা সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয় ঃ-

১। সত্য স্বপ্ন ঃ যা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে দেখানো হয়। ফিরিশ্তা মানুষরূপে তার আত্মার সহিত কথা বলে অথবা উদাহরণ স্বরূপ কোন ঘটনা তাকে দেখানো হয়, অথবা আল্লাহর তরফ হতেই তার মনে সত্য কল্পনার ছবি ফুটে ওঠে এবং তা স্বপ্নে দৃষ্ট হয়। যা বাস্তবে সত্য ঘটে অথবা তার তা'বীর (তাৎপর্য) সত্য হয়। এই ধরনের স্বপ্ন নবুঅতের ৪৬তম অংশের এক অংশ। কারণ, সত্য স্বপ্ন নবুঅতের অহীর মত না হলেও তা আল্লাহরই তরফ হতে ইলহাম হয়। *(মুঃ ২২৬৩)*

২। এমন বস্তুর স্বপ্ন দেখে যার ছবি মানুষ নিজ কল্পনায় ও খেয়ালে মনের পর্দায় খুব বেশীরূপে অঙ্কিত ও চিত্রিত করে থাকে। তাই যা কামনা অথবা আশঙ্কা করে তাই দেখে থাকে স্বপ্নে। এ ধরনের স্বপ্ন অলীক, যার কোনও তাৎপর্য নেই।

৩। এক ধরনের স্বপ্ন; যা দেখে মানুষ অত্যন্ত ভয় পায়। অথবা কষ্ট ও দুঃখ পায়। এ ধরনের স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়। কারণ, শয়তান মুসলিমকে কষ্ট ও দুঃখ দিয়ে খুব তৃপ্তি পায়। *(কুঃ ৫৮/১০)* যেহেতু শয়তান মুসলিমের প্রকৃত দুশমন। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ, যে দুঃস্বপ্ন দেখে সে যেন এ কাজগুলি করে ঃ

- ❖ শয়নাবস্থায় বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে।
- ❖ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।
- ❖ যে দুঃস্বপ্ন দেখে, সেই মন্দ ও ক্ষতি থেকেও রক্ষা প্রার্থনা করে।
- ❖ পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করে।
- ❖ শয্যাত্যাগ করে নামায পড়তে শুরু করে।
- ❖ আর এই স্বপ্নের কথা যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে। *(বুঃ ৭০৪৪, মুঃ ২২৬১, ২২৬২)*

অবশ্য সুস্বপ্ন হলে আত্মীয়-বন্ধুকে বলতে পারে। *(মুঃ ২২৬১)* অন্যান্য স্বপ্ন প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে বলতে নেই। কারণ, স্বপ্নের যে তা'বীর (তাৎপর্য) করা হয় তাই প্রায় বাস্তব হয়ে যায়। অতএব প্রিয়জনকে বললে শুভ অর্থ করবে, কিন্তু যার নিকট সে অপ্রিয়, তাকে বললে তার জন্য অপ্রিয় অর্থ বের করবে। আর তাতে বিপদ সম্ভব।

পক্ষান্তরে সত্য স্বপ্ন কে দেখে, অথবা কার স্বপ্ন সত্য বলে বিশ্বাস করা যায়-যদি সে সত্য স্বপ্ন দেখে থাকে? মুত্তাকী পরহেযগার সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়। *(মুঃ ২২৬৩)*

তবে মুত্তাকী লোকও বাকী দুই প্রকারের স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখবে সে সত্যই দেখবে। কারণ, শয়তান তাঁর রূপ ধারণ করতে পারে না। *(বুঃ ১১০, মুঃ ২২৬৬)* কিন্তু তার স্বপ্নে ইয়াকীন হওয়া চাই। কেবল ধারণা বা অনুমান করে অন্য কাউকে নবী না মনে করে বসে। আবার সাধারণতঃ দৃষ্টপূর্ব বা কল্পিত জিনিস স্বপ্নে দেখা যায়, কিন্তু যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ-কে আল্লাহই তাঁর প্রিয় বান্দাকে দেখান, তাই সে সত্যই দেখে।

যদি কেউ এমন স্বপ্নাদিষ্ট হয়; যা শরীয়তে নিন্দিত বা গর্হিত, তাহলে তা সত্য বা আল্লাহর তরফ থেকে নয়। তা নিঃসন্দেহে মনের খেয়াল অথবা শয়তানের স্বপ্ন। যেমন, যদি কোন রোগী দেখে যে, কোন দরবেশ তাকে বলছে, অমুক আস্তানায় বা দর্গায় খাসী চড়া, তোর রোগ ভালো হয়ে যাবে। কিংবা সাত মসজিদ ধুয়ে পানি খা, রোগ ভালো হয়ে যাবে। কিংবা কুকুরের গোশ্ত খা, আরোগ্য হবে। অথবা কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কোন মৃত বুযুর্গ তার কবরে মাযার তৈরী করে মেলা বসাতে বলছে ইত্যাদি। কারণ, এগুলি সবই শরীয়তে হারাম ও শির্ক। *(ফঃ লঃ ৩/৬৭)*

কোন মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে কাউকে স্বপ্ন দেখাতে পারে না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে তার আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কাউকে তার বারযাখী অবস্থা স্বপ্নে জানিয়ে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, শিশু স্বপ্নে কেঁদে উঠলে '(দেবী) ষাট মা'য়ের দোহাই নেওয়া পাক্কা শির্ক। যেমন এ ধারণা রাখাও শির্ক যে, কচি শিশুকে ষাট মায়ে হাসায়-কাঁদায়।

অন্তর যেহের এমন এক অংশ যা পরিষ্কার ও শুদ্ধ থাকলে সারা দেহও কর্ম শুদ্ধ হয়। অন্যথা তা নোংরা ও অশুদ্ধ থাকলে সারা দেহ ও কর্ম অশুদ্ধ হয়। তাই অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকলে বাহ্যিক দেহেও ঈমানী প্রভাব বিকাশ লাভ করে।

মুসলিম যা কিছু আমল করে তা নির্ভর করে এই অন্তরের উপর। মন ঠিক থাকলে কাজ ভালো হয়, নতুবা মন্দ। নিয়ত বা সঙ্কল্পের স্থান এই দিল, মুখ নয়। তাই কেউ মুখে কলেমা পড়লেই মুসলিম হয় না, যতক্ষণ না তা অন্তরে স্থান দেয়। আবার ফিতনার সময় কলেমাকে অন্তরে গুপ্ত রেখে মুখে তার বিপরীত (কুফরী) বললে মুসলিম কাফের হয়ে যায় না। *(কুঃ ১৬/১০৬)*

অনুরূপভাবে ফজরের নামাযের নিয়ত অন্তরে করলে এবং মুখে যোহরের নামায বললেও নিয়ত ফজরেরই হয়। (মুখে নিয়ত বিদআত। আবার আরবীতে নিয়ত করলে এবং তার অর্থ না বুঝলে নিয়তই হয় না। যেমন, আরবীতে কলেমা পড়ে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করলে মুমিন হওয়া যায় না।)

কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে ব্যাপার ভিন্ন। কাউকে শুধু অন্তরে ভালোবাসলে অর্থাৎ মুখে বা কাজে ভালোবাসার বাস্তবতা না দেখালে সে ভালোবাসার কোন মূল্য থাকে না। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি ভালোবাসা অন্তরে গুপ্ত রাখে, অথবা শুধু মুখে প্রেমের দাবী করে, অথবা অন্তরে ও মুখে দুয়ের ভালোবাসার দাবী রাখে অথচ স্বামীর কোন কাজে, আদেশ বা খিদমতে গা না ঘেসায় তাহলে নিশ্চয় সে প্রেমের মহল ভেঙ্গে চুরচুর হবে। তদনুরূপ অন্তরে বা মুখে না হয়ে শুধু বাহ্যিক কাজে ভালোবাসার অভিনয় করলে তাও টিকবার নয়। তাই ঈমান অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কার্যে পরিণত -এই তিন সমষ্টির নাম।

মুসলিম তাই মনকে স্থির করে অন্তর পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করে। এই শুদ্ধিতে তার সবকিছু শুদ্ধ হয়। আবার অন্তরে যে বীজ থাকে তার ফসল বাহ্যিক দেহে (দাড়ি, লেবাস ও অন্যান্য আদর্শে) প্রকাশিত হয়। তাই মন ঠিক না থাকার দোহাই দিয়ে ইবাদতে গড়িমসি করে না। এরূপ খোঁড়া ওযরে তাকে ক্ষমা করা হবে না। আল্লাহ তো সকলের অন্তর্যামী। *(কুঃ ৫/৭)*

মনে মনে খেয়ালী পাপ চিন্তা করলে পাপ হয় না। তবে চিন্তা দূষণীয়। *(বুঃ ৫২৬৯)*

মনে মনে পাপের বাসনা ও সঙ্কল্প করার পর তা বাস্তবে আমল না করায় চার অবস্থা হতে পারে ঃ-

১। যে পাপ করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা আল্লাহর ভয়ে ত্যাগ করে, তার জন্য পুণ্য লিখা হয়।

২। যে পাপ করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা কোন মানুষের ভয়ে ত্যাগ করে তবে তার জন্য পাপ লিখা হয়। কারণ, কোন মানুষের জন্য আমল করা বা ত্যাগ করা রিয়া ও শির্ক।

৩। যে পাপের বাসনা ও পরিকল্পনা করার পর তা চরিতার্থ করতে চেষ্টিত হয়ে, সুযোগ বা সামর্থ্য না থাকার ফলে ত্যাগ করে, তার পাপ লিখা হয়।

৪। যে কেবল পাপের কামনা ও কল্পনা করে, করার কোন সঙ্কল্প করে না, বরং তা ঘৃণা করে ও দূরে থাকতে চায় তবে তার এমন চিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করা হবে।

যে পাপের বাসনা করে এবং আন্তরিক কর্মে পাপ চিন্তা করে ও তা অন্তস্তলে স্থান দিয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর তাওহীদে, নবুঅত, পুনরুত্থান ইত্যাদিতে সংশয় করে, তবে সে কাফের অথবা মুনাফিক হয়ে যায়। তদনুরূপ, তা ভালোবাসা যা আল্লাহ বাসেন না ও তার বিপরীত, অহংকার, গর্ব, হিংসা, অকারণে কোন মুসলিমের প্রতি কুধারণা ইত্যাদিতে কাবিরাহ গোনাহ লিখা হয়।

যে আঙ্গিক কর্মে পাপ বাসনা ও কল্পনার পর তা করার সঙ্কল্প করে। যেমন, ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান, হত্যা প্রভৃতি। তবে তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা না করলেও কেবল পরিকল্পনার জন্য পাপ লিখা হবে। যেহেতু সে অন্তরে তা স্থান দিয়ে থাকে। *(তামান্নী দ্রষ্টব্য)*

আবার যে পাপের ইচ্ছা করে করার চেষ্টা করে না, আল্লাহর ভয়ে বা মানুষের ভয়ে নয় বরং এমনিই ত্যাগ করে, তবে তার না পাপ লিখা হয়, না পুণ্য।

আবার অন্তরে কোন পুণ্য বা সৎকার্যের সঙ্কল্প করলে (কার্যটি না করতে পারলেও) নেকী লিখা হয়। কার্যটি সম্পন্ন করলে আরো দশগুণ নেকী লিখা হয়ে থাকে। *(বুঃ ৬৪৯১, মুঃ ১২৮)*

কারো চাপে নিরুপায় হয়ে অথবা মনের অজান্তে ভুলে অনিচ্ছাকৃত কোন গোনাহ করে থাকলে, তাও ধর্তব্য নয়। *(কুঃ ২/২৮৩, ৩৩/৫)* তদনরূপ নিদ্রাঘোরে বা স্বপ্নে অথবা পাগলাবস্থায় অথবা নাবালকাবস্থায় কোন পাপ করে ফেললে, তাও ধর্তব্য নয়। *(সঃজাঃ ৩৫০৬, ৩৫০৯)*

সকলে নিজ নিজ পাপের শাস্তি ভোগ করবে। কেউ কারো পাপ-বোঝা অবশ্যই বহন করবে না। *(কুঃ ৩৫/৩৮)* কেউ যদি কারো পাপের দায়িত্ব নিয়ে কোন পাপ কাজে তাকে প্রলুব্ধ করে, তবে সে তার পাপভার 'বহন করব' বললেও সে পাপ ভারের কিছুই আদৌ বহন করবে না। *(কুঃ ২৯/১২)*

বাপ-দাদাদের পাপের প্রতিফল সন্তানরা কোনদিনই ভোগ করবে না। তাই জারজ সন্তান অপবিত্র নয়। তার পিতা-মাতার পাপের জন্য তার কোন শাস্তি হবে না। কাফেরদের মৃত শিশু-সন্তান এবং যাদের নিকট ইসলামের খবর মোটেই পৌছেনি এমন লোকদেরকে কিয়ামতে পরীক্ষা করা হবে। আল্লাহর আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তারাও জান্নাত পাবে।

কিন্তু কেউ যদি বিনা ইলমে ভুল ফতোয়া দিয়ে কোন মানুষকে পাপে লিপ্ত করায় তবে এ পাপীর কোন সাজা না হয়ে ঐ মুফতীর সাজা হবে। কারণ, এ অজ্ঞ মানুষের পাপ ও ভ্রষ্টতার জন্য সেই দায়ী। *(কুঃ ২৯/১৩, ১৬/২৫)*

অনুরূপভাবে কেউ কোন কুরীতি চালু করলে সে তার নিজের এবং ঐ রীতির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আমলকারী লোকের পাপভার বহন করবে। *(বুঃ ৭৩২১)*

আল্লাহ তাআলা বান্দার কেবল বাহ্যিক রূপই দেখেন না। বরং তিনি তার অন্তঃকরণ দেখে থাকেন। বাহ্যিকভাবে আল্লাহর জন্য নামায পড়লেও অন্তরে যদি লোক প্রদর্শন কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্য হয় তবে তা ছোট শির্ক হবে। আবার ঐ নামাযে দাঁড়িয়ে কোন বুযুর্গ, ওলী বা নবীর তা'যীমী ছবি যদি মনে রেখাপাত করে, তাহলে তা বড় শির্ক হতে পারে।

এই হৃদয়-মনের মার-প্যাঁচের কারণে মানুষ মুনাফিক, কপট বা বিশ্বাসঘাতক হয়। তাই মুমিনের অন্তর বাহ্যিক রূপের সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেয় এবং তার বাহ্যিক রূপ আভ্যন্তরীণ সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেয়। যেহেতু তার ভিতর-বাহির এক সমান।

ইসলামে সবাই সমান। কোন বর্ণ বা শ্রেণী ভেদের স্থান নেই ইসলামে। কোন জাত-পাত উচ্চ-নীচতা মুসলিমের মনে স্থান পায় না। মুসলিম হলে সবাই তার ভাই। ধনী-গরীব, শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায়, ভৃত্য-মালিক, আরবী-আজমী, শেখ-সৈয়দ-মল্লিক-পাঠান, ব্যবসায়ী, চাষী, কারিগর সবাই সমান। কারো উপর কারো অধিক মর্যাদা নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কষ্টিপাথর শুধু 'তাকওয়া' পরহেযগারী, সংযমশীলতা এবং আল্লাহভীতি। আল্লাহর নিকট সেই সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ যার এই 'তাকওয়া' সব চেয়ে বেশী। *(কুঃ ৪৯, ১৩, মুঃ আঃ ৫/৪১১)*

তাই মুসলিম নিজ বংশ বা সম্পদ নিয়ে গর্ব করে না। বংশ নিয়ে গর্ব এক জাহেলিয়াতি প্রথা। *(মুঃ ৯৩৪)* তাকওয়া ও আমল না থাকলে নবীর বংশধর হলেও আল্লাহর আযাব থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আবার জারজ হলেও তাকওয়া বা আমল থাকলে সেই শ্রেষ্ঠ হবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবে। তাই শুধুমাত্র বংশ দেখে মানুষের পরিচয় অথবা বংশের কোন দু-এক ব্যক্তির ব্যবহার দেখে সারা বংশের ব্যবহারের অনুমান আদৌ সঠিক নয়। অবশ্য বংশীয় প্রভাব বা তাসীরকেও অস্বীকার করা যায় না।

আল্লাহপাক তাঁর আম্বিয়াগণের মধ্যে এককে অপরের চেয়ে অধিক ফযীলত ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। *(কুঃ ২/২৫৩, ১৭/৫৫)* বিনা পার্থক্যে সকলের উপর ঈমান আনা ফরয। *(কুঃ ২/২৮৫)* কিন্তু মর্যাদায় সকলকে সমান ভাবা যায় না। অতএব শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁদের সকলের শিরোমণি। *(বুঃ ৩৩৪০, মুঃ ২২৭৮)*

আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহুর বিচিত্র সৃষ্টিতে মানুষ ধনী ও গরীবরূপে সৃষ্টি হয়েছে। সম্পদে তিনি সকলকে সমান করেননি। *(কুঃ ১৬/৭১)* তাই অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান না নিয়ে এবং যাকাত বন্ধ করে সাম্যের গান গেয়ে সকলের সম্পদ সমান ভাবে বন্টন করার স্বপ্ন দেখা বৃথা। মহান আল্লাহ বলেন, 'ওরা কি তোমার

প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! পার্থিব জীবনে আমিই ওদের জীবিকা ওদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর ওরা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।” *(কুঃ ৪৩/৩২)*

মানুষের সৃষ্টি বিচিত্রে পুরুষকে তিনি নারীর উপর অধিক মর্যাদা ও নেতৃত্ব দান করেছেন। *(কুঃ ২/২২৮৮, ৪/৩৪)* সাম্যের গান গেয়ে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে পবিত্র ও শৃঙ্খলময় সমাজ ও সংসার গড়া অবশ্যই কঠিন। কারণ, তার প্রত্যেক সৃষ্টির পশ্চাতে হিকমত আছে। কিন্তু মানুষের চিন্তার পশ্চাতে শয়তান ও প্রবৃত্তি কাজ করে। নারী এমন প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়েছ যে, সে একা চললে তাকে বাধা ও ধাক্কা খেতে হয়। অথচ তার সহায়তা বিরাট। মা হয়ে সন্তানের, স্ত্রী হয়ে স্বামীর বিরাট সহযোগিতা করে থাকে। তাই সে নিজে রাজা না হতে পেলেও রাজমাতা হয়ে বা রাজরাণী ও রাজসঙ্গিনী হয়ে গর্ববোধ করে।

পুরুষ জাতি নারী জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী। *(কুঃ ২/২৮২, বুঃ ৩০৪, মুঃ ৭৯)* পৃথিবীতে যত বড়ই জ্ঞানী নারী থাকুক তার দ্বিগুণ জ্ঞানের পুরুষ অবশ্যই আছে। তাই নেতৃত্বের অধিকার পুরুষের। অবশ্য নারী নারীর, দাস ও এতিমের অথবা নপুংসকের নেতৃত্ব করতে পারে।

আর যেহেতু প্রত্যেক নারী কোন না কোন স্বামীর স্ত্রী হয় এবং স্ত্রীর নিকট স্বামী অধিক বড়। আর প্রকৃতিগত প্রভেদের কারণে উভয়কে সমান বলা যায় না। যেমন, সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কষ্ট স্বীকার নারীকেই করতে হয়। পুরুষ নারী-ধর্ষণ করে থাকে, কিন্তু নারীর পক্ষে পুরুষ-ধর্ষণ সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যগত দিক দিয়েও পুরুষ অধিক শক্তিশালী, স্থৈর্য ও ধৈর্যশালী হয়। তাই পুরুষ বাইরের কাজ ও নারী ঘরের কাজের দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরাধীনতা ও ভোগ্যপণ্যের নামে নয়, হিফাযত ও সাবধানতার নামে পবিত্রতা, শৃঙ্খলতা ও দাম্পত্য-সুখ যথার্থ করণার্থ নারীকে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি হতে গুপ্ত থাকতে হয়। *(কুঃ ৩৩/৫৩)* কিন্তু নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য সমাজের সাথে মিলামিশা, পুরুষদের (স্বামী বা মাহারেম ব্যতীত অন্যান্য সভাসদের) সংসর্গ, কথাবার্তা, পরামর্শ, যুদ্ধ পরিচালনা ও রাষ্ট্রোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বক্তৃতাদি জরুরী হয়। যাতে পর্দা, পবিত্রতা নারীত্ব এবং অনেক ক্ষেত্রে সতীত্বও খোয়া যায়।

পুরুষের হাতে নারীর কর্তৃত্ব থাকলেও পুরুষ অবৈধ কর্তৃত্ব এবং অত্যাচার করতে পারে না। আর নারীও পুরুষের সে কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য নয়। বরং বহু ক্ষেত্রে (যেমন, আল্লাহর না ফরমানীতে) নারীর জন্য পুরুষের আনুগত্য করা হারাম। *(সঃ জাঃ ৭৩৯৬)*

ইসলামে নারী-পুরুষের স্ব-স্ব অধিকার ও স্বাধীনতা আছে। উভয়েই নিজের ইচ্ছা ও পছন্দমত বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে। (কিন্তু নারীর জ্ঞান কম হওয়ার দরুন তার ক্ষেত্রে তার অভিভাবক একান্ত জরুরী।) তবে বিভিন্ন কারণে ও যুক্তির ভিত্তিতে ইসলাম পুরুষকে একই সময়ে চারটি স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে।

যেমন, কোন যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় অসংখ্য পুরুষ হত হলে নারীর সংখ্যা বেশী হয়। সে ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ বৈধ না হলে ব্যভিচারের বাজার গরম হয়।

অনেক পুরুষের যৌনশক্তি এত বেশী হয় যে, একটি নারীর পক্ষে তার যৌনতৃষ্ণা নিবারণ করা সম্ভব হয় না। যার ফলে সে ব্যভিচারে পা বাড়াতে বাধ্য হয় এবং ‘গার্ল ফ্রেন্ড’ (উপপত্নী) -এর সাহায্য নিতে হয়।

বহু বিধবা অতিকষ্টে কালাতিপাত করে। বিবাহে ইচ্ছা থাকলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোন অনূঢ় যুবকের রুচিসম্মত হয় না। সে ক্ষেত্রে যদি কোন বিবাহিত পুরুষ তাকে বিবাহ করে তাহলে তার যৌন ও অর্থনৈতিক সমস্যা তথা দুর্দিন কাটে। নচেৎ সে পাপ ও ভিক্ষাবৃত্তির পথে পা বাড়ায়।

বিবাহের পর স্ত্রীর এমন রোগ দেখা দিতে পারে যাতে সে যৌন সম্ভোগ হতে দূরে থাকতে চায় অথবা ঋতু দৈর্ঘ্যতার দরুন স্বামীর পক্ষে ধৈর্যধারণ অসম্ভব হয়।

অথবা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কারণে সন্তান না হয় এবং স্বামী সন্তান চায়। এমতাবস্থায় তাকে তালাক দিলে তার দুর্দিন আসে। তাই দ্বিতীয় কোন পথ না থাকায় অবৈধ যৌন সম্ভোগের প্রতি অগ্রসর না হয়ে এবং সন্তান লাভের আশায় অন্য এক স্ত্রী গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলাম ব্যভিচার, অশ্লীলতা, অপবিত্রতা, ধর্ষণ, বলাৎকার ও অবৈধ সম্পর্কস্থাপন হতে সমাজকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে চায়। তাই একাধিক (সর্বাধিক চারটি) বিবাহ বৈধ করে স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়, ইনসাফ ও সমানাধিকার দিয়ে পবিত্র জীবন অতিবাহিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে স্ত্রীদের মাঝে সমানাধিকার না দেওয়ার অথবা কোন পক্ষপাতিত্ব বা কোন প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের যদি আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে একের অধিক বিবাহ বৈধ নয়। যেমন, বিবাহের সময় প্রত্যেককে সন্তুষ্টমনে উপযুক্ত মোহরানা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। *(কুঃ ৪/৩-৪)*

ঠিক উপর্যুক্ত কারণেই ইসলাম নারীকে গুপ্ত ও পর্দানশীন করেছে। তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তার সরল মোহনীয় সতীত্ব জীবনকে সুন্দর ও নির্মল করার জন্য। *(কুঃ ৩৩/৫৩, ৫৯, ২৪/৩১, মাঃ মুঃ ১৬৩)*

বলা বাহুল্য, পর্দা প্রথা কোন অবরোধ প্রথার নাম নয়। এটা একটি চারিত্রিক সংস্কার, কোন কুসংস্কার নয়।

পক্ষান্তরে বিপরীত ক্ষেত্রে একজন নারীর জীবনে একাধিক পুরুষ শান্তি আনতেই পারে না।

নারী সাধারণতঃ দুর্বল। নিজের পায়ে দাঁড়ানো তার পক্ষে সহজ নয়। তাই ইসলামে (নারীর অর্থসঙ্কট দূর করার লক্ষ্যে কোন নিজস্ব প্রয়াস, কাজ বা চাকুরী না থাকলে) কন্যা অবস্থায় পিতার উপর, স্ত্রী অবস্থায় স্বামীর উপর এবং মা অবস্থায় ছেলের উপর নারীর ভরণপোষণ ও অন্যান্য দায়িত্বভার থাকে। যার কেউ নেই, তার অভিভাবকত্ব সরকার করে থাকে। যার জন্য নারীর মীরাস পুরুষের অর্ধেক। (অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান ভাগই পেয়ে থাকে।) তার যথার্থ মর্যাদা রক্ষার্থে সাধারণতঃ ঘরের বাইরে (পর্দাহীনতায় এবং পর-পুরুষের সংসর্গে) একা কর্মক্ষেত্রে তার যাওয়া অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু যালেম সমাজে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়ায় নারী-স্বাধীনতার নামে নগ্নতা ও বল্গাহীন জীবনের বিভিন্ন ইসলাম-বিরোধী ইবলীসী আন্দোলনের ঝড় উঠেছে।

অথচ নারীও ইসলামী গন্ডির ভিতরে থেকে (শিক্ষা তো বটেই) অর্থনৈতিক সংকট দূর করতে পারে। ইসলামে তার ব্যবস্থাও আছে। প্রয়োজনে বাইরে যেতে, চাকুরী, ব্যবসা ও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারে; যদি সে নিরাপত্তা ও পরপুরুষের দৃষ্টি হতে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে তাহলে। যাতে তার ইজ্জত, মান-সম্ভ্রম, সতীত্ব, ধর্মপরায়ণতা ও নারীত্ব বজায় থাকে।

আল-কুরআনে নারীকে শস্যক্ষেত্রের সহিত তুলনা করা হয়েছে। বিশেষ কারণ ও

সামঞ্জস্য বিদ্যমানতার জন্য তো বটেই, তা ছাড়া এতে নারীর মর্যাদাহানীর কি আছে ? খেত তো চাষীর প্রাণ হয়। খেতের হেফাযত, ঘেরা-বেড়া, সিঞ্চন। যত্ন, আগাছা ও বিভিন্ন পশু থেকে রক্ষণা-বেক্ষণ করা তার বাঞ্ছনীয় কর্তব্য। তদনুরূপ স্ত্রী স্বামীর নিকট সেই হিফাযত ও যত্নের অধিকারিণী। খেত সবুজ ফসল, ফুল-ফল দান করে, স্ত্রী দান করে নয়নমণি স্নেহের গড়া পুত্র-কন্যা।

ইয়াহুদীদের বিশ্বাস ছিল যে, স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশ হতে সঙ্গম করলে সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। যেহেতু এরূপ বিশ্বাস ও ধারণা একেবারে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও ভ্রম ছিল, তাই কুরআন নারীকে খেতের সহিত তুলনা করে তা খন্ডন করেছে। খেতের যে কোনও দিক থেকে চাষাবাদ ও বপনাদি আরম্ভ করলে যেমন ফসলের পরিমাণ ও পুষ্টির কোন ক্ষতি হয় না, তদনুরূপ স্ত্রীর যে কোন দিক থেকে (কেবল মাত্র যোনি পথে) সঙ্গম করলে সন্তানের দেহাঙ্গ গঠনে কোন ক্ষতি হয় না। *(কুঃ ২/২২৩, তঃ ইঃ কাঃ ১/২৬০)*

আল্লাহ জাল্লা শানুহ ছিলেন, যখন কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। *(বুঃ ৩১৯১)* তিনি সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে সৃষ্টির ভাগ্যবিধান লিখতে আদেশ করেন। সৃষ্টির নিয়তি লিপিবদ্ধ হয়। এর পঞ্চাশ হাজার বছর পর বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড সৃষ্ট হয় ছয় দিনে। *(মুঃ ২৬৫৩, কুঃ ৭/৫৪, ১০/৩, ১১/৭)* (সপ্ত) পৃথিবী সৃষ্ট হয় দুই দিনে। *(কুঃ ৪৮/৯)* এরপর সপ্তাকাশ সৃষ্টি হয় দুই দিনে। *(কুঃ ৪৯/১২, ২/২৯)*

আকাশ কোন বস্তু নির্মিত। যা ছাদের ন্যায় বিনা স্তম্ভে স্থিত। যার দ্বার ও প্রহরী আছে। আকাশ পূর্বে ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। *(কুঃ ৪১/১১)* তিনি আকাশে সুরক্ষিত দূর্গ (রাশিচক্র) সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ ১৫/১৬)* যে আকাশ তরঙ্গায়িত। *(কুঃ ৫১/৭)* আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সংযুক্ত ছিল যা পরে উভয়কে পৃথক করেছেন। *(কুঃ ২১/৩০)* স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এই বিশাল সপ্তাকাশ। *(কুঃ ৬৭/৩)* কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেনঃ যেন সে আকাশে আরোহণ করে। *(কুঃ ৬/১২৫)*

অন্যান্য অবশিষ্ট মাখলূকাত দুদিনে সৃষ্ট হয়। প্রকাশ যে, ১৮ হাজার মাখলূকাত বলে প্রচলিত কথা ঠিক নয়। আল্লাহর মাখলূকাতের কোন সঠিক হিসাব নেই।

"আল্লাহ পাকই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা শস্য জন্মান; যয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্ব প্রকার ফল। অবশ্যই এতে আছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন। তিনিই তোমাদের অধীন করেছেন রজনী, দিবস সূর্য এবং চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তারই বিধানের। নিশ্চয় এতে বোধ শক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। এবং তিনি তোমাদের অধীন করেছেন বিবিধ প্রকার বস্তু, যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে। তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাছ আহার করতে পার এবং তা থেকে রত্নাবলী আহরণ করতে পার যার দ্বারা তোমরা অলঙ্কৃত হও, এবং তোমরা দেখতে পাও ঃ ওর বুক চিরে

জলযান চলাচল করে এবং এজন্য যে তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক চলে না যায় এবং তিনি স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্য-স্থলে পৌছাতে পার। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণায়ক চিহ্ন সমূহ এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।" *(কুঃ ১৬/১০-১৬)*

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওদের করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।" *(কুঃ ৬৭/৫)* "তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভাবর্ধনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বেতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।" *(কুঃ ১৬/৫,৮)*

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং ওর তিথি নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ তা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।" *(কুঃ ১০/৫)*

"মৃত ধরিত্রী ওদের জন্য একটি নিদর্শন; যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য; যা ওরা ভক্ষণ করে। ওতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রবস্রবণ; যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল, যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। রাত্রি ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে আবর্তন করে; এ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি, অবশেষে তা শুকনো বাঁকা খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, রজনী দিবসকে অতিক্রম করে না। আর প্রত্যেক নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।" *(কুঃ ৩৬/৩৩-৪০)*

"তিনিই তোমাদেরকে বিজলি দেখান, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘন মেঘ। বজ্র-নির্ঘোষ ও ফিরিশ্তাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে হতাহত করেন।" *(কুঃ ১৩/১২-১৩)*

"তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি ----। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।" *(কুঃ ৩০-২৫-২৬)* "আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে স্থির করে রেখেছেন, যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়ে যায়। ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওগুলোকে স্থির রাখবে?" *(কুঃ ৩৫/৪১)* "সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমার অনুধাবন করতে পার না।" *(কুঃ ১৭/৪৪)*

"তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।" *(কুঃ ৪৫/১৩)*

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে।" *(কুঃ ২২/১৮)*

আল্লাহপাক ফিরিশ্তাকে নূর (জ্যোতি) হতে এবং জিনকে (মানুষের পূর্বে) অগ্নি থেকে সৃষ্টি করেছেন। *(কুঃ১৫/২৬)* তিনি শনিবারে মাটি ও রবিবারে পর্বতমালা, সোমবারে বৃক্ষাদি, মঙ্গলবারে ঘৃণিত বস্তু এবং যাবতীয় খনিজ পদার্থ, বুধবারে জ্যোতি এবং মৎস, বৃহস্পতিবারে পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ সৃষ্টি করেন এবং পরিশেষে শুক্রবারে আসরের পর হযরত আদম ﷺ-কে মাটি হতে স্বহস্তে সৃষ্টি করেন। *(মুঃ ২৭৮৯)*

অতঃপর তাঁর দেহে 'রূহ' ফুঁকে জিনিসের নাম শিখিয়ে সমগ্র ফিরিশ্তা-মন্ডলীকে আদেশ করেন আদমকে সিজদা করতে। সকল ফিরিশ্তাবর্গ আল্লাহর আদেশ মান্য করে তাঁকে সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলীস (যে জিন জাতির অন্যতম এবং ফিরিশ্তার জামাআতে শামিল ছিল) আদেশ অমান্য করল এবং সগর্বে সিজদাবনত হতে অস্বীকার করল।

আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, 'হে ইবলিস! কি হল তোর ? আমি যখন সকলকে আমার দুই হস্তদ্বারা সৃষ্টি (আদম)কে সিজদা করতে আদেশ করলাম তখন তুই সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি না। কে তোকে এতে নিবৃত্ত করল ? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি? না তুই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ?'

ইবলীস বলল, 'আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। আমি কি তাকে সিজদা করব যে মাটি হতে সৃষ্ট ? আপনি পুরাতন পরিবর্তিত শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করবার নই।'

আল্লাহ বললেন, 'নেমে যা এ স্থান হতে, এখানে থেকে অহংকার করার অধিকার তোর নেই। সুতরাং বের হয়ে যা, তুই অধমদের অন্তর্ভুক্ত, বিতারিত এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি অভিশাপ রইল।'

ইবলীস বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।'

আল্লাহ তাআলা বললেন, 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে তুই অন্তর্ভুক্ত হলি।'

ইবলীস বলল, 'আপনার মাহাত্ম্যের শপথ! আপনার বিশুদ্ধচিত্ত খাঁটি বান্দা ছাড়া আমি সকলকে অবশ্যই ভ্রষ্ট করব।' আপনি যে আমার সর্বনাশ করলেন তার শপথ! আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্ম (ও দুনিয়া)কে শোভন করে তুলব এবং তাদের সকলের সর্বনাশ সাধন করব। আপনি আমার সর্বনাশ করলেন তার প্রতিশোধে আমিও আপনার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁত পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসবই এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। বলুন, কেন ওকে আমার উপর মর্যাদা দান করলেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরকে সমূলে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করে ছাড়ব।'

আল্লাহ বললেন, 'বের হয়ে যা এখান হতে নিকৃষ্ট ও বিতাড়িত অবস্থায়। এটাই আমার নিকট পৌঁছানর সরল পথ। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত

আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবে না। আমি সত্য এবং সত্যই বলছি, তোর দ্বারা এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম অবশ্যই পূর্ণ করব। জাহান্নামই তোদের সম্যক্ শাস্তি। আর তুই তোর আহবানে যাকে পারিস্ সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক-বাহিনী দ্বারা ওদেরকে আক্রমণ কর এবং ওদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশী হয়ে যা এবং ওদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। (আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি তো ছলনা মাত্র)। আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই।'

হযরত আদম (আঃ) এর পঞ্জরাস্থি হতে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করে আল্লাহপাক উভয়কে আদেশ করলেন, 'তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। নচেৎ তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। হে আদম! এ (শয়তান) তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটিই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গ হবে না। আর সেখানে পিপাসার্ত ও রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।'

অতঃপর শুরু হল আদমের প্রতি শয়তানের শত্রুতা। তাদের গোপন লজ্জাস্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিল বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অবিনশ্বর রাজ্যের কথা বলে দেব না? পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা চিরস্থায়ী হও এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' শয়তান উভয়ের নিকট কসম করে বলল, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন।'

এভাবে সে তাঁদেরকে প্রবঞ্চিত করল। তাঁদের পদস্খলন ঘটিয়ে সেখান হতে তাদেরকে বের করতে কৃতার্থ হল। সুতরাং যখন তাঁরা সেই বৃক্ষ (ফলে)র আস্বাদ গ্রহণ করলেন তখন তাঁদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তাঁরা জান্নাতের পত্রদ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা করিনি? শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তা তোমাদেরকে বলিনি ?'

অতঃপর আদম ﷺ আল্লাহর নিকট হতে কিছু বাণীপ্রাপ্ত হলেন। তাঁরা বললেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

আল্লাহপাক তাঁর প্রতি ক্ষমাশীল হলেন ও তাঁকে হেদায়াত করলেন। বললেন, 'তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু এবং পৃথিবীতে তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে। সেখানে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সেই নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না, বিপদগামী এবং দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে ও মিথ্যা জানবে তারাই হবে দোযখবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।' *(কুঃ ২/৩০-৩৯, ৭/১১-২৫, ১৭/৬১-৬৫, ২০/১১৫-১২৬, ৩৮-৬৭-৬৮)*

তদন্তর সেই আদি মানুষযুগল থেকে জন্ম হয় এত মানুষের। নরের মেরুদন্ড ও নারীর বক্ষাস্থির মধ্য হতে নির্গত এবং সবেগে স্খলিত তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস (পানি)

থেকে এই বিশাল মানব জাতির বিভিন্ন বংশ ও গোত্র উৎপন্ন হয়। *(কুঃ ২৫/৫৪, ৩২/৮, ৮৬/৬-৭)*

শুক্রবিন্দু মাতৃগর্ভের নিরাপদ আধারে ৪০ দিন থেকে জমাট রক্তে পরিণত হয়। অতঃপর তা ৪০ দিনে পিন্ডে রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থায় ৪০ দিন অতিবাহিত হলে তার প্রতি এক ফিরিশ্তা পাঠিয়ে তার কর্মাকর্ম, রুজি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য লিখা হয়। অতঃপর তাতে 'রূহ' ফুঁকা (আত্মা দান করা) হয়। অতঃপর তা অস্থিপঞ্জরে পরিণত হয়। অতঃপর তা মাংস দ্বারা ঢাকা হয়। অবশেষে ওকে আরো এক রূপ দান করা হয়। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান। *(২৩/১৪, বুঃ ৩২০৮)*

আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি অনুযায়ী মানবের জন্ম হয়। *(কুঃ ৩০/৩০)* আর এই প্রকৃতির উপরই মহান প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তান-সন্ততি বাহির করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন আর বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়, আমরা সাক্ষী রইলাম।' *(কুঃ ৭/১৭২)* এইভাবে প্রত্যেক নবজাত শিশু ইসলামের প্রকৃতির উপর জন্ম গ্রহণ করে। *(বুঃ ১৩৫৮, মুঃ ২৬৫৮)*

বলাই বাহুল্য যে, মুসলিম এই থিওরীরই বিশ্বাসী। এ বিষয়ে অন্য কোন থিওরী তার নিকট হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত

প্রমানপঞ্জী ও সংকেত-পরিচিতি

কুঃ = আল কুরআন (সূরা ও আয়াত নং)
আঃ জাঃ = আহকামুল জানায়েয, আল্লামা আলবানী
আঃ জিঃ = আলামুল জিন্ন।
আঃ তাঃ = আল আকীদাহ আত্ ত্বাহাবিয়্যাহ
আঃ দাঃ = সুনান আবু দাউদ (হাদীস নং)
আঃ মাঃ = আলামুল মালায়েকাহ
আঃ সিঃ = আসাহহুস্ সিয়ার
ইকঃ = আল ইকলীদ, শানক্বীত্বী
ইঃ মাঃ = সুনান ইবনে মাজাহ (হাদীস নং)
ইঃ শাঃ = মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ
কিঃ ঈঃ = কিতাবুল ঈমান, ইবনে তাইমিয়্যাহ
কিঃ কুঃ = আল-ক্বিয়ামাতুল কুবরা, উমর আল-আশক্বার
কিঃ সুঃ = আল-ক্বিয়ামাতুস সুগরা
কোঃ শঃ = কুরআন শরীফ (অনুবাদ), মওলানা মোবারক করীম জওহর
তঃ ইঃ কাঃ = তফসীর ইবনে কাসীর
তঃ মাঃ = তফসীরুল মানার
তঃ সাঃ = তফসীর সা'দী
তাঃ ঈঃ = তাকবিয়াতুল ঈমান, শাহ ইসমাইল শহীদ
তাওঃ = আত্ তাওয়াসসুল, মুহাদ্দেস আলবানী
তাঃ মিঃ = তামামুল মিন্নাহ, শায়খ আলবানী
তাঃ সাঃ = তাহযীরুস সাজেদ, ঐ
তিঃ = সুনান তিরমিযী (হাদীস নং)
তোঃ মাঃ = তোহফাতুল মাওদুদ, ইবনুল কাইয়্যেম
দঃ বুঃ = আল-দলীল অল-বুরহান, ইবনে তাইমিয়্যাহ
দাঃ নঃ = দালায়েলুন নবুওয়াহ
দুঃ মঃ = দুর্রুল মনসূর, সুয়ুত্বী
নাঃ = সুনান নাসাঈ (হাদীস নং)
ফঃ ইঃ বাঃ = ফতোয়া ইবনে বায
ফঃ ইঃ তাঃ = ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ

ফঃ উঃ = ফতোয়া ইবনে উসাইমীন
বাঃ = সুনান বাইহাকী
বিঃ নিঃ = আল বিদায়াহ অন নিহায়াহ, ইবনে কাসীর
বুঃ = সহীহ বুখারী (হাদীস নং)
বেঃ এঃ = আল-বেলা অল এদা
মাঃ বঃ = মাজাল্লাতুল বহুসুল ইসলামিয়্যাহ
মাঃ যাঃ = মাজমাউয যাওয়ায়েয
মিঃ = মিশকাত (হাদীস নং)
মুঃ = সহীহ মুসলিম (হাদীস নং)
মুঃ আঃ = মুসনাদে আহমাদ
মুঃ মাঃ লঃ = মু’জামুল মানাহী আল-লাফযীয়্যাহ, বকর আবু যায়দ
মুয়াঃ = মুয়াত্তা ইমাম মালেক
যাঃ মাঃ = যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়্যেম
যাঃ মাঃ = যাদুল মাসীর, ইবনুল জওযী
রঃ মাঃ = রফউল মালাম, ইবনে তাইমিয়্যাহ
শঃ তাঃ = শরহে তাহাবিয়্যাহ
শঃ নঃ = শারহুন নওবী (সহীহ মুসলিম)
শাঃ মুঃ = শামায়েলে মুহাম্মাদিয়্যাহ, তিরমিযী
সঃ জাঃ = সহীহুল জামে’, আল্লামা আলবানী
সঃ তাঃ = সফওয়াতুত তাফাসীর
সিঃ সঃ = সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ, মুহাদ্দেস আলবানী
সীঃ ইঃ হিঃ = সীরাতে ইবনে হিশাম
হাঃ = মুস্তাদরাকুল হাকেম

নির্মল সত্যের আলো পেতে হলে সে পথে আমাদেরকে যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য সে পথ তার জন্য বড় সহজ, যার জন্য আল্লাহ তা সহজ করে দেন। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাক, তাহলে কোনদিন পথহারা ও দিশাহারা হবে না; আর সে জিনিস হল আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ (হাদীস)---।'

সুতরাং ভাইজান! আপনি সদা যত্নবান ও আগ্রহী হন, যাতে আপনার সকল ইবাদত ও আনুগত্য ঠিক আল্লাহর শরীয়ত, রসূল ﷺ -এর সুন্নাহ এবং সাহাবা তথা কিয়ামত অবধি তাঁদের অনুসারীবর্গের তরীকার অনুবর্তী হয়। আর আমরা - ইন শা-আল্লাহ - আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করব। এ কাজে আমাদের উপকরণ হল বই-পুস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিযুক্ত উলামাবৃন্দ। অতএব হক ও আলোর সন্ধানে উক্ত উপকরণসমূহের কিছু প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সহিত যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহায়তা করতে যত্নবান হব - ইন শা-আল্লাহ।

CO-OPERATIVE OFFICE FOR CALL &
FOREIGNER`S GUIDANCE AT AL-MAJMA`AH
P.O. BOX # 102. AL-MAJMA`AH-11952,
KINGDOM OF SAUDI ARABIA.
TEL 06 432 3949 FAX 06 4311996